বিশ্ব সাধক চরিতমালা

দ্বিতীয় খণ্ড

স্বামী নির্ম্মলানন্দ

সঙ্ঘসাধক-চরিতমালা

দ্বিতীয় খণ্ড

[ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের প্রয়াত সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য সন্ন্যাসী সন্তানগণের পুণ্য চরিতকথা]

স্বামী নির্ম্মলানন্দ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
২১১, রাসবিহারী এভিনিউ,
বালীগঞ্জ, কলিকাতা-১৯
ফোন : ৪৬-১১৭৮

প্রথম সংস্করণ
শ্রীশ্রীমহালয়া
২রা আশ্বিন, ১৩৯৭

মূল্য : ১৬·০০ টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীবীরেন্দ্রমোহন বসাক
১০, ডাঃ কার্ত্তিক বোস স্ট্রীট
সারদা প্রেস
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতা আচার্যের সাক্ষাৎ লীলাপার্ষদ-রূপে যাঁহারা সঙ্ঘের জন্য প্রাণোৎসর্গকারী, তাঁহাদের শীর্ষমণিস্বরূপ যিনি, যাঁহার ত্যাগ, তপস্যা ও আত্মনিষ্ঠায় সঙ্ঘ আলোকিত, আচার্যোত্তর কালে যিনি সুদীর্ঘ আটচল্লিশটি বৎসর দ্বিতীয় সঙ্ঘ-সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সঙ্ঘের ভূয়ঃপ্রসারে সফল নেতৃত্ব দিয়াছেন, শ্রীগুরুর যোগ্য শিষ্য স্বামী সচ্চিদানন্দরূপে যিনি অগণিত মানুষকে বিতরণ করিয়াছেন অধ্যাত্ম আলোকের অমৃতস্পর্শ, সেই পরম পূজ্য বড় স্বামীজীর শ্রীকরকমলে "সঙ্ঘসাধক-চরিতমালা" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম। স্বামীজীর চরণে এই আমার পূজানিবেদন!

—গ্রন্থকার

সঙ্ঘসাধক-প্রসঙ্গে

'সঙ্ঘসাধক-চরিত্রমালা' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল—শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় ও অন্তঃপ্রেরণায়। ভূমিকা দীর্ঘ করিব না। কারণ, যাহা বলিবার তাহা প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতেই বলা হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম খণ্ডেরই পরিপূরক।

যুগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের মহাসঙ্ঘ রচনায় তদীয় চিহ্নিত সাধক সন্তানগণের আবির্ভাব, জগন্মঙ্গল সঙ্ঘরচনায় আচার্য্যের লীলাপরিকররূপে তাঁহাদের অবদান—ভারতের অধ্যাত্ম ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। তাঁহাদের মহাজীবনের অমৃতকথা অবিস্মরণীয়া। সঙ্ঘ এবং সঙ্ঘনেতা সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত মহাপুরুষদের কথাও মানুষ জানিতে চাহে। তাই জীর্ণ শরীর লইয়াও এই কার্য্যে ব্রতী হই। জানি—যাহা লিখিলাম, তাহা যথেষ্ট নয়। ইহাও বিশ্বাস আছে—সঙ্ঘের যোগ্য উত্তর সাধকগণের কৃতী হস্তে এই অসম্পূর্ণতার পরিপূর্ত্তি সাধিত হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই যোগ্য প্রতিভাধর উত্তর সাধকগণকে সঙ্ঘে আকর্ষণ করুন!

এই খণ্ডে আছে সঙ্ঘের দ্বিতীয় সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী (বড় স্বামীজী) মহারাজের মহাজীবনের উপর কয়েকটি নির্ব্বাচিত বিশেষ প্রবন্ধ। পূজ্য স্বামীজীর জীবন-কথা স্বতন্ত্র গ্রন্থের দাবী রাখে। কিন্তু ক্ষীণদৃষ্টি, হীনস্বাস্থ্য এই বৃদ্ধের দ্বারা অত বড় বিশাল কার্য্য হইল না। মনে বড় খেদ থাকিয়া গেল। তবে এ ক্ষেত্রেও নৈরাশ্য পোষণ করি না। দীর্ঘ ৪৮ বৎসর সঙ্ঘের সভাপতি পদে ব্রতী থাকিয়া পূজ্য বড় স্বামীজী অগণিত সন্ন্যাসী এবং গৃহীকে মন্ত্রদীক্ষা ও শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাস করি—তাঁহাদের ভিতর হইতেই যোগ্য আধার বাহির হইবেন এবং তাঁহারা একক বা যুক্ত ভাবে এই অত্যাবশ্যকীয় মহৎ কর্ম্মটি সাফল্যের সহিত সম্পাদন করিবেন। এই গ্রন্থে যাহা করা হইল তাহা সংক্ষিপ্ত ভূমিকা মাত্র।

এই গ্রন্থে অন্য যে-সকল মহাপুরুষের জীবনী আলোচিত হইয়াছে তন্মধ্যে আছেন সঙ্ঘের পঞ্চম প্রধান সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দজী মহারাজ। তিনিও পূজ্যপাদ সচ্চিদানন্দজীর ন্যায় ছাত্রাবস্থা হইতেই শ্রীশ্রীআচার্য্যের সাহচর্য্যে আসেন এবং সঙ্ঘের আদি স্রষ্টাদের অন্যতম। শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণানন্দজী মহারাজও সঙ্ঘের এক মহাজীবন। শ্রীমৎ স্বামী

হরিহরানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী প্রকাশানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী সদানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী ধীরানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী নিখিলানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী ত্রিলোচনানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী আত্মরূপানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী ত্র্যম্বকানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী সর্বানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী জ্যোতির্ম্মানানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী অনন্তানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী সুরেশ্বরানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী বীরেশানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী ত্রিদশানন্দজী—ইঁহাদের মহত্ত্বই কি কম ? নিজ নিজ চরিত্রবৈশিষ্ট্যে ইঁহারাও সমগ্র জীবন লোকহিতে রত থাকিয়া সঙ্ঘের সেবাপূর্ব্বক যথাসময়ে এই সকল মহাত্মারা শ্রীগুরুচরণে বিশ্রাম লইয়াছেন, আর আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন ত্যাগ, সেবা, আদর্শনিষ্ঠা, বিবেক-বৈরাগ্য, গুরুভক্তি ও সঙ্ঘানুগত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইঁহারা সকলেই আমার নমস্য। তাঁহাদের জীবনকথা লিখিতে গিয়া কতই না ত্রুটি হইল। তাই তাঁহাদের শ্রীচরণে শত শত বার ক্ষমাপ্রার্থী।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আমি যাহা পারিলাম না, তাহা সম্পূর্ণ করিবেন সঙ্ঘের উত্তর সাধকেরা। তাঁহাদের জন্য রহিল অন্তরের অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা। তবে একটি বিনীত সাবধান বাণীও তাঁহাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করিয়া যাই। মনে রাখিতে হইবে—শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতা হইলেন অঙ্গী, আর তদীয় লীলা-সহচরগণ হইলেন আচার্য্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। প্রথম খণ্ডেই উল্লেখ করিয়াছি—ইহা শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবেরই শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী। সুতরাং, অঙ্গীকে ছাড়াইয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রাধান্য নয়। শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার মহাভাব ও মহাশক্তি যাঁহার ভিতর যতখানি প্রতিফলিত, তিনি তত বড় মহান্। কিন্তু স্বামী প্রণবানন্দকে অতিক্রম করিয়া কেহই অলৌকিক নহেন। কোন জীবনীকার কোন সঙ্ঘসন্তানের চরিত্র চিত্রণ কালে যদি তাঁহার মহিমাকে সঙ্ঘগুরুর উপরে তুলিয়া ধরিতে উদ্যোগী হন তবে তাহা হইবে ঐ বিশেষ চরিত্রের বিকৃতি। সকল সঙ্ঘ-সন্তানের মহিমার সুষমাই ফুটিয়াছে সঙ্ঘের একই প্রাণপুরুষের অধ্যাত্মব্যক্তিত্বের দীপ্তিবৈভব হইতে। পদ্মফুলটি যতই সুন্দর হউক, তাহা ফুটিয়া উঠে অরুণ-কিরণরাশির মহাপ্রসাদেই, আর প্রাণরস থাকে গাছের শিকড়ে, এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্মুখে থাকিলে কাজ ঠিক ঠিক হইবে।

গ্রন্থকার

স্বামী সর্বেশানন্দ
০৮/২/১৯৯২

সূচীপত্র

এই গ্রন্থপ্রকাশে আর্থিক অর্ঘ্য দান করেছেন সঙ্ঘভক্ত ডাঃ মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী এবং তাঁর সহধর্ম্মিণী ডাঃ নীলিমা চৌধুরী। শ্রীশ্রীঠাকুর তনয়সহ উভয়কে শুভাশীর্ব্বাদ দান করুন!



ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা
আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ

তোমারে প্রণাম করি !

প্রথম কুমুদ সঙ্ঘসরসী মাঝে,
সৎ, চিৎ আর আনন্দরূপে রাজে।
প্রণবচন্দ্র-করুণা-কিরণে তাঁর,
দলগুলি সব ফুটেছে চমৎকার।
সেবার সুরভি পরাগে পরাগে তায়,
ভকতি-মাধুরী ভিতরে কর্ণিকায়।
অন্তর্জ্যোতিঃ বৃন্তে নিরন্তর,
অহো সে প্রসূন বিধৃত তারি 'পর !

স্মিত সে আস্য উর্দ্ধে ইন্দুপানে,
মাটিতে কন্দ মানুষের কল্যাণে।
কুমুদবন্ধো !   মরি, মরি নিরুপম !
দেব-দেউলের কুসুমাঞ্জলি সম।
জীবনমন্ত্র—আত্মসমর্পণ,
নির্যোগক্ষেম হেম হেন অতুলন !
অনাসক্তির অংশুতে মহীয়ান্,
সারল্য যেন স্বয়ং মূর্ত্তিমান্।

তুমি সে কুমুদ, তুমি সচ্চিদানন্দ,
স্মরণে তোমার ঘুচে ধন্ধ ও বন্ধ।
সংযমপূত ত্যাগের তনিমাখানি,
ক্ষমাসুন্দর, নিত্য নিরভিমানী।
তপঃসন্তাপে নিকষিত নব হেম,
নিখাদ জীবনে মূর্ত্ত মানবপ্রেম।
'সৎ' রূপে তুমি সদা হে সত্যসন্ধ,
'চিৎ' রূপে চিতে দিব্য জ্ঞানের ছন্দঃ।

'আনন্দ' রূপে নিত্য আত্মবান্,
সার্থকনামা তুমি হে জ্যোতিষ্মান্ !
চিরবৈরাগী, কঠোর কৃচ্ছ্র সার,
ক্ষীণ তনু যেন দধীচির পূত হাড় ।

মনে পড়ে সেই এক দিবসের কথা,
দুর্য্যোগ রাতি, বিষণ্ণ বিহ্বলতা ।
সঙ্ঘগুরুর সহসা অপ্রকাশ,
এ কি সংকট ! এ কি রে সর্ব্বনাশ !
অভয়ভারতী সেদিন তোমার ঠাঁই—
"এ তাঁরি সঙ্ঘ, শংকা কেনরে ভাই ?
গুরুশক্তির কভু কি বিলয় হয় ?
নেপথ্যে তিনি নিত্য যে লীলাময় ।"
বহিত্র নব বলিষ্ঠ দুই করে,
সঙ্ঘতরণী উজানেও পাড়ি ধরে ।

সকলেরে দিয়ে প্রতিভার সম্মান
আপনি করিলে আড়ালে অবস্থান ।
কোথায় এমন মহিমোজ্জ্বল মূর্ত্তি ?
কোথা বা এ হেন ঔদার্য্যের পরিস্ফূর্ত্তি ?
ন্যগ্রোধ নগ—স্নিগ্ধ শীতল ছায়,
শ্রান্ত মানবে শান্তি বিলালে তায় ।

হে "বড় স্বামীজী" ! তুমি সকলেরই বড়,
তোমার বিরহে ধারা বহে দর দর !
আজিকে প্রভাতে তোমারে প্রণাম করি,
লক্ষ ললাটে চরণের ধূলি ধরি ।

পূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে আচার্য্যবরিষ্ঠ স্বামী প্রণবানন্দের মহাপরিনির্ব্বাণের পর তৎপ্রবর্ত্তিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা দেশে ও বিদেশে বহুগুণ পরিবর্দ্ধিত—কর্ম্মী, কর্ম্মকেন্দ্র, কর্ম্মের প্রকরণ ও কর্ম্মের পরিধি সবই দ্রুত গতিতে বেড়েছে। যাঁর নিপুণ নেতৃত্বে এই সাফল্যের প্রকাশ, তিনি সঙ্ঘের দ্বিতীয় সভাপতি পূজ্য স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ। গত ৮ই জানুয়ারী রাত্রি ৮-১০ মিঃ দীর্ঘ সাধনময় ও কর্ম্মজীবনের অবসানে ৯০ বৎসর বয়সে সঙ্ঘের কলিকাতাস্থিত প্রধান কার্য্যালয়ে তিনি ইষ্টচরণে লীন হলেন।

আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের লীলাপার্ষদরূপে যাঁরা নুনপান্তো খেয়ে, দুয়ারে দুয়ারে কণভিক্ষা করে, অশেষ কষ্টবরণের মধ্য দিয়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ভিত্ গড়ে তুলেছিলেন, ইনি সেই আদ্যিকালের একজন এবং গুরুভ্রাতাদের ভিতরে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। সন্ন্যাস হয় ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে। শ্রীগুরুর পরিনির্ব্বাণের পরে ইনি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘের সভাপতির দায়িত্বে বৃত হন এবং সুদীর্ঘ ৪৮ বৎসর একটানা ঐ পদে অধিষ্ঠিত থেকে এই সংস্থার অন্তরঙ্গ অধ্যাত্ম জীবন এবং বহিরঙ্গের সেবাময় কর্ম্মযজ্ঞকে যুগপৎ সমান উৎকর্ষে বিকসিত করে তুলতে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেন। সাফল্যের পর সাফল্যে এই সঙ্ঘের লোকপ্রিয়তা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কলাগাছিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশে এই মহাসাধকের জন্ম। পূর্ব্বাশ্রমের নাম কুমুদবন্ধু মৈত্র। জন্মাবধি অত্যন্ত সহজ, সরল, স্বভাবনির্লিপ্ত, কিন্তু অতিশয় মেধাবী। বাজিতপুর উচ্চবিদ্যালয়ে ক্লাসের 'ফার্ষ্ট বয়' ছিলেন তিনি। উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ুয়া ছাত্ররূপেই ভাবী গুরু স্বামী প্রণবানন্দের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়।

গুরুদেবও (তৎকালে বিদ্যার্থী বিনোদ) তখন উক্ত বিদ্যালয়ের দু' ক্লাশ উপরের ছাত্র। বিনোদ যোগারূঢ়, অন্তর্লীন, আর কুমুদ অধ্যয়ননিষ্ঠ হয়েও অনাসক্ত, বৈরাগ্যপ্রবণ। গুরু-শিষ্য উভয়েই উভয়কে চিনেছিলেন। কুমুদই যে তাঁর শ্রেষ্ঠ উত্তর সাধক তা উপলব্ধি ক'রেই সেই ছাত্রাবস্থা থেকেই তাকে নিজের ভাবে গড়ে তুলেছিলেন উত্তর কালের আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ। ভাবী গুরুর পূর্ণ প্রভাব আপতিত হয়েছিল কুমুদের চিন্তায়, মননে, আচরণে, সাধনে। তার আলুথালু বেশভূষা ও অসংস্কৃত কেশগুচ্ছ দর্শনে স্কুলের প্রধান শিক্ষক একদা মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলেন "তুমি অমন ইডিয়টের মত চল কেন? তুমি ভদ্র ঘরের সন্তান, মেধাবী ছেলে।" শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক মহোদয় বুঝতে পারেন নি, এই ইডিয়ট ছাত্রের ভিতরে কি আইডিয়্যাল লুক্কায়িত আছে। কুমুদ ভোগ ও ব্যসনের জন্য জগতে আসে নি —ইনি এসেছেন এক যুগন্ধর মহাপুরুষের লীলাপার্ষদরূপে ; জগতে প্রতিষ্ঠা করবেন সর্ব্বত্যাগের মহনীয় আদর্শ—আপন মহা-জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা।

ছাত্রাবস্থা থেকেই ভাবী গুরুর কাছে তাঁর নিয়মিত আনাগোনা। গভীর রাত্রিতে চার মাইল নৌকা বেয়ে অভিভাবকদের অগোচরেও যাতায়াত হতো। জীবন-যৌবনের ক্ষণভঙ্গুরতা, আত্মতত্ত্বোপলব্ধির সাধন, দুর্গত মানুষের সেবা, ভারতের সনাতন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্রত-পালন বিষয়ে লব্ধ উপদেশাবলী অবশেষে কুমুদকে সংসারত্যাগের চূড়ান্ত অনুপ্রেরণা দান করে। উচ্চ বিদ্যালয়ের সর্ব্বশেষ পরীক্ষায় সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হয়ে তিনি চলে আসেন কলকাতায়, ভর্ত্তি হন সেণ্ট্রাল কলেজে। ইণ্টার মিডিয়েট ক্লাশে অধ্যয়ন। কিন্তু বৈরাগ্যের তাড়নায় পড়া আর হয় না। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক ভাবী গুরুর নির্দ্দেশে তিনি চলে যান হিমালয়ে স্বর্গাশ্রমে—তপশ্চর্য্যার অভিপ্রায়ে। বাজিতপুরের এক ঘন অরণ্যের ভিতর

একটি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে তখন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সবে মাত্র অংকুরিত। ত্যাগীদের আশ্রয় দান ও ভরণপোষণের মত কোন সংস্থান তখনো পর্য্যন্ত গড়ে উঠে নি। তাই নির্ব্বেদপ্রাপ্ত তরুণ সাধককে হিমালয় আশ্রয় করতে হয়।

কিন্তু যুগন্ধর পুরুষ আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের মিশন কেবল আত্মমুক্তির একদেশদর্শী সাধনে গিরিগুহা আশ্রয় করা নয়—আত্মমুক্তির সঙ্গে জগৎকল্যাণব্রতও অবশ্য সাধনীয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে খুলনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে লোকক্ষয়কর ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দুর্গত অঞ্চলে সেবাব্রতের দায়িত্ব নিয়েছেন সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ, তৎকালে ব্রহ্মচারী বিনোদ। এই মহৎ ও ব্যাপক কর্ম্মযজ্ঞে বহু ত্যাগব্রতী কর্ম্মীর প্রয়োজন। এই কর্ম্মসূত্রে যাঁরা স্বামী প্রণবানন্দের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসেন তাঁদের ভিতরে অনেকেই আর গৃহে ফিরে যান নি। সন্ন্যাসব্রত বরণপূর্ব্বক আজীবন ঈশ্বরের সেবা এবং মানুষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। কুমুদও হিমালয়ের কঠোর তপশ্চর্য্যা ছেড়ে ১৯২০ সালেই নেমে আসেন মাটির জগতে দুর্গত মানুষের সেবায়। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই ব্রত তিনি উদ্‌যাপন ক'রে গেলেন—অস্খলিত নিষ্ঠায়, একান্ত নিরলস ভাবে।

অধ্যাত্ম জীবনে এই মহাসাধক শ্রীগুরুকৃপায় সুপ্রতিষ্ঠ ছিলেন আত্মনিষ্ঠার এক বিশেষ উন্নত ভূমিতে। সেখান থেকে তিনি এক চুলও নড়েন নি। দেহত্যাগের প্রাঙ্‌মুহূর্ত্তেও মহাসাধকের ওষ্ঠদ্বয়ে শ্রীগুরুমন্ত্র জপের অভ্যস্ত স্পন্দন অব্যাহত ছিল। যে ত্যাগ, বৈরাগ্য ও অনাসক্তির আদর্শের ভিত্তিতে তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের সূত্রপাত, তা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে বর্ত্তমান থেকে তাঁকে সকলের নিকট অতিশয় শ্রদ্ধার্হ করে রেখেছিল। স্বামী প্রণবানন্দের উপদিষ্ট আদর্শ ও সাধনাকে একান্ত গুরুভক্ত সাধক বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরে রক্ষা করেছেন। এ জন্য তাঁর যে অশেষ ত্যাগ বরণ, তা তুলনাহীন।

প্রেমে, সেবায়, ক্ষমায়, স্নেহে, শাসনে তিনি সঙ্ঘের গুরুভ্রাতা ও তদীয় শিষ্য-সন্তানগণকে এক অখণ্ড সংহতির নিগড়ে সংবন্ধ করে রেখেছিলেন। অনুজ সঙ্ঘভ্রাতাদের প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করেছেন, তাঁদিগকেই সর্ব্বদা দিয়েছেন বড় স্থান, কিন্তু নিজে থেকেছেন অন্তরালে। কখনো চাহেন নি আত্মপ্রতিষ্ঠা। কখনো ধরা দেন নি নিজেকে। আত্মগোপনশীল এই মহাপুরুষ নিতান্ত সাধারণ ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। গুরুর বরণীয় আসনে অধিষ্ঠিত থেকেও তিনি ছিলেন নিরভিমান নিষ্কিঞ্চন সেবক—সঙ্ঘের সেবায়, মানবতার সেবায় চির-আত্ম-নিবেদিত। তাঁর এই অলোকসামান্য আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সঙ্ঘের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, সেবক, কর্ম্মী তথা সঙ্ঘানুগামী অগণিত ভক্ত-শিষ্যকে নিত্য উদ্বুদ্ধ করেছে, যুগিয়েছে তাদের ভিতর মহৎ ব্রতসাধনে অমিত প্রাণশক্তি। স্বামীজীর পুণ্য জীবন ধ্রুব নক্ষত্রের মত স্থির আলোক বিকিরণ করবে। যে নিখুঁত অনবদ্য সন্ত-জীবনের আদর্শ তিনি রেখে গেলেন তার মৃত্যু নেই। সে জীবন অমর। জানি না, হিমালয়ের নীচে এমন আর একটি নিষ্কলঙ্ক সত্যকার অধ্যাত্ম পুরুষ অধুনা আর সহজলভ্য কি না।

পূজ্য স্বামীজীর সাধন ও কর্ম্মময় মহাজীবনের পূর্ণ আলেখ্য স্বল্পপরিসরে শেষ হওয়ার নয়। ক্রমে তা প্রকাশ হবে। আজ শত সহস্র নয়নের অশ্রুর অর্ঘ্যনিবেদনে তাঁর স্মৃতিপূজা ক'রে ধন্য হতে চাই।

হে মহাজীবন! তুমি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর—অনুপ্রেরণা দাও!

পূজ্য স্বামীজীর প্রতি আচার্য্যদেবের সাধনোপদেশ

দৈনিক ৫।৬ ঘণ্টা জপ-ধ্যান করিও। অনেক সময় মৌন থাকিও। এমন অবস্থায় সর্ব্বদা থাকিতে চেষ্টা করিবে—যেন

বহির্জগতের কোন কিছু তোমাকে স্পর্শ করিতে না পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই পরিদৃশ্যমান্ যাবতীয় পদার্থ বিস্মৃতি সাগরের অতল তলে নিমজ্জিত না হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিবেক-বৈরাগ্য লাভ হইবে না। মনকে এই জগৎ হইতে সরাইয়া যতই অন্তর্জগতের দিকে নিতে পারিবে ততই মন স্থির হইবে ও বিবেক-বৈরাগ্য লাভ হইতে থাকিবে। তোমরা যে পথের পথিক হইয়াছ যদি সর্ব্বদা সেই পথই অবলম্বন করিয়া চলিতে থাক তবে কোন প্রলোভনই তোমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। ভোগীর মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছ। সতত সাবধানে থাকিও এবং সর্ব্বদা মনে করিও আমি সর্ব্বত্যাগী, আমি সর্ব্বত্যাগী, আমি সর্ব্বত্যাগী।

—শ্রীশ্রীসঙ্ঘগীতা, ১ম ভাগ, ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা

পূজ্য স্বামীজীর সংসারত্যাগ ঃ নিজ কণ্ঠে

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ঊনিশ বৎসর বয়সে পূজ্য বড় স্বামীজী চিরতরে সংসার ত্যাগ করেন। এ ঘটনার পূর্ব্ব থেকেই সংসারের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি ভাবটা প্রকট হয়ে উঠেছিল। শ্রীমৎ আত্মানন্দজীর মুখে শুনেছি, তিনি ঘরবাড়ীর মায়া ছেড়ে অল্পকালের জন্য নানা স্থানে ঘুরেছেন। শেষে ফিরে এসে শ্রীমৎ আত্মানন্দজীদের (তৎকালে নিকুঞ্জ) বাহির্বাটীতে থাকতেন। কিন্তু সময় ও সুযোগ খুঁজছিলেন চূড়ান্তভাবে গৃহত্যাগের।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে। সময় অপরাহ্ন। স্থান—কলিকাতা প্রধান কার্য্যালয়; শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের বিশ্রাম-মন্দির। পূজ্য বড় স্বামীজীকে ঘিরে আমরা কয়েকজন গুরুভ্রাতা ইষ্টপ্রসঙ্গে মগ্ন। মূল বক্তা অবশ্য বড় স্বামীজী স্বয়ং। এই দিন নিজ গৃহত্যাগের কাহিনীটি নিজেই শুনান স্নেহাস্পদ গুরুভ্রাতাদের। বলেন—“দেখ মাকে যে ত্যাগ করতে পারে, জগতের সকলকেই সে

ত্যাগ করতে পারে। মাকে ত্যাগ করাই বড় কঠিন। মা হলেন স্নেহ-মায়া-মমতার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা।''

অতঃপর নিজের প্রসঙ্গ। স্বামীজী বলতে থাকেন—"আমার বেশ মনে আছে, আমি যখন স্কুলে যেতাম (বাজিতপুর রাজকুমার এড্ওয়ার্ড উচ্চ বিদ্যালয়), মা গ্রামের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকতেন। জননীর দুচোখ বেয়ে অঝোরে ঝরতো অশ্রুধারা। যতক্ষণ দৃষ্টির বাইরে না যাই, ততক্ষণ তিনি পাষাণ-পুত্তলিকার ন্যায় স্থির হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন অপলক দৃষ্টিতে। অথচ, ব্যাপারটা কিছুই নয়। স্কুলে যাচ্ছি, শনিবার বিকেল পর্য্যন্ত দিদির বাড়ী থাকবো,* সপ্তাহ শেষে বাড়ী ফিরে আসবো।''

"কেন, মা এত বিহ্বলা হতেন?"—প্রশ্ন করি।

"জান, আমার ভাব দেখে সকলেই বুঝে নিয়েছিল যে, এ ছেলে ঘরে থাকবার নয়। আর এ ব্যাপারে সকলে দোষারোপ করতো বিনোদ ব্রহ্মচারীকে (স্বামী প্রণবানন্দ)। বলতো—ঐ সাধুই ভাল ছেলেগুলির মাথা খাচ্ছে।''—উত্তর দেন পূজ্য স্বামীজী।

এগিয়ে চলে প্রসঙ্গ। ঘরে বাঁধবার জন্য বিবাহ দেবার প্রস্তাব এসেছিল মায়ের কাছ থেকে। তাও বলেন অকপটে। মায়ের কাছে তাঁর উত্তর কিন্তু ছিল সুস্পষ্ট—

"দেখ মা, সন্ন্যাসী হব কি না ঠিক নেই। যদি ভগবানের ইচ্ছা হয় তবে তোমার সেবার জন্য গৃহেও থাকতে পারি, কিন্তু বিবাহ নয় ঠিক জেনো। পরের মেয়ে এসে তোমাকে গালি দিবে তা আমি সহ্য করবো না। ঐ যে বউরা (স্বামীজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূরা) তোমাকে গালি দেয়**!" ব'লেই মহাপুরুষের মুখে এক গাল হাসি। সেই সরলতামাখা হাস্যরসে আমরাও হই একাত্ম।

অতঃপর গৃহত্যাগের মূল প্রসঙ্গে আসেন। বলেন—"একবার

---

* বাজিতপুরের সম্ভ্রান্ত মজুমদার পরিবারে স্বামীজীর এক ভগ্নীর বিবাহ হয়। ভগ্নিপতির নাম শ্রীবিপিন মজুমদার।

** কথায় প্রত্যুত্তর করে।



সঙ্ঘের দ্বিতীয় সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ

মায়ের খুব অসুখ। বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। তখন আমি গৃহত্যাগ করি। মাকে বলি—"আমি দিদির বাড়ি যাচ্ছি (শ্রীমৎ যোগানন্দজীর মাতৃদেবী) দিদিকে আনতে। দিদি না এলে তোমার সেবা করবে কে?" পালং যাই। মায়ের অসুখের খবর শুনাই। দিদিকে রওনা করিয়ে দিয়ে বলি—ফরিদপুর কলেজটা দেখে আসি। এই ব'লে চলে যাই নিরুদ্দেশের যাত্রী হয়ে। সেই যে সংসার ছাড়লাম সেই ছাড়াই ছাড়া। কলকাতা এসে একেবারে কাশীর টিকেট কাটি। (হাস্য)

কাশীতে রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে উঠি। সেখানে গিয়ে স্বামীজী মহারাজের মত (তৎকালে ব্রহ্মচারী বিনোদ) সাদা কাপড় ও সাদা চাদর পরে সেজে গুজে সাধুর দলে ভিড়ে পড়ি।"

স্বামীজীর কথা শেষ। পরের ঘটনা। কিছুদিন মাত্র অদ্বৈত আশ্রমে সেবকরূপে অতিবাহিত করে তিনি যাত্রা করেন হিমালয় অভিমুখে। গিয়ে উঠেন হৃষীকেশ স্বর্গাশ্রমে। নিরত হন কঠোর তপশ্চর্য্যায়। ঊনিশ বৎসর বয়সেই শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ তপস্বীর অন্তঃকরণে সন্ন্যাস লাভের তীব্র ব্যাকুলতা। নেমে আসেন হরিদ্বারে মহাপুরুষ শ্রীমৎ ভোলানন্দজী গিরি মহারাজের পূত সান্নিধ্যে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গিরিজী মহারাজ প্রথম বাজিতপুর পল্লীতে শুভ পদার্পণ করেন। মাদারীপুর থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ ক'রে এনেছিলেন ব্রহ্মচারী বিনোদই—গ্রামবাসিগণের প্রতিনিধিরূপে। সেই জ্যোতির্ম্ময় তরুণ যোগীর প্রতি মহাপুরুষ একান্তভাবেই আকৃষ্ট। কুমুদ (পূজ্য বড় স্বামীজী) বাজিতপুর থেকে হিমালয়ে তপস্যায় এসেছে শুনে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন—"বাজিতপুর সে আয়া? উহা বিনোদ নহি হ্যায়? ওহ্ জ্যোতিঃ হ্যায়! প্রেমিক হ্যায়! আভিতক্ কোই লড়্কী কো ছুঁয়া ভী নেহি।" তুমি বাজিতপুর থেকে এসেছ? কেন, ওখানে বিনোদ আছে না। সে এক জ্যোতিঃ, সে এক প্রেমিক পুরুষ। পূর্ণ জিতেন্দ্রিয়। কোন নারীকে সে স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না।

কুমুদের কি এ তত্ত্ব অজানা ? সে তো তাঁরই আদেশে এসেছে হিমালয়ে তপস্যায়। তখনো পর্যন্ত বাজিতপুরে পূর্ণাঙ্গ কোন আশ্রম গড়ে উঠেনি, যেখানে ত্যাগীদের আশ্রয় ও আহার্য্যদানের বন্দোবস্ত হয়। অথচ, কুমুদ একান্তভাবে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত। সংসার-বন্ধন তার কাছে অসহ্য। তাই ব্রহ্মচারী কর্তৃক তাকে হিমালয়ে তপস্যার অনুমতি দান। কিন্তু হিমালয়ের চৌম্বক শক্তি আর কতটুকু ? তপঃসিন্ধ মহাযোগেশ্বর ব্রহ্মচারীর অভাব কুমুদকে আকুল ব্যাকুল করে তোলে। সেই আকর্ষণ হিমালয়ের শক্তি অপেক্ষাও দুর্নিবার। কুমুদ ১৯২০ খৃষ্টাব্দেই নেমে আসেন নীচে মাটির জগতে। বাজিতপুর প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পুনর্মিলিত হন যুগাবতারের শ্রীচরণমূলে। তিনি যে তাঁরই অন্যতম চিহ্নিত লীলাপার্ষদ্। শুরু হয় আত্মমুক্তির সাধনার তীব্রতার সহিত দুর্গত সমাজ ও জাতির নিষ্কাম সেবাব্রত।

অতঃপর ইং ১৯২৪ সালে সন্ন্যাসলাভ।

—অনুলিখন স্বামী নির্ম্মলানন্দ

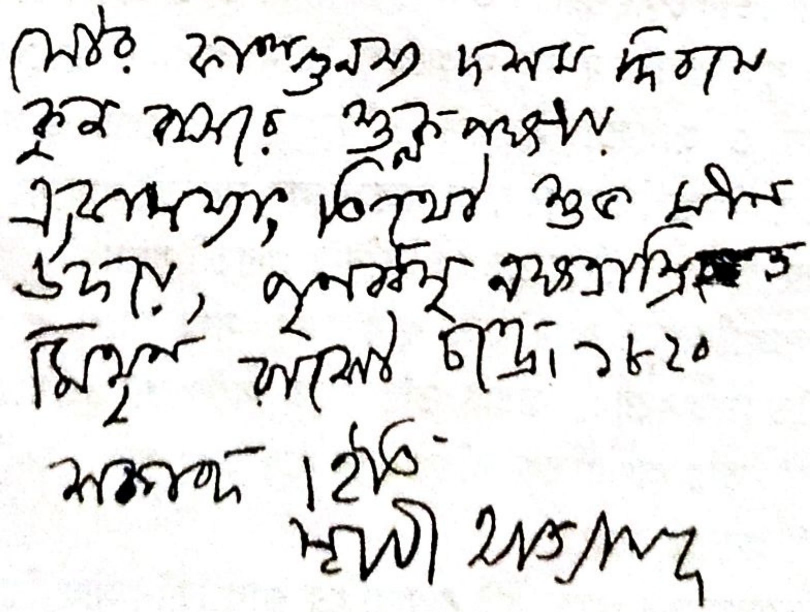
যুগাচার্য্যপরিকর পূজ্য বড় স্বামীজী : জ্যোতিষীর দৃষ্টিতে

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দ্বিতীয় সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দজী মহারাজ তাঁর দীর্ঘ সাধন ও নিষ্কাম কর্ম্মময় জীবনের অবসানে শ্রীগুরুচরণে লীন। তিনি ছিলেন যুগাবতার আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের আবাল্য লীলাসহচর। যুগপুরুষ স্বকর্ম্ম সাধনের জন্য যে সকল লীলাপার্ষদ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি তাঁদের ভিতরে কেবল অন্যতম নহেন—প্রধানতম। সংসারের আবিলতা স্পর্শের পূর্বেই কৈশোরে ছাত্রাবস্থাতেই ভাগবত পুরুষের সংস্পর্শে আসেন এবং সহজাত বৃত্তির প্রভাবেই মহাপুরুষের সান্নিধ্যে তাঁর ত্যাগ-বৈরাগ্য জাগ্রত

হয়। স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে কলেজে প্রবেশ। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সংসার ত্যাগপূর্ব্বক তপস্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন হৃষীকেশ স্বর্গাশ্রমে। অতঃপর আচার্য্যদেবের দুর্বার আকর্ষণে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ফিরে আসেন তাঁর শ্রীচরণে। সে সময় থেকেই আচার্য্যদেব-প্রবর্ত্তিত মানবকল্যাণ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন তিনি। সঙ্ঘ গঠনের প্রথম থেকেই তিনি ছিলেন সংস্থার সহ-সভাপতি। অতঃপর সঙ্ঘাচার্য্যের মহাপরিনির্বাণের পর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে সভাপতির বরণীয় পদে অধিষ্ঠিত হন।

স্বামীজীর প্রামাণিক জন্মতিথি

অধিক বয়সে ভক্তগণ কর্ত্তৃক সনির্ব্বন্ধ ভাবে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি আপন জন্ম তিথি ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথি ব'লে নির্দ্দেশ করেন। অত বয়সে অত দিনের স্মৃতি যা তাঁর মনে এসেছে তা-ই বলেছেন। কিন্তু তিথিটা অষ্টমী নয়—একাদশী। পূজ্য বড় স্বামীজীর পূর্ব্বাশ্রমের নিকটতম আত্মীয় ও প্রতিবেশী এবং সন্ন্যাস জীবনে সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক পূজ্য শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দজী কলাগাছিয়ার পৈতৃক বাড়ীতে পূজ্য বড় স্বামীজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জীবন মৈত্র মহাশয়কে চিঠি লিখে মৈত্র পরিবারের সংরক্ষিত খাতা-পত্র থেকে এই তথ্য পূর্ব্বেই সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন। স্বামী আত্মানন্দজীর হস্তাক্ষরসম্বলিত সেই তথ্যের ব্লক নিম্নে ছাপা হলো ঃ—



অতঃপর আর কোন বিরোধ থাকছে না। তবে কোন কোন ভক্ত আবেগবিদ্ধ হতে পারেন। কিন্তু আবেগ কখনো সত্য জীবনী নয়— ইতিহাসও নয়। পূজ্য স্বামীজীর সমগ্র জীবনের যা মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য তার সঙ্গে মিলবে না, যদি অষ্টমী তিথি ধরা হয়।

পূজ্য স্বামীজীর কুষ্ঠিপত্র

দিল্লীর প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ডঃ ডি. ডি. মেহতা (M.A., LLB. Ph. D. (Astrology) B.H.V. (1955) স্বামী আত্মানন্দজীর সংগৃহীত ঠিকুজী অনুসারে গণনা ক'রে যা বলেছেন তা হুবহু মিলে যায় পূজ্য স্বামীজীর মহাজীবন সম্বন্ধে। তিনি বলেছেন—

এই ঠিকুজী আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিশিষ্টধর্ম্মী (one of the most outstanding Charts, Specially on the spiritual field). তিনি সাধারণ জীবের ন্যায় কর্ম্মক্ষয়ের জন্য জীবন ধারণ করেন নি। শ্রীগুরু-প্রদত্ত বিশ্বকল্যাণ-যজ্ঞে আত্মোৎসর্গের জন্যই তাঁর শুভজন্ম। ধর্ম্মস্থানে নবম পতির স্বামী শনি স্বগৃহে দৃষ্টি করায় তাঁকে অনুভবপরায়ণ সিদ্ধাত্মায় স্থাপন করেছে। বুধের গৃহে মিথুনে মঙ্গলের অবস্থান তাঁকে করেছে সর্বধর্ম্মের প্রতি উদার। নবম গৃহে বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকায় তিনি স্নেহপরায়ণ ও সমদর্শী। ধর্ম্ম ও ভক্তির নবম স্থানে গুরু বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকাতেই তিনি আবাল্য গুরুগতপ্রাণ। স্বপনে ও জাগরণে সর্বক্ষণ শ্রীগুরুই তাঁর ধ্যেয় ও মননীয়। তিনি যা কিছু শিক্ষা দেন, যা কিছু বলেন, সমস্তই গুরুশরণাগতির নিষ্ঠায় পূর্ণ। শনির প্রভাবে তিনি ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী।

সভাপতিরূপে স্বামীজীর কার্যকালে সঙ্ঘ দেশে ও বিদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। যারাই তাঁর পূত সংস্পর্শে এসেছে তারা সকলেই তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রভাবে মুক্ত এবং সঙ্ঘের জনহিতকর কার্য্যে অনুরক্ত হয়েছে।

তিরোভাবের পূর্বে দুই বৎসরাধিক কাল তিনি আধ্যাত্মিক ভাবে

অন্তর্লীন হয়ে স্বীয় প্রকোষ্ঠে অবস্থান করতেন ; প্রয়োজনে স্থূল জগতে অবতরণ করে অর্দ্ধবাহ্য দশায় সংক্ষিপ্ত বাক্যে সঙ্ঘের অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্মের নির্দ্দেশ দিতেন। শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের ন্যস্ত দায়িত্ব সম্বন্ধে শেষ দিন পর্য্যন্ত অবহিত ছিলেন। দর্শনার্থীরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে দর্শন ও আশীর্ব্বাদ লাভের সুযোগ পেত। যদিও তিনি মুখে কিছু বলতেন না, তথাপি দর্শনার্থীর সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকের মুখে শুনেছি, তারা যে প্রশ্ন বা সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হতো মহাপুরুষের স্পর্শ ও আশীর্বাদেই তার উত্তর বা সমাধান আপনি পেয়ে যেতো।

সর্বনিয়ন্তা নিজ কার্য্য সাধনের জন্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, পবিত্র আত্মাকে তপোলোক থেকে আকর্ষণ ক'রে আনেন। পূজ্যপাদ স্বামীজী তেমনি এক শুদ্ধ, বুদ্ধ মহাপুরুষ। এই অমর আত্মার মৃত্যু নেই।

হে মহাপ্রাণ, লহ প্রণাম!

—স্বামী বিকাশানন্দ

স্বামী সচ্চিদানন্দ ঃ এ মহাজীবন ছিল সচল ত্রিবেণীতীর্থ

পাঞ্চভৌতিক দেহের সীমায়িত আবরণের ঊর্দ্ধে আজ তিনি। অসীমে অনন্তে আজ তিনি মিলে মিশে রইলেন। শ্রীগুরুর মহাভাবে ভাবিত মহাপ্রাণ আজ আনন্দলোকে। তাঁর আশীর্বাদ আনন্দলোক হতেই ঝরে পড়ুক মৃত্যুলোকে অমৃতের বার্তা নিয়ে বারে বারে।

কাশীর পূজার পূর্বেই তো তাঁর একান্ত সেবককে বলেছিলেন, —"যোগানন্দ স্বামীজীকে বল, যেখানে যেখানে যা যা সই করতে হবে, করিয়ে নিক।" এমন কথা বেশ বারে বারেই বলেছেন। কিছুদিন হ'তেই মাঝে মাঝে বলতেন, "অনেক দিন আসা হয়েছে, এখন যাই।"

যুগে যুগে যুগ-প্রয়োজনে যুগদেবতারূপে যখন শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হন, সঙ্গে নিয়ে আসেন মুক্তাত্মা দেব-পুরুষদের তাঁর লীলা-সহচররূপে। রামায়ণ, মহাভারতের সেই পুরাতনী কথা আবার যেন সত্য হয়ে নবরূপে চিত্রিত হলো সঙ্ঘের এই মহিমান্বিত সন্তানদের জীবনে।

এমনি স্বভাবে যোগস্থ, জীবনের প্রতিপদক্ষেপে আর সঙ্ঘকর্মের মত ব্যস্ততার মাঝেও ফল্গুধারার ন্যায় বয়ে চলেছে সাথে সাথে সেই অন্তর্লীন ভাবটি। শ্রীগুরুনির্দেশ প্রথমাবধিই ছিল তাঁর প্রতি—

"এমনি অবস্থায় সর্বদা থাকিতে চেষ্টা করিবে যেন বহির্জগতের কোন কিছু তোমাকে স্পর্শ করিতে না পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরিদৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থ বিস্মৃতি-সাগরের অতলতলে নিমজ্জিত না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিবেক-বৈরাগ্য লাভ হইবে না। মনকে এই জগৎ হইতে সরাইয়া লইয়া যতই অন্তর্জগতের দিকে লইতে পারিবে ততই মন স্থির হইবে ও বিবেক বৈরাগ্যলাভ হইতে থাকিবে।"

শেষের ক'টি বছর আত্মস্থ এ মহাভাবটি অন্তরের মণিকোঠা ছেড়ে বাইরের দৈনন্দিন ব্যবহারে আত্মপ্রকাশ করতে চাইলো সর্বভাবে। খাওয়া-পরায়, দেখা-শুনায়, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সর্বাবস্থায়ই যেন ভাবান্তর। এ আত্মস্থ ভাবটিই পরম আত্মায় চিরতরে স্থির হয়ে গেল সেদিন।

ইংরাজী বছরের প্রথম মাসটিতেই শুক্লপক্ষের অমৃতযোগে সন্ধ্যারতির শেষে শ্রীগুরুপূজার চরণামৃত পান করে, রাত্রি ৮-১০ মিঃ স্বামী সচ্চিদানন্দ—সৎ, চিৎ, আনন্দে মিলিয়ে গেলেন। ১৯৪১ সালের ৮ই জানুয়ারীর শিবগুরু স্বামী প্রণবানন্দের লীলাবসানের দিনটির সঙ্গে আশ্চর্য্য মিল রেখেই স্বামী সচ্চিদানন্দের এ মহাপ্রয়াণ।

মাদারিপুর মহকুমার কলাগাছিয়া গ্রামের স্বচ্ছল ব্রাহ্মণ পরিবারের বৈরাগ্যসুন্দর সপ্রতিভ ছাত্র কুমুদ মৈত্র বাজিতপুরের রাজকুমার

এডওয়ার্ড উচ্চ বিদ্যালয়ে যেদিন উঁচু শ্রেণীর বিদ্যার্থী সাধু বিনোদের সান্নিধ্যে আসেন, সেদিন থেকেই জহুরী যেমন জহর চিনে তেমনিই প্রাণারাম দেবতা তাঁকে চিহ্নিত লীলাপার্ষদরূপে চিনে নেন। সাধু বিনোদই আত্মপ্রকাশ করেন পরে যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ-রূপে, আর কুমুদ পরিচিত হন তাঁরই প্রথম প্রধান শিষ্য স্বামী সচ্চিদানন্দরূপে।

বাজিতপুরের ছাত্রজীবনের পর কলিকাতার সেণ্ট্রাল কলেজে, কাশীর মঠে, গঙ্গার ঘাটে, হিমালয়তীর্থ হৃষিকেশের স্বর্গাশ্রমে ক'টি বছর কেটে গেল। দূরে নিকটে, নানা অবস্থান্তরে, নানা পরীক্ষায় কুমুদের উর্দ্ধমুখী ভাবরাজি আরও পুষ্ট, আরও স্থির, আরও তন্মুখী হলো।

এবার শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কাছে, তাঁর কাজে কুমুদকে একেবারে টেনে নিলেন। ইং ১৯২৪ সালে বাজিতপুরের সিদ্ধপীঠে ত্যাগ-ব্রতে মহাদীক্ষা গ্রহণ করলেন তিনি। সে এক মহামাহেন্দ্রক্ষণ। সম্মুখে বেদমন্ত্রে প্রজ্জ্বলিত পূত হোমানল শিখা। উর্দ্ধগগনে আলোকদূত চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা। শান্ত গম্ভীর নাদে শ্রীগুরু বিশ্বনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো মহামুক্তি-মন্ত্র। মুহূর্ত্তের তরে যেন শান্ত হলো বিশ্বপ্রকৃতি, ক্ষণের তরে স্তব্ধ হলো সব কল-কোলাহল। জন্মজন্মান্তরের সব বাসনারাশি নিমেষে নিঃশেষ হলো। শ্রীগুরুকরুণার মহামুক্তি-সরোবরে কুমুদ-কলি বিকশিত হলো শতদলে নবরূপে নবনামে।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর যুগদেবতার ধর্ম ও কর্মচক্রের অনুবর্ত্তনে সহসাথীদের নিয়ে এবার তার গতি হল বিরামহীন, অতন্দ্র।...... সঙ্ঘের জন্মলগ্ন হতেই এ মহাসঙ্ঘের সহ-সভাপতি স্বামী সচ্চিদানন্দ। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাবসানের পর ইং ১৯৪১ সালে সঙ্ঘ-সভাপতিরূপে বৃত হলেন অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্মিত সঙ্ঘরূপ বিরাটহর্ম্মের তিনি ছিলেন প্রধানতম স্তম্ভ। শ্রীগুরুগতপ্রাণ সে মহাপ্রাণ ছিলেন অধ্যাত্ম-

জগতের পথিকৃৎ। জ্ঞান-বৈরাগ্যপূত তাঁর মহাজীবন ছিল চির উজ্জ্বল ধ্রুবতারা। সন্ন্যাসের গাম্ভীর্য্য, মানবতার ঔদার্য্য, ব্যক্তিত্বের বিশালতা আর সেবকের দীনতা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় নানা নদীধারার ন্যায়ই তাঁর মহাজীবন-সাগরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন,—"তুমি হবে সঙ্ঘের মা"। সত্যি তিনি সঙ্ঘের মা-ই ছিলেন। মমতাভরা প্রাণ নিয়ে সুখে-দুঃখে তিনি ছিলেন সর্বজনের পরম আপন। তাঁরই স্নেহ-পক্ষপুটে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল সঙ্ঘ-সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা আর সহস্র সহস্র মানুষ লালিত পালিত হয়েছে আকণ্ঠ তাঁর স্নেহরস পান করে। সস্নেহ শাসন আর বর্ণময় ভালবাসায় সে মাতৃত্বের ভূমিকা ছিল মহান্ শান্তির, পরম মধুময়। তাই তাঁর অদর্শনে আজ মাতৃহারা শিশুর ন্যায় নারী-নর, বালবৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই কেঁদে পাগলপারা।

শঙ্করাচার্য্যের বিবেক-বৈরাগ্য, বুদ্ধের ত্যাগ ও চৈতন্যের প্রেম—এ তিনটি পুণ্যধারার সম্মিলনে স্বামী সচ্চিদানন্দের পূত জীবন ছিল সচল ত্রিবেণী-তীর্থ।

যখন ভাববিভোর হয়ে শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলী থেকে তিনি "দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াত, কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চতি আশাবায়ুঃ ভজগোবিন্দম্, ভজগোবিন্দম্, ভজগোবিন্দম্ মূঢ়মতে"......ইত্যাদি পড়তেন আর পড়াতেন, এর মর্মার্থ শুনতেন আর শুনাতেন, তখন অপরূপ দিব্য-ভাবে তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে যেতো! কি মগ্ন হয়েই না তিনি গাইতেন—"মন তুমি কি চিরজীবী! দিন কি তোমার এমনি যাবে, দেহপিঞ্জর হলে ভঙ্গ প্রাণবিহঙ্গ পলাইবে" অথবা "এ মায়াপ্রপঞ্চময় ভবরঙ্গ-মঞ্চ মাঝে রঙ্গের নট নটবর হরি যারে যা সাজান সে তাই সাজে"-এ গানগুলো! আচারে-আচরণে, অশনে-বসনে তাঁর সহজ বৈরাগ্যময় জীবন সন্ন্যাসী, যোগী বিরক্ত পুরুষ আর সাধকদের চিরদিনের আদর্শ হ'য়ে থাকবে।

শ্রীবুদ্ধের জীবনে দেখি ত্যাগ ও বৈরাগ্যকে তীব্র সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা পেতে হয়েছে। মৃত, পীড়িত, বৃদ্ধ আর সন্ন্যাসীকে দেখে ঘটনা-সংঘাতে তথাগতের জীবনে বৈরাগ্য জাগে। মারের সঙ্গে সংগ্রাম করে আর সংকল্পে দৃঢ়তা রেখে সাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ। স্বামী সচ্চিদানন্দের জীবনে ত্যাগের প্রতিষ্ঠা অত আঁকাবাঁকা পথ ধরে চলেনি। নানাস্তরে কিছু কাঠিন্য ছিল সত্য, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল তাঁর ত্যাগ ও বৈরাগ্যসাধনা এবং তা যেন জন্মগত। তাঁর জীবনাকাশ প্রথমাবধিই ছিল মায়ামোহের মেঘমুক্ত। শ্রীগুরুকৃপার সূর্য্যালোকে তা একদিন আলোকময় হয়ে উঠলো অন্তরে বাহিরে।

শ্রীচৈতন্যের প্রেমের ন্যায়ই ভাগবতপ্রেমে তথা শ্রীগুরুপ্রেমে তিনি ছিলেন মাতোয়ারা, শয়নে-স্বপনে, ধ্যানে-জ্ঞানে, প্রতিবাক্যে, প্রতিকার্য্যে সর্বদাই শ্রীগুরুভাবে মগ্ন তিনি। শ্রীচৈতন্যের প্রেমের ন্যায় স্বামী সচ্চিদানন্দের প্রেমের ধারাও দুইটি বিশেষ খাতেই সদা প্রবাহিত হতো।

ভাগবতপ্রেম আর আচণ্ডালে প্রেম তাঁর কাছে ছিল একই। তাইতো দেখি, মৎস্যব্যবসায়ী সমর কাছে এলে তাকে আরও কাছে টেনে নেন, মৌড়লা মাছের গল্প করেন, তার আয়ের কথা ভাবেন, সংসার চলে কেমন করে জিজ্ঞেস করেন, হ'য়ে যান তার পরিবারের একান্ত আপনজন। তাই, ৮ই জানুয়ারীর সেই মহাসমাধিতে শায়িত তার প্রাণদেবতাকে দেখে সহস্র সহস্র শোকার্ত্ত মানুষের মাঝে সমর গগনভেদী আর্ত্তনাদে কেঁদে কেঁদে মেঝের ধূলোয় গড়াগড়ি যায়।

কলিকাতায় রবীন্দ্র-সরোবরের ধারে লিলিপুল পার্কে প্রাতঃ ভ্রমণকালে দেখি, পার্কের মালী শান্তি, ভিকু, নটেন, মাপুয়া, ইস্রা, কমল বাহাদুর, চোঙ্গা ওরাং আরও অনেকে এবং ওদের ছেলেপুলেদের হাতে প্রসাদ দিচ্ছেন তাদের বাবা, তাদের মহাত্মাজী। তাদের সংসারের সুখ-দুঃখের খবর নিচ্ছেন, মাথায় হাত দিয়ে বারে বারে অভয় আশ্বাস আশীর্ব্বাদ দিচ্ছেন।

ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলে দেখি সমাজের দরিদ্রতম অবহেলিত লোধা-সাঁওতাল মেয়ে পুরুষেরা দেখে তাঁকে দু'হাত তুলে মনের আনন্দে বলে উঠছে, আমাদের ভগবান্ এসেছেরে, আমাদের ভগবান্ এসেছে।

পতিত, দলিত, ব্যথিত, আর্ত্তের মাঝে আর বন্যায়, দুর্ভিক্ষে, নানা আপদে বিপদে সঙ্ঘের মানবসেবার মহান্ কর্মে দীনের দেবতা এ মহামানবের আদর্শ ও আশীর্বাদ চিরদিন প্রেরণা যোগাবে।

বাজিতপুর সিদ্ধপীঠ। ইং ১৯৩৫ কি ৩৬ সালের কথা। জনৈক স্বামীজী তখন ব্রহ্মচারী ননী। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ তাঁকে বল্লেন—"দেখ, ঐ যে স্বামীজীকে দেখছিস, শরীরে কোনও চাকচিক্য নাই, চোখ দুইটি যেন কোটরাগত, জামা কাপড়ে কোনও চোখ ঝল্সানো রং চং নাই, অল্প অল্প কথা বলেন, সকলের পেছনে থাকেন, সব কাজ করেন—উনি এই সঙ্ঘের খুব বড় সাধক"। ঠিক এমনি কথা। সম্ভবতঃ ইং ১৯৪২ সাল। স্বামী কৃষ্ণানন্দজী সেবক সত্যেনকে বল্লেন—ঐ যে দ্যাখ, কোণে দাঁড়িয়ে আছেন—সবার পেছনে, সবার আড়ালে, উনিই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সভাপতি।"

আত্মপ্রতিষ্ঠায় মত্ত মানুষ যে যুগে বল্গাহীন অশ্বের ন্যায় কেবলি ভূমণ্ডল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, সে যুগেই স্বামী সচ্চিদানন্দজী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ন্যায় মহাসঙ্ঘের শীর্ষদেশে থেকেও একান্তভাবেই ছিলেন আত্মপ্রচারে বিমুখ। সঙ্ঘদেবতার প্রতিষ্ঠা আর সঙ্ঘের প্রচার-প্রসারের মাঝেই ছিল তাঁর আত্মতৃপ্তি। তাঁর সুদীর্ঘ সভাপতিত্বকালেই সঙ্ঘ দিকে দিকে, দেশে-বিদেশে, শাখা-প্রশাখায়, নানাভাবে নানারূপে প্রচারিত, প্রসারিত, প্রতিষ্ঠিত হলো। বহুর মাঝে নিজেকে পাওয়ার সাধনাই তো ভারতের শাশ্বত সাধনা। স্বামী সচ্চিদানন্দ ছিলেন সে সাধনায় সিদ্ধযোগী, সে সাধনার মূর্ত প্রতীক।

হিন্দু সমাজের নবজাগরণে, হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে, ভারত-

সংস্কৃতির সম্প্রসারণে মানব সেবাব্রতে তাঁর আলোকিত জীবনের অম্লান স্নিগ্ধজ্যোতিঃ আমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোকের পথে নিয়ে যাক্—এই প্রার্থনা।

—স্বামী বুদ্ধানন্দ

এক অনির্বাণ শিখা

তিনটি ছবি। আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন—কিন্তু পরপর সাজালে তাতেই ধরা পড়ে এক মহাজীবনের ব্যাপ্তি।

১৯২০ সাল। বাজিতপুর সেবাশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য কুমুদ এবং মধু নামে দুজন সেবককর্মী এসেছেন খুলনায়, এসে তাঁরা শুনলেন, সেখানকার উকিল জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের গৃহশিক্ষক তাঁর বাড়িতে অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন। তাঁকে দেখার কেউ নেই। কথাটা শুনেই কুমুদ তাঁর সঙ্গী মধুকে নিয়ে লেগে গেলেন সেই ব্যক্তির সেবায়। কিছুদিন পরেই মারা গেলেন সেই ব্যক্তি। জ্যোতিষবাবু কিন্তু মুগ্ধ হলেন কুমুদ-দের অক্লান্ত সেবা আর বৈরাগ্য দেখে। তিনি নিজেই তখন শহরের বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সংগৃহীত হলো সেবাশ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ।

দ্বিতীয় ছবি ১৯৩০/৩৫ সালের। কলকাতার বালীগঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ তখন রয়েছেন সেখানেই। কুমুদ তখন সঙ্ঘের বিশিষ্ট সন্ন্যাসী কর্মী। ত্যাগ ও সেবায় অক্লান্ত। পুরীর সঙ্ঘের কাজ করে সারা রাত ট্রেণে জেগে সেদিনই এসে পেঁছেছেন আশ্রমে। স্নান শেষে বসেছেন গুরুদেবের চরণতলে তাঁর আদেশের অপেক্ষায়। স্বামী প্রণবানন্দ কিন্তু নির্বিকার। তিনি ক'রে যাচ্ছেন তাঁর কাজ। অদ্ভুত সন্তানটির দিকে তাঁর যেন নজরই

নেই। অন্যান্য সন্ন্যাসীরা তখন সন্ন্যাসী কুমুদকে বলছেন আহার করে নেবার জন্য। কিন্তু গুরু যেমন নির্বিকার, শিষ্যও তেমনি। গুরুর আদেশ ছাড়া তো তিনি গ্রহণ করতে পারেন না কিছুই। তাই যেমন ছিলেন তেমনিই বসে থাকেন। আচার্য্য প্রণবানন্দ লক্ষ্য করেন সব, কিন্তু বলেন না কিছুই। অন্যান্য সন্ন্যাসীরা যখন আচার্য্যের অন্তরঙ্গ ওই সন্ন্যাসীটিকে বারবার আহার করার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন তখন অকস্মাৎ-ই আচার্য্য যেন গর্জে ওঠেন। বলেন, দু-একদিন না খেলে কি হয়? ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক দু তিন দিন অন্তর অন্তর একদিন খেতে পায়। সেই বুভুক্ষু ভারতে দু-এক বেলা না খেলে কিছু হয় না। আচার্য্যের সে কথায় সবাই নীরব। কিছু পরেই তিনি অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসীটিকে আহার করতে বললেন। কিন্তু তার আগে ত্যাগ, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা পালনের মধ্য দিয়ে তাঁকে করে তুললেন আরো সংযমী, আরও কঠোর—ভারতের করুণচিত্র তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরলেন আর সন্ন্যাসী কুমুদও আচার্য্যের অভীপ্সা বুঝে নীরবে সেই আদর্শকে দৃঢ় করে ধরলেন।

তৃতীয় ছবি বারাণসীর। কাশীতে নিজস্ব জমিতে তৈরি হচ্ছে সংঘের নিজস্ব আশ্রম। যে জমিতে আশ্রম হবে তার মধ্যে রয়েছে একটি পুকুর। আচার্য্য প্রণবানন্দের নির্দেশে সেই পুকুর ভরাটের কাজ তদারকি করছেন সন্ন্যাসী কুমুদ। বারাণসীর গ্রীষ্মের সেই প্রচণ্ড তাপের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে তিনি করাচ্ছেন কাজ। মাথায় তাঁর একটি ছেঁড়া ছাতা। গাধার পিঠে করে আসছে বালি। সেই তপ্ত বালি উঠে এসে লাগছে গায়। তিনি কিন্তু নির্বিকার। একমনে গুরুর আদেশে করিয়ে যাচ্ছেন কাজ। তাঁর অন্তর তখন গুরুচরণগত—বাইরের ইন্দ্রিয় গুরুর নির্দেশিত কাজে সক্রিয়।

তিনটি ছবির এই কুমুদই হলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সদ্যপ্রয়াত সঙ্ঘগুরু স্বামী সচ্চিদানন্দ। ফরিদপুর জেলার

কলাগাছিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে তাঁর জন্ম। পূর্বাশ্রমে নাম ছিল তাঁর কুমুদবন্ধু মৈত্র। ১৯১১ সাল নাগাদ ছাত্রাবস্থাতেই তিনি আসেন স্বামী প্রণবানন্দের সংস্পর্শে। আচার্য্য সেদিন চিনে নিয়ে ছিলেন তাঁর উত্তর-সূরীকে। তাই আর সবার থেকে আলাদা করে তিনি তাঁকে দিতেন শিক্ষা। তাঁর বৈরাগ্যে ভরা হৃদয়কে করে তোলেন আরো বৈরাগ্যময়। তাঁরই পরিণতিতে কুমুদ-বন্ধু স্বামী প্রণবানন্দজীর কাছে সন্ন্যাস নিয়ে হন স্বামী সচ্চিদানন্দ। ধর্ম এবং কর্ম-কে জীবনের ব্রত করে এগিয়ে যান তিনি জীবনের পথে। হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে তিনি যেমন করেছেন আত্মমুক্তির সাধনা, তেমনি দেশের দুর্গতময় অঞ্চলে প্রলয়ঙ্কর দুর্যোগের মধ্যে দাঁড়িয়েও করেছেন দুর্গতদের সেবা। তাঁর সাধনার এই দ্বিমুখী রূপ দেখে মানুষ ভক্তিনম্র অন্তরে অবনত হয়েছে তাঁর পায়ে। গুরুনির্দেশিত পথে—গুরুর বাক্যে প্রগাঢ় ভক্তি ও আস্থা রেখে করে গেছেন কাজ। অধ্যাত্মসাধনায় দুর্গতদের সাধনায় ঋদ্ধি ও সিদ্ধি ছিল তাঁর করতলগত—সেই স্বামী সচ্চিদানন্দ দীনের থেকে দীনের কাছেও গেছেন নিরহঙ্কার হয়ে—কাছে টেনে নিয়েছেন তাঁদের। ১৯৪১ সালের ৮ জানুয়ারি স্বামী প্রণবানন্দের দেহত্যাগের পর সংঘের দ্বিতীয় সভাপতি রূপে তিনি মাথায় তুলে নেন কর্মভার আর সে কর্মযজ্ঞ সমাপণ করে ১৯৮৯ সালের সেই ৮ জানুয়ারিই তিনি লীন হলেন গুরুর চরণে। এ কি নিছকই একটি সাদৃশ্য—গুরুর অফুরন্ত করুণায় শিষ্যকে নিষ্ণাত করার এ এক মহান্ অনন্য মুহূর্ত। ঘটনা যাই হোক তাঁর আদর্শের অগ্নিশিখা সংঘের মধ্যে থাকবে অনিবার—অনির্বাণ।

—পরিব্রাজক [যুগান্তরের সৌজন্যে]

পূজ্য বড় স্বামীজীর সম্বন্ধে টুক্‌রো কথা

(গ্রন্থ-সম্পাদকের পুরাণো ডায়েরি)

শ্রীগুরুর আজ্ঞাধীন অক্লান্ত কর্ম্মী

কাশীধামে সঙ্ঘের প্রস্তাবিত নূতন আশ্রমের জমি ভরাটের কাজ চলছে। খচ্চরের পীঠে মাটি আনা হচ্ছে। কাশীতে খচ্চরের দল ভার বহন করে। এই কাজের দেখাশুনা করছেন বড় স্বামীজী। স্বামী পরমানন্দজী একদা কথা প্রসঙ্গে সেই বিষয়ের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন। বলেন—"আমি যেদিন দেখেছি যে কাশীধামের নূতন জমি ভরাট কালে স্বামী সচ্চিদানন্দজী প্রখর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে মাটি বহনকারী খচ্চরের দলের হিসাব রাখছেন, সেই দিনই বুঝেছি তিনি শ্রীগুরুর আজ্ঞাধীন কত বড় একনিষ্ঠ ও নিরলস কর্ম্মী। উত্তর ভারতে গ্রীষ্মের তাপ যেন অগ্নিবর্ষণ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রৌদ্রে দাঁড়িয়ে খর তাপ অগ্রাহ্য ক'রে বিল্ডিং-এর কাজ দেখাশুনা করতেও তাঁকে দেখেছি। এই কর্ম্মের ভিতরই লক্ষ্য করেছি তাঁর কঠোর তপস্যা।"

নিরভিমান গুরুভক্ত

স্বামী পরমানন্দজী ব'লে চলেছেন। সে আর এক দিনের অবিস্মরণীয় ঘটনা।

"২৪।৩, মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তখন সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়। একদিন শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব আমাকে বলেন—'সেলাই করতে জানিস? আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই ভাবে কাপড়ের দুটো মুখ একত্র ক'রে ধরবি, এইভাবে সূঁচের ফোঁড় তুলবি, তা হলেই সেলাই হয়ে যাবে।'

একটা ছেঁড়া সামিয়ানা সেলাইয়ের ভার পড়লো সেবকের উপর। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ শ্রীহস্তে শিখিয়ে দিলেন কাজটি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়েছি, সেলাই করার কাজ তো শিখিনি। সাধুজীবনে সব কাজই শিখতে হয়, সব কাজই করতে হয়।

ছাদের উপরে সকালে সামিয়ানাটা বিছিয়ে নিয়ে সেলাই আরম্ভ করেছি—তেমনি ভাবে কাপড়ের দুমুখ এক ক'রে ফোঁড় তুলছি। দেখতে দেখতে ছাদে রোদ এসে গেল। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রৌদ্রের তেজঃ হলো প্রখর থেকে প্রখরতর। ক্রমে দুঃসহ। আমি ঘর্ম্মাক্তকলেবর। দ্বিপ্রহর এগিয়ে আসে। ও! অসহ্য!

সহসা ছাদে আসেন আচার্য্যদেব। কাজটা কত দূর এগুচ্ছে কি ভাবে হচ্ছে তা তো দেখবেনই আর এই দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড তাপে সন্তানের কি কষ্ট হচ্ছে তাও দরদী পিতা প্রত্যক্ষ করবেন বৈকি। আমার কষ্ট দেখে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর উপর আদেশ হয় আমার মাথায় ছাতা ধরতে। কিন্তু দু'তিন বার বলা সত্ত্বেও তিনি নীরব। সম্ভবতঃ অভিমানে দ্বিধাগ্রস্ত। আমি যে Junior, আর তিনি Senior, বড় কি পারে ছোটর পরিচর্য্যা করতে? জানি না, এ অবস্থায় পড়লে আমার নিজের মনে কি প্রতিক্রিয়া হতো, নির্ব্বিচারে তাৎক্ষণিক উদ্যোগে এ কাজ করতে পারতাম কি না। কিন্তু একজন পারলেন।

উক্ত সন্ন্যাসীর অনীহায় আচার্য্যদেব মনে মনে রুষ্ট, তা বুঝতে পারলাম। ঠিক সেই সময়ে শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দজী ছাদে এসেছেন। আচার্য্যদেব তাঁকেই আদেশ করেন ছাতা ধরতে। তিনি আমাদের গুরু-ভ্রাতাদের ভিতর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আমি আশ্চর্য্য হয়ে দেখি, কিছু মাত্র না ভেবে, মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করে নির্দ্বিধায় তিনি ছাতা খুলে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন, আমাকে দিলেন স্নিগ্ধ ছায়া। তিনি জানেন—শ্রীগুরুর আদিষ্ট সকল কাজই কর্ত্তব্য। এতে মান-অভিমানের প্রশ্ন নেই। সঙ্ঘের কার্য্যে যে প্রাণপাত করছে, এমন সেবক ছোটই হোক বা বড়ই হোক, তাঁকে সাহায্য করা সঙ্ঘ ও সঙ্ঘনেতারই মহাপূজা।

পূজ্য স্বামীজীর গুরুভক্তি, গুরুগতপ্রাণতা, গুরুর আজ্ঞাবহতা, তাঁর সঙ্ঘনিষ্ঠা ও সঙ্ঘভ্রাতাদের সেবার আগ্রহ দেখে সেদিন আমি অতিমাত্র অভিভূত। সকল সঙ্ঘ-সন্তানের শিরোমণিরূপে সেই

দিনই আমি তাঁকে চিনেছি। মনে মনে জানিয়েছি সহস্র সশ্রদ্ধ প্রণতি।"

সেই ভিক্ষুকেরাই আজ বড় দাতা

উচ্চবংশের সন্তান, শিক্ষিত ও মেধাবী। কলেজের পড়া শেষ করে ডিগ্রি নিয়ে বড় চাকুরিয়া হতে পারতো, প্রচুর মান-সম্মানের অধিকারী হতো। সব ছেড়ে দিয়ে এলো বৈরাগীর দলে! ট্রেনে, ষ্টীমারে, পথে ঘাটে ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছে! গলায় দড়ি জুটলো না!—কি সুতীক্ষ্ন বাক্যশেল!

সঙ্ঘের সেই আদ্যিকালের কথা। খুলনায় নূতন আশ্রম হচ্ছে। পূজ্য স্বামী সচ্চিদানন্দজী ও পূজ্য স্বামী যোগানন্দজী ভিক্ষার বাক্স হাতে নিয়ে ট্রেনে ষ্টীমারে, পথে ঘাটে অর্থ সংগ্রহ করছেন। খুলনা বা কলকাতায় আসা-যাওয়ার পথে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনেরা এই দৃশ্য দেখতেন, আর ছুঁড়ে দিতেন চোখা চোখা তিরস্কার। প্রসঙ্গটা তুলে স্বামী পরমানন্দজী মন্তব্য করেন—"আজ তাঁদের আত্মীয়-পরিজনেরা দেখুন, সেই দিনকার সেই ভিক্ষুকেরাই হয়েছেন আজ বড় দাতা। লক্ষ লক্ষ বিপন্ন মানুষের সেবা করছেন—বিপদে ও বিপর্যয়ে, আর সংসারক্লিষ্ট মানুষকে দুহাতে বিতরণ করছেন আধ্যাত্মিক পরমামৃত"।

ইনি কি idiot?

পূজ্য বড় স্বামীজীর ছাত্রজীবনের কথা শুনাচ্ছিলেন শ্রীমৎ আত্মানন্দজী। উভয়ে একই বংশের একই গ্রামের সন্তান। পড়া-শুনাও করেছেন একই গ্রামের স্কুলে। উত্তরকালে উভয়েই সঙ্ঘের প্রথম থাকের প্রণম্য কর্ণধার।

বাজিতপুর হাইস্কুলের তাৎকালিক প্রধান শিক্ষক শ্রীবীরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য বাবা গম্ভীরনাথজীর গৃহস্থ মন্ত্রশিষ্য। বেশভূষায় তিনি ছিলেন বিশেষ মার্জ্জিত। বয়স তখন তাঁর ২৩।২৪। ধোপদুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবী বা কোট-প্যান্ট পরে স্কুলে আসতেন, দেখতেও ছিলেন খুব সুপুরুষ।

শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের (তখন বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী বিনোদ) সান্নিধ্যে এসে পূজ্য বড় স্বামীজীও (কুমুদ) তখন বৈরাগ্যমূর্ত্তি। ছোট ছোট চুল ছাঁটা, তেল না মাখা, হাঁটুর নীচে খাটো কাপড় পরা, আর শীত ও গ্রীষ্মে একটা কোট পরে স্কুলে আসা, উস্‌কো খুস্‌কো চেহারা—প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের পছন্দ নয়।

একদিন প্রধান শিক্ষক মহোদয় তিরস্কারের সুরে বলেন—"তুমি তো বনিয়াদী ঘরের ছেলে, পড়াশুনায়ও ভাল, কিন্তু ও-রকম idiot এর মত বেশভূষা কেন?" কথাটা কুমুদের (বড় স্বামীজী) মনে লাগে। তিনি তাঁর ভাবী গুরু আচার্য্যদেবের কাছে এসে সেই কথা বলেন। মহাপুরুষ শ্রীম লিখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' গ্রন্থ থেকে একখানা চিত্র বা'র করেন। ঐটি শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর সাধকগণের বৈরাগ্য-ভাবমণ্ডিত গ্রুপ ফটো। ছবি দেখিয়ে হেসে বলেন—"এরা কি সবাই idiot?

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেন্দ্র ক'রে একদা এক আধ্যাত্মিক মহাভাবের প্লাবন সৃষ্টি হয়েছিল। তার পর এই বঙ্গভূমির মাটিতেই আর এক মহাপ্লাবন আসছে এবং শ্রীমান্ কুমুদেরা তার ধারক ও বাহক—এই সার্থক ইঙ্গিতই সেদিন আচার্য্যকণ্ঠে উদ্‌গীত হয়েছিল কি?

স্বামী প্রণবানন্দের পুরুষের সংসার

বর্ত্তমান রচনার এই অংশের বক্তা স্বয়ং পূজ্য বড় স্বামীজী। ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮, অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা; স্থান—প্রধান কার্য্যালয়ে পূজ্য বড় স্বামীজীর বিশ্রাম-ভবন। উপস্থিত ছিলেন পূজ্য শ্রীমৎ যোগানন্দজী ও পূজ্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দজী সহ বর্ত্তমান গ্রন্থের সম্পাদক। তিনি যা বলেছিলেন তা আমার নিজের ভাষ্যে তুলে ধরছি।

বাজিতপুরের বিপিন মজুমদার পূজ্য বড় স্বামীজীর অন্যতম ভগ্নিপতি। বিপিন বাবুর পুত্র ক্ষীরোদ মজুমদার পরবর্তীকালে এড্‌ভোকেট হন। পূজ্য বড় স্বামীজী এই বাড়ী থেকেই বাজিত-পুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতেন। তিনি গোপনে আসতেন

সাধুর কাছে (আচার্যদেবের কাছে), যাতে বিপিন বাবু জানতে না পারেন। কিন্তু ভগ্নি তা জানতেন। বলতেন—"আমি জানি তুই কোথায় যাস্।" ভগ্নি বাধা দিতেন না এবং স্বামীর কাছেও প্রকাশ করতেন না। শ্রীমৎ যোগানন্দজী (তৎকালে মধু) আসতেন বিলাসখান থেকে ষ্টীমার যোগে চরমুগুরিয়া থেকে হেঁটে বাজিতপুরে। কখনো কখনো মাতুলবাড়ী (কলাগাছিয়া) থেকেও আসতেন। সাধুর কাছে আসা-যাওয়ার ব্যাপারে বিপিন বাবু না জানতে পারেন, সে বিষয়ে তিনিও ছিলেন সদা সতর্ক। একবার একাদশীর দিন সাধু তাঁকে দুধ-খই খাওয়ান।

একদিনের কথা। সাধু তখন দ্বিতীয় বার গোরক্ষপুর থেকে বাজিতপুর ফিরে এসে কঠোরতর যোগসাধনে নিরত। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তদীয় ভবিষ্য সঙ্ঘগঠনের পরিকল্পনা রূপায়ণের উদ্যোগও। কিন্তু সেটা তাঁর নিজের মনেই আছে, বাইরে কেউ বুঝতে পারছে না। তিনি ভুঁইয়া বাড়ীর পুকুরপাড়ের ঘরখানি চেয়ে নিয়েছেন, আর তার পাশেই একখানি সাধনকুটীর নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুগত যুবকদল নিজেরাই কুটীর নির্মাণে শ্রম দিচ্ছে। তিনি নিজেও অল্প অল্প কাজ করছেন। শ্রীহস্তে একখানি ধারালো কাটারি। কুমুদ আসছে গোপনে ভগ্নির বাড়ী থেকে। পথে ডাঃ শচীন মজুমদারের বৃদ্ধা জননীর সঙ্গে দেখা। পরিহাস করে বৃদ্ধা বলেন—"কি গো, তোমাদের সাধু কি গৃহস্থ হলো না কি ?"

ঘর বাঁধে গৃহস্থেরা। সাধু কেন ঘর বাঁধবে ? তাই বৃদ্ধার শ্লেষ। কিন্তু কুমুদের মনে কোন বিকার নেই, নেই কোনও সংশয়ও। সাধুর ঘর বাঁধার কাজে তাঁর যে রয়েছে বিরাট ভূমিকা। সাধুও হয়তো প্রতীক্ষা করছেন কুমুদেরই। কুমুদ এলে নিজ হাতের কাটারি খানা তুলে দেবেন তাঁরই হাতে। কুমুদ যে তাঁর চিহ্নিত উত্তরসূরী।

বৃদ্ধার বচন কুমুদকে বিচলিত করতে না পারলেও ঐ পরিহাস

তিনি ভুলতে পারেন কি? সাধুর কাণে কথাটা তো তুলতেই হবে। নচেৎ স্বস্তি কোথা? শুনে সাধু ক্ষণকাল স্থির। তারপরই স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—**হাঁ, সংসার তো একটা হবেই, তবে পুরুষের সংসার।"**

তাৎপর্য্যপূর্ণ উত্তর। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘই যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের পুরুষের সংসার! ঐ সাধন-কুটীরখানিই তদীয় মহতী সৃষ্টির প্রথম অঙ্কুর। আচার্য্যোত্তর কালে এই পুরুষের সংসারের কর্ত্তা হয়েছিলেন সেই দিনকার কুমুদ আমাদের পরম পূজ্য বড় স্বামীজী। এই লোককল্যাণ দিব্য সংসার রচনায় সেই দিনই তিনি হাত লাগিয়েছিলেন যুগাচার্য্যের প্রথম পার্ষদরূপে। আর জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত সেই ব্রত পালন ক'রে গেছেন। স্বামী প্রণবানন্দের পুরুষের সংসার তাঁর নেতৃত্বে সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়।

পরমারাধ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজী স্মরণে

ইংরাজী ১৯৭৮ সাল, ৮ই জুলাই। রথযাত্রার পুণ্য দিবস। পুরীধামে প্রতিবারের ন্যায় এবারও সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ ভোরের মঙ্গলারতির পর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা সেবাকার্য্যে চলিয়া গিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজ স্বর্গদ্বারস্থিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্য্যন্ত অগণিত ভক্ত নরনারীকে দর্শন, আশীর্বাদ প্রদান করিলেন। মধ্যাহ্নের পূজারতি সারিয়া তিনি বিশ্রাম কক্ষে। আহার ও বিশ্রামের পর বৈকালে আবার বারান্দায় উপবিষ্ট।

খবর পাওয়া গেল, এই দিনেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে ডায়মণ্ডহারবার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রণব বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শ্রীপ্রফুল্ল

কুমার সেন মহাশয় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

পূজ্য স্বামী যোগানন্দজীর টেলিফোনে জরুরী বার্ত্তা—আমাকে অবিলম্বে কলিকাতা ফিরিয়া যাইতে হইবে। স্বামীজী প্রত্যুত্তরে তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"স্বামীজী যখন ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন তখন আজই তুমি বিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় যাও।" তিনি আমার অন্তরের কথা অনুভব করিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে বলিলেন—"Reservation-এর প্রয়োজন কি?" তিনি ভাবিয়াছেন—আমি রিজার্ভেশন্ ছাড়া যাইতে পারিব না। তিনি আবার দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন—"জানো, Being the President of Bharat Savasram Sangha I have travelled several times without any reservation?" এই ভাবে তিনি সভাপতি হইয়াও তৃতীয় শ্রেণীতে রিজার্ভেশন্ ছাড়াই অসংখ্য বার যাতায়াত করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে কত ঝুঁকি লইতে হইয়াছে এবং দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। আমি সভয়ে প্রণাম নিবেদন করিয়া বলিলাম "আজই যাইব—রিজার্ভেশন হোক, চাই নাই হোক।" এই বলিয়া শ্রীচরণাশীর্বাদ লইয়া কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলাম।

এই প্রসঙ্গে কত কথাই স্মরণ হইতে লাগিল। সভাপতি হইয়াও তিনি অতি সাধারণভাবে সাদাসিধে ভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন—সঙ্ঘের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজকেও অতি নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি স্বহস্তে মন্দির পরিষ্কার করিয়াছেন, ভোগ নিবেদন করিয়াছেন, আবার আশ্রমের প্রবেশপথ ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়াছেন—এগুলি আমি নিজেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

সঙ্ঘের বর্তমান সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজীর মুখেও তাঁহাদের উভয়ের ছাত্রজীবনের কথা, সেবাকার্য্যের কথা বহুবার শুনিয়াছি। ছাত্রাবস্থায় তাঁহারা উভয়ে জগদ্‌বরেণ্য আচার্য্যবরিষ্ঠ স্বামী প্রণবানন্দজীর সংস্পর্শে আসেন। সর্বাগ্রে

আসিয়াছেন—শ্রীমৎ বড় স্বামীজী—বাল্য নাম কুমুদবন্ধু মৈত্র।

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের নির্দেশে ব্রহ্মচারী কুমুদ, ব্রহ্মচারী মধু উভয়ে খুলনায় আসিয়াছেন। আশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা দরকার। তাই উভয়ে আসিয়া দিনের বেলায় খুলনা সহরে ট্রেনে ষ্টীমারে অর্থ সংগ্রহ এবং রাত্রিতে জাগিয়া হাসপাতালে রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। খুলনা সহরে সঙ্ঘের পরিচিতি ছিল না। রোগীদের সেবা-পরিচর্য্যায় এবং তাঁহাদের সাধুতায় বিশিষ্ট নাগরিকগণ মুগ্ধ। এই কাজের মধ্য দিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়।

কলিকাতা আশ্রমে একবার শ্রীমৎ স্বামী ধীরানন্দজীর খুব জ্বর। পূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজীকে দেখিলাম নিপুণভাবে সেবা করিতেছেন, আমাদিগকে সেবা করার আদেশ করিতেছেন। একেই বলে "শিরদার তো সর্দ্দার।"

পাঠ্য জীবনে তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আবার সঙ্ঘজীবনে তথা অধ্যাত্ম জীবনেও তিনি প্রথম এবং প্রধান।

তাঁহার অধ্যাত্ম সাধনার কথা প্রচারিত না হইলেও অন্তরঙ্গ সন্তানদের নিকট কিছু কিছু আভাস দিয়াছেন—ইঙ্গিত করিয়াছেন।

ভারতের অন্যতম মহাসাধিকা মা আনন্দময়ী তাঁহার আশ্রিত সন্তান ডঃ ত্রিগুণা সেনকে (যিনি তখন ভাইস চ্যান্সলার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী) বলিয়াছেন—"ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ ভারতবর্ষে অন্যতম আত্মসমাহিত মহাপুরুষ।" সত্যই তাঁহার অধ্যাত্ম প্রজ্ঞা, আত্মপ্রত্যয় ও অন্তর্দৃষ্টি ছিল অপরিসীম। বেদান্তের "অহং ব্রহ্মাস্মি" মহাবাক্যের অনুভব শিক্ষাদান প্রসঙ্গে একদা বলিলেন—"সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিতে পারি—আমিই স্বয়ং

জগন্নাথ।" অধ্যাত্মনিষ্ঠায় নিরন্তর নিমগ্ন এই মহাসাধক লোক-শিক্ষার জন্য স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মযজ্ঞ উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন। আবার নিয়মিত ধ্যান, জপ, পূজা, উপাসনা, শাস্ত্রাধ্যয়নে স্বীয় নিষ্ঠার দ্বারা অপরকেও অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।" গীতোক্ত দৈবী সম্পৎ সমূহের পরিচয় তাঁহার চিন্তায়, কার্য্যে, আচরণে, চরিত্রে পরিস্ফুট দেখিয়াছি।

মহাত্মা তুলসী দাস গোস্বামীর দোঁহার কথা মনে পড়ে—

"তুলসী যব জগমে আয়ো
জগ হাসে তুম রোয়ে
এ্যায়সা করনী করকে চলো
তুম হাসে জগ রোয়ে।"

"যবে তুমি এসেছিলে এ নিখিল ভবে
একা তুমি কেঁদেছিলে হেসেছিল সবে
এমন জীবন হবে করিতে যাপন
মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।"

পূজ্য বড় স্বামীজীর অন্তিম যাত্রায় সহস্র সহস্র নরনারীর শোকাশ্রুবর্ষণে সেই দৃশ্য দেখিয়াছি। মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পুত্র-কন্যা, প্রিয়জন-পরিজনের বিয়োগে লোকে শোকে বিহ্বল হয়, চোখের জল ফেলিয়া থাকে, আর্তনাদ করে। কিন্তু একজন সর্বত্যাগী নিষ্কিঞ্চন, বিরাগী সন্ন্যাসীর দেহত্যাগে লোকে এত বেদনা অনুভব করে কেন? সন্ন্যাসীর সঙ্গে তো কোন রক্তের সম্বন্ধ থাকে না, তবে কেন এই অশ্রু বিসর্জন!

শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী তাঁহার বক্তৃতায় বলিতেন—সন্ন্যাসীর সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ তাই সন্ন্যাসীর কাছে সকলেই আত্মীয়। শ্রীমৎ বড় স্বামীজী পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনের চেয়েও বেশী আপন জন, নিকট আত্মীয়; আত্মার সঙ্গে একান্ত যোগসূত্র স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আর অনুরাগী শিষ্য ভক্ত-গণকে দিয়াছেন আত্মজ্ঞানের উপদেশ। —**স্বামী অশোকানন্দ**

স্মৃতিতর্পণে ভক্তিবিনম্র আকুতি

পরম পূজনীয় প্রয়াত শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ যুগাবতার আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের শুধু অন্তরঙ্গ লীলা পার্ষদ ছিলেন তা নয়, নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শ্রীগুরুসত্তার সঙ্গে নিবিড়তর ভাবে মিলাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীগুরুচিন্তা ইষ্টচিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা ক্ষণেকের তরেও অন্তরে স্থান দেননি। তিনি শ্রীগুরুভাবের আধ্যাত্মিকতার মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন এবং শ্রীগুরুপ্রসাদে সকলের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিতেন।

সঙ্ঘসভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর একদিন বিশ্রাম-মন্দিরে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"বাড়ীর মা যখন স্থূলদেহ ত্যাগ করেন তখন বাড়ীর বধূকে মা সাজাইতে হয়।" সত্যই ভগবৎ পুরুষ আচার্য্যদেবের স্থূলদেহের অবসানের পর পূজ্য বড় স্বামীজী সুদীর্ঘ ৪৮ বৎসর সঙ্ঘের মাতারূপে কনিষ্ঠ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, সেবকগণ ও সঙ্ঘাশ্রিত ভক্ত নরনারী সন্তান-সন্ততিগণকে স্নেহ-করুণা, আশ্বাস, আশীর্ব্বাদ দান করিয়া সঞ্জীবিত করিয়াছেন। একদিন উপদেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"সভাপতি পদে বৃত হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত পাদুকা ব্যবহার করি নাই, খালি পায়ে চলিয়াছি; কিন্তু কোন দিন পায়ে একটি কাঁটাও ফুটে নাই।" এবং বলিয়াছিলেন—"কাঁটা ফুটিবে কেন? গুরুচিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা ক্ষণেকের তরেও মনে স্থান পায় নাই।" তাঁর এই ঐকান্তিক গুরুগত প্রাণতার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত বিস্মিত হইয়াছি।

একদিন আমার করণীয় দিনচর্য্যা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"কাকচেষ্টা, বকধ্যান, শুনিদ্রা এবং অল্পাহার সাধকদের অবশ্য করণীয় কর্ম্ম ও সাধনা। সাধনজীবনে উন্নতির জন্য কাকের মত অনুক্ষণ চেষ্টা করিতে হইবে, বকের মত ধ্যাননিষ্ঠ হইতে হইবে, কুকুরের মত সদাজাগ্রত নিদ্রা অভ্যাস করিতে হইবে এবং মিতাহারী

হইতে হইবে। শ্রীগুরুর দুয়ারে নানারূপ নির্য্যাতন সহ্য করিয়া ও নিরভিমানচিত্তে অবস্থান করিতে হইবে, তবেই তাঁর কৃপা, করুণা, শুভাশীর্বাদ লাভ হইবে।"

আনুমানিক ১৯৬১ কিংবা ৬২ সনে মাঘী পূর্ণিমার পর বড় স্বামীজী মহারাজ গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়েন। তখন পূজনীয় স্বামী বেদানন্দজী মহারাজ ও অন্যান্য প্রবীণ সন্ন্যাসীদের ব্যবস্থাপনায় আশ্রমের নিকটবর্ত্তী একটি গুপ্ত বাড়ীতে বড় স্বামীজী মহারাজকে বিশ্রামের জন্য রাখা হয় এবং সকলের দর্শন প্রণাম নিষিদ্ধ করা হয়। তদনুসারে আমরা তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে কখনই যাই নাই। একদিন পূজনীয় আত্মানন্দজী মহারাজ পূজনীয় বড় স্বামীজী মহারাজের শারীরিক অবস্থা জানিতে সেই গুপ্ত বাড়ীতে গিয়াছেন এবং বিছানাটা নরম কিনা দেখিতেছেন। তখন বড় স্বামীজী মহারাজ আপন মনে বলিতেছেন—"এত বড় অসুখ। ক্ষণেকের তরেও চিন্তা হয় নাই কেন বড় ডাক্তার দেখান হয় নাই। যাঁর সেবার জন্য এই দেহ তাঁর যদি এই দেহের প্রয়োজন না থাকে তবে দেহ চলিয়া যাইবে।" কথাগুলি শুনিয়া ভাবিলাম, বড় স্বামীজী মহারাজ দেহ-মন-প্রাণ সবই শ্রীগুরুচরণে নিঃশেষে মিলাইয়া দিয়াছেন।

১৯৪১ সনে সঙ্ঘে যোগদানের পর আমি প্রায় ৭ বৎসর কলিকাতা আশ্রমে ছিলাম। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের ভোগের পর দোতলা হল ঘরে সকল সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সেবকবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করিত। ২ ঘণ্টা ২॥ ঘণ্টা ধরিয়া আমাকে এক হাতে বড় স্বামীজী মহারাজের নির্দ্দেশে পরিবেশন করিতে হইত। পান্তা ভাত প্রায় দিনই থাকিত। প্রথমে বড় স্বামীজী মহারাজ ৩ মুষ্টি পান্তা ভাত গ্রহণ করিতেন। সকলকে কিছু কিছু দেওয়ার নির্দ্দেশ। একদিন সকালে আমি কিছু খাই নাই। ২টা বাজিয়া গিয়াছে। ক্ষুধায় খুব কষ্ট পাইয়া মনে মনে ভাবিতেছি আমাকে কেন খাওয়ার নির্দ্দেশ দিতেছেন না। তখন বড় স্বামীজী মহারাজ আমাকে

লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—এক মায়ের যদি শত সন্তান থাকে, আর যদি শতজন খাইতে আসে, মা কি তাতে বিরক্ত হয়? এই বলিয়া আমাকে খাইতে বসার নির্দ্দেশ দিলেন। আমি ইহাতে লজ্জিত হইয়া খাইতে বসিলাম। সত্যই তিনি মনের অবস্থা বুঝিতে পারিতেন।

এত বড় আধ্যাত্মিক তপঃশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের স্থূলদেহের অবসানে সঙ্ঘের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। আমাদের যে কি অন্তর্বেদনা তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাই তাঁর স্মৃতিতর্পণের মাধ্যমে তাঁর স্নেহসুশীতল শ্রীচরণে অনুক্ষণ প্রার্থনা করি—হে গুরো! আমরা অবোধ অকৃতি সন্তান তোমার। তোমার অধ্যাত্ম অপার অপরিমেয় শক্তির ধারণা আমাদের সাধ্যাতীত। তুমি আমাদের অজ্ঞানতা তমসাচ্ছন্নতা দূর করিয়া তোমার প্রজ্ঞার আলোকে আমাদের উদ্ভাসিত কর। আমাদের কল্যাণ কর। আমাদের আশীর্বাদ দান কর। তোমার রাতুল চরণে আকুতি প্রার্থনা!

—**স্বামী পরমাত্মানন্দ**

শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর স্মরণে

গুরু মহারাজের মহাপরিনির্ব্বাণের পর পূজ্য বড় স্বামীজীর কাছে খুব কেঁদে ছিলাম, তিনি অতি প্রসন্ন চিত্তে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বলেছিলেন, "আমি আছি তোমার ভয় নেই, সদাসর্ব্বদা গুরুমুখী হয়ে চলবে; শ্রীগুরু স্মরণ করবে।" এই মধুমাখা বাক্য শুনে, সেই ভরসা নিয়ে চলছিলাম।

স্মৃতিপটে আজ কত কথাই না ভেসে উঠছে! যখনই বড় স্বামীজীকে প্রণাম ক'রতে গেছি তিনি মাথায় হাত দিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে তার তপঃশক্তি সঞ্চার করেছেন। আমি বা অন্য সঙ্ঘ-

সন্তানের কথা নয়, সকল দর্শনার্থীদের এ ভাবে তিনি আশীর্বাদ ও উপদেশ দান করেছেন।

হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কৃতি-সম্মেলনে তাঁর প্রদত্ত বাণী সকলকে শোনানো হতো। সেই বাণী শ্রবণে জাতির যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে, জাতি যেন মোহঘুম ছেড়ে জেগে উঠছে।

কতকগুলি ঘটনা পর্য্যায়ক্রমে মনে ভেসে উঠছে। বেনারসে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা সেরে মেলট্রেনে গুরুজীর সঙ্গে হাওড়া যাচ্ছি। কিন্তু কিছু অর্থসংগ্রহের জন্য গুরুমহারাজ আমাকে হাজারীবাগ রোডে নামিয়ে দিলেন। বড় স্বামীজী ট্রেনের অন্য কামরায়। গুরুমহারাজের ডাক শুনে সম্মুখে এসে বড় স্বামীজী নতজানু হয়ে বসে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। বড় স্বামীজীর বিনম্র আচরণ ও ভঙ্গি দেখে অভিভূত হলাম। কী প্রগাঢ় শ্রদ্ধা শ্রীগুরুর প্রতি!

অন্য একটা ঘটনা। কলকাতা বালীগঞ্জ আশ্রমে গুরু মহারাজ তাঁর বিশ্রাম কক্ষে উপবিষ্ট। আমি প্রচারকার্য্যে বাইরে চলেছি। আমার সাথে বড় কয়েকটা পুঁটলী। একার পক্ষে মালগুলি সামলানো বেশ অসুবিধা। পরন্তু ট্রামে-বাসে ওঠা বেশ শক্ত ব্যাপার। অন্য লোক সেখানে নেই যে ফরমান করবো সাহায্য করতে। আমার অসুবিধা লক্ষ্য করে গুরুমহারাজ বড় স্বামীজীকে বল্লেন— "দেখছো না প্রেমানন্দ মুস্কিলে পড়েছে, তাকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে এসো।" তৎক্ষণাৎ বড় স্বামীজী আমার কাছে এসে বল্লেন— "চল লক্ষ্মীটি, আমি তোমায় গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে আসি।" এই কথা বলেই স্বামীজী সবচেয়ে বড় বোঝাটি নিজের মাথায় তুলে নিলেন এবং গাড়ীতে চাপিয়ে দিয়ে গেলেন। তখন তিনি সঙ্ঘের সহ-সভাপতি। কী নিরভিমান! গুরুর আদেশ পালনে কী অকপট নিষ্ঠা!

সেবারের কথা এখনও মনে আছে। 'কাণ্ডারী' নৌকাযোগে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ সমেত সঙ্ঘ-সন্ন্যাসীরা চলেছি জলপথে। অনেকখানি পথ অতিক্রম করায় সকলের প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালা।

এধারে গতদিনের তিন-চার ঝুড়ি ভাত নৌকায় তখনও মজুত। কিন্তু সে ভাত পর্য্যুষিত। মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ করছে। অনেকে ভাতের অবস্থা দেখে, খেতে অনিচ্ছুক। গুরুমহারাজ হুংকার দিয়ে জানিয়ে দিলেন সাধুদের বিবেক-বৈরাগ্য ও সাধনার কথা। বল্লেন—

"আমি হাতে করে বিষ দিলেও সে বিষ অমৃত হয়ে যাবে।" নদীর জলে ভাতগুলি পরিষ্কার করে ধুয়ে গুরুমহারাজের ভোগ দেওয়া হলো। তারপর আমরা তা অতি আদরের সঙ্গে অমৃতজ্ঞানে খেলাম। বড় স্বামীজীর উক্তি—"দাও দাও আমাকে আগে অমৃত দাও।" এই কথা উচ্চারণ করে তাঁর কী প্রসন্ন হাসি!

একবার বাজিতপুর আশ্রমে গুরু মহারাজ বলে গেলেন— "আমি বাইরে যাচ্ছি। তোমরা কুনিয়া ঘাটে ছাতা নিয়ে যাবে আমাকে আনতে।" বর্ষা নেমেছে। খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। সেজন্য আমরা যাচ্ছি যাবো এ-রকম গড়িমসি করে বসে আছি। এমন সময় হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো গুরুমহারাজ বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে আসছেন। এধারে আমাদের তো ভয় হয়ে গেছে। তিনি মৃদু তিরস্কারের সুরে বল্লেন—"তোদের আর কি বলবো! আজ থাকতো যদি সচ্চিদানন্দ তাকে কান ধরে উঠ্‌বোস করাতাম।" তাঁর উপর গুরু মহারাজের কী প্রগাঢ় আস্থা ও বিশ্বাস!

কোলকাতায় বড় গরম। পূজ্য বড় স্বামীজীর কাছে একটা ছাতা কেনার জন্য কয়েকটা টাকা চাইতে গেলাম। বড় স্বামীজী বসে আছেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম প্রণাম করে। বড় স্বামীজী আমার মনের ইচ্ছা টের পেয়েছেন আগেই। আমায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"কিরে, কি দরকার?" আমি হেসে হেসে জানালাম—"আপনি বলে থাকেন বড়দের কাছে মাঝে মাঝে আসতে হয় এবং উপদেশ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতে হয়, সেজন্য এসেছি।" উত্তরে বল্লেন—"আসল ব্যাপারটা কি খুলেই বল না বাবা।" আবার তিনি হেসে হেসে বললেন—

"মানুষকে তো তুমি কত উপদেশ দাও, আমি কি উপদেশ দেবো বাবা, বল তো দেখি আসল কথা!" তার উত্তরে জানালাম—"গরমকালে একটা ছাতার প্রয়োজন। মাত্র পনের-কুড়ি টাকা দিলেই হবে।" হেসে হেসে উত্তর দিচ্ছেন—"আমি কি একসঙ্গে জীবনে পনের কুড়ি টাকা দেখেছি? আচ্ছা, তোমার আবার ছাতার কি দরকার? দিব্যি তো গৌরাঙ্গের মত চুল বানিয়েছো। চুলই তো ছাতার কাজ করবে! বেশতো জল গড়িয়ে পড়বে, বেশ মানাবে। ছাতার দরকার কি?" অবশ্য ছাতা কেনার জন্য পরে দশ টাকা পাওয়া গেল। চমৎকার তাঁর ত্যাগ ও বৈরাগ্য শিক্ষাদানের কৌশল!

তাঁর ত্যাগ, সংযম ও সাধনা জাতির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর মনের গভীরতা সমুদ্রতুল্য! অনন্ত আকাশের ন্যায় তাঁর হৃদয়! তাঁর তুলনা তিনি স্বয়ং। হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় তাঁর উন্নত শির। শ্রীগুরুর কৃপায় শংকর, চৈতন্য ও বুদ্ধের মত তাঁর বিবেক, বৈরাগ্য ও প্রেম। তাঁকে যে একবার দেখেছে, তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, সকলে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। শুধু শিষ্যের কথা নয়, কত তৃষিত তাপিত মানুষ তাঁর কাছে সান্ত্বনা পাবার জন্য ব্যাকুল চিত্তে দৈনিক ভিড় জমাতো।

সন্ন্যাসী-সম্মেলনে গুরুজীর আসনের পাশে বসে সকলের মাথার মণি হয়ে থাকতেন। আজ সঙ্ঘ-শরীরে অন্যান্য নরনারীর হৃদয়-মন্দিরে তাঁর দিব্যমূর্ত্তি'র আসন প্রতিষ্ঠা হলো।

এই তো কয়েক দিন আগে আমার সঙ্গে জীবনের শেষ দেখা। জামসেদপুর ত্রিশূল উৎসবে যাচ্ছি। বালীগঞ্জ আশ্রমে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট আছেন বড় স্বামীজী। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ জানালেন এবং অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

গুরুজীর দেহত্যাগের পর পূজ্য বড় স্বামীজী আমাদের মা-বাবা, বন্ধু-সখা সব কিছু হয়ে ছিলেন। টাকা পয়সা চাইতে গেলে যাতে বেশী খরচ না করি সে বিষয় সব সময় সজাগ করে বলতেন,—"দ্যাখ্ প্রেমানন্দ! অত বড় হাত করিস নে।"

ভারী একটা মজার কথা।

পুরীধামের আশ্রমে পূজ্য বেদানন্দজী আমার জন্য পঁচিশ টাকার স্লিপ্ লিখে দিচ্ছেন মেদিনীপুরের গ্রামে প্রচারে যাওয়ার খরচের জন্য। সে সময় দোতলা ঘরের বারান্দায় আমাদের স্লিপ লওয়ার দৃশ্য বড় স্বামীজী দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছেন। টাকা তো দিবেন তিনি। স্লিপ্ নিয়ে যেই শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর চোখে চোখ পড়েছে, অমনি তিনি হেসে বল্লেন—"বাবা, ন-ন-ন নমস্কার!" যেমন তিনি গম্ভীর, তেমনি ছিলেন রসজ্ঞ!

গুরুমহারাজ যেরূপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা আরতির আসনে বসে সকলের পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করেছেন, অনুরূপ ভাবে বড় স্বামীজীও অসুস্থ শরীর নিয়ে হাজার হাজার নর-নারীকে অকুণ্ঠচিত্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দর্শন ও আশীর্ব্বাদ দিয়ে গেছেন জীবনের শেষ উপান্তেও।

—**স্বামী প্রেমানন্দ**

মহৎ-সংস্মরণ

আমরা স্মরণ করি তখনই যখন কিছু হারাই। যা আমাদের কাছ থেকে সরে যায়, চলে যায় কালপ্রবাহে, তা যেমন জানিয়ে দেয় জীবনে সব কিছুই অস্থির ক্ষণভঙ্গুর, চিরচঞ্চল, তেমনই স্মৃতি আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে কিছুই হারায় না, তা সঞ্চিত থেকেই যায় অক্ষয় সম্পদরূপে আমাদের মনের মণিকোঠায়। বিশেষ করে যাঁকে হারাই তিনি যদি কোনও মহৎ জন হ'ন, তা হলে তো কিছু হারানোর প্রশ্নই আসে না, কারণ তাঁদের প্রেরণা সকলের মনে চিরদিনই সমানভাবে কাজ করে যায়।

এ-সব কথাগুলি বিশেষভাবে মনে আসছে যাঁকে আমরা সম্প্রতি হারিয়েছি সেই পূজ্যপাদ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ, যাঁকে

সবাই বড় স্বামীজী বলেই জানতেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কর্ণধাররূপে, তাঁরই প্রসঙ্গে। পরিণত বয়সে জীবনের আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপন ক'রে দেহকে যেন তিনি পূর্ণাহুতি দিয়ে গেলেন। সে-ব্রত ছিল সেবা, ভারতের অগণিত জনগণের সেবা, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে দুঃস্থ, পীড়িত, আর্তের সেবা এবং সেই সেবাধর্মে তাঁকে দীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁর গুরু আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ।

স্বল্পপরিসর জীবনে গুরু তদীয় মহাসঙ্ঘের ভাবাদর্শ ও কর্ম্মধারাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করে যান। তাঁর প্রতিভাধর উত্তর সাধকেরা সেই সঙ্ঘের সেবাকর্ম্মের পরিধি বিশ্বে সম্প্রসারিত করেন, আর এই কার্য্যে নেতৃত্ব দিয়েছেন আচার্য্যের অভিন্নহৃদয় শিষ্য পূজ্য বড় স্বামীজী। গুরুশক্তিই তাঁর ভিতর দিয়ে কাজ করেছে। কী অবিচল নিষ্ঠায় ও পরম মমতায় তিনি তাঁর সদ্‌গুরুস্থাপিত এই সঙ্ঘটিকে লালিত, পালিত, পরিপুষ্ট করে গেলেন দীর্ঘ প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে, তা এক অতুলনীয় ইতিহাস। সকলকে একত্রিত করে বেঁধে রাখাই তো এক দুরূহ সমস্যা, তার উপর ত্যাগ, তপস্যা, পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখা তার চেয়েও আরও এক জটিল সমস্যা। কিন্তু এই সমস্ত সমস্যার সমাধান তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তাঁর অতুলনীয় গুরুনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যবোধ, সরলতা এবং একান্ত আন্তরিক মমতার সমাবেশে। আজ যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানরূপে ভারতের গৌরব বর্ধন করছে এর পিছনে এই বড় স্বামীজীর যে কত প্রাণপাত পরিশ্রম ও জীবন-উৎসর্গকারী অবদান, তা হয়তো অনেকেরই অগোচর থেকে গিয়েছে।

এই অগোচর থেকে যাওয়ার একটি প্রধান কারণ তিনি বড় স্বামীজী হয়েই কোন দিন নিজেকে বড় ক'রে সকলের সামনে তুলে ধরেন নি। এই আত্মপ্রচার বিমুখীনতাই তাঁকে আদর্শ সন্ন্যাসী করে তুলেছিল। সমস্ত কাজই নিঃশব্দে অন্তরালে থেকে ক'রে গিয়েছিলেন। সকলকে প্রেরণা জুগিয়েছেন। উদ্বুদ্ধ করেছেন,

সংগঠিত করে বিভিন্ন সেবাক্ষেত্রে পাঠিয়েছেন, নিখুঁতভাবে কর্ম সম্পাদন করতে শিখিয়েছেন, কিন্তু নিজেকে কখনও পাদপ্রদীপের সামনে আনেন নি। শুধু পরম মমতায় স্নেহে ঘিরে রেখেছেন প্রত্যেকটি কর্মী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ শিষ্য ও ভক্তবৃন্দকে।

তাঁর কাছে যখনই গিয়েছি, তখনই তাঁর পদপ্রান্তে বসে এই উপলব্ধি নিয়েই ফিরেছি ইনি আমার একান্ত আপনজন, আত্মীয়-স্বজনের চেয়েও নিকটতম। পরিচয়ও পেয়েছি তার বারংবার। স্বহস্তে তাঁর স্নেহাশীর্বাদ লিখে দিয়ে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন 'সঙ্ঘগীতা' আমাকে সৎকর্মে ও সদ্ধর্মে প্রেরণা জোগাবার জন্য, আবার যখন গুরুতর অসুস্থ হয়েছি তখন পরম মমতাময়ী জননীর মতো আমার দৈহিক দুর্বলতা দূর করার জন্য নিজের সেবককে দিয়ে নানা ফলমূল, পুষ্টিকর খাদ্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। শাস্ত্রপাঠে তাঁর একান্ত আগ্রহ ছিল এবং এই শাস্ত্র-প্রচারে যেন আমি সর্বদা ব্রতী থাকি সেজন্য সর্বদা উৎসাহ দিয়েছেন ও অমোঘ আশীর্বাদে ধন্য করেছেন। দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরে শ্রীনাথ হলে মধুসূদন সরস্বতীর টীকা সমেত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোচনা তাঁরই প্রেরণায় সম্ভব হয়েছিল এবং এমনই আশ্চর্যের ব্যাপার যে যেদিন সন্ধ্যায় এই গীতাপাঠ সম্পূর্ণ হলো, সেই দিনই তার একঘণ্টা পরেই তিনি তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করে চলে গেলেন। যেন এরই প্রতীক্ষায় তিনি ছিলেন, পূর্ণাঙ্গ গীতা-আলোচনার শেষেই তিনি বিদায় নেবেন বলে স্থির ক'রে রেখেছিলেন।

তাঁর পুণ্য জীবনের নানা সংস্মরণে তাই হৃদয় পবিত্র হয়। এঁদের মতো মহতের জন্মেই ভারতবর্ষ আজও পুণ্যভূমি হয়ে আছে, কারণ এঁরাই 'তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি', সমস্ত তীর্থকে তীর্থ করেন, পবিত্র করেন আপন জীবন ও আচরণের দ্বারা। তাই তাঁর সংস্মরণে আমরা যেন তীর্থ দর্শন বা তীর্থস্নানের ফল লাভ করি। সেই অমর আত্মার কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি অলক্ষ্যে

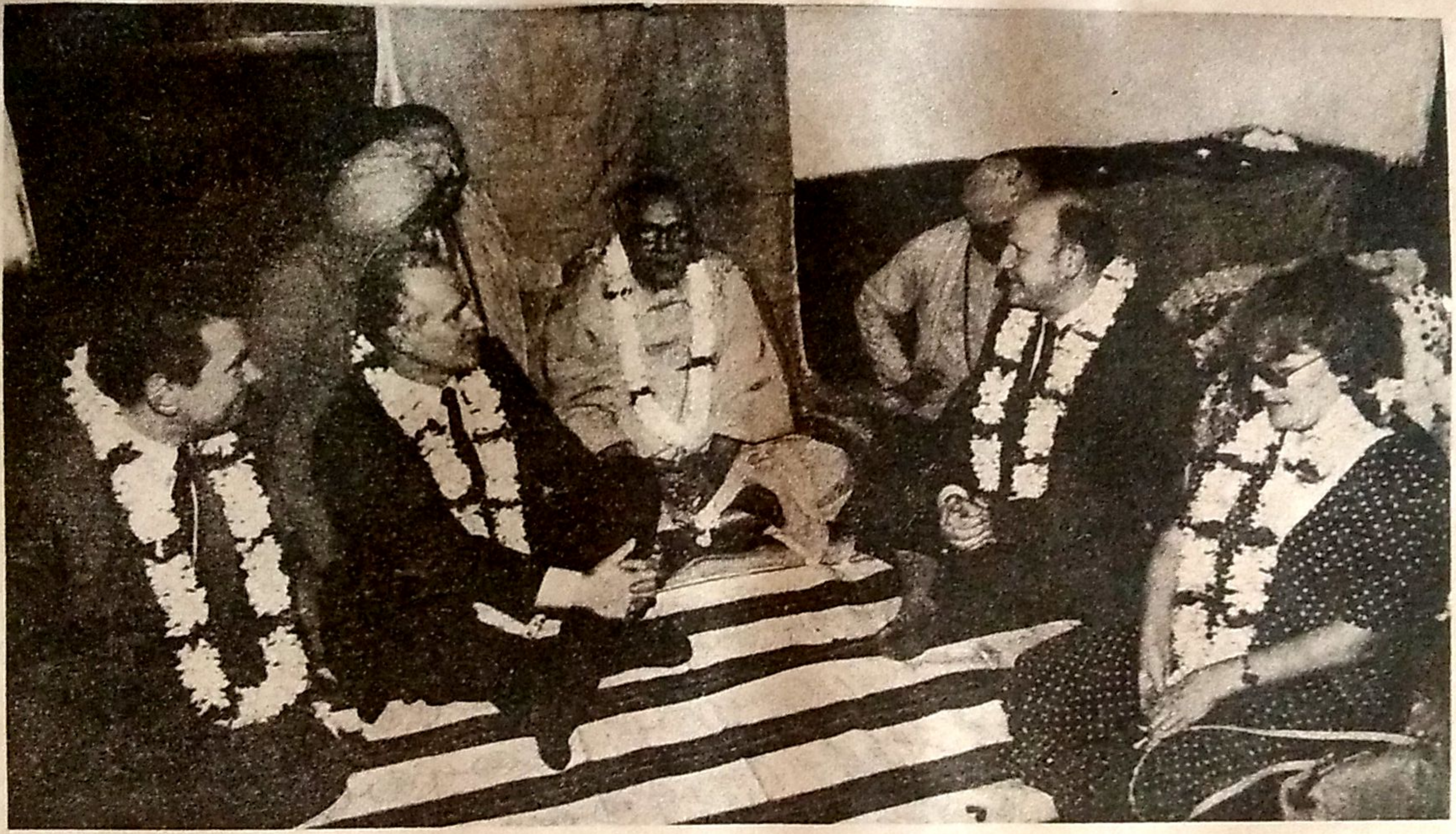
থেকেও এই সঙ্ঘটিকে সঞ্জীবিত রাখেন এবং তাঁরই আদর্শ অনুসরণে আমাদের সকলকে শক্তি দান করেন।

—ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

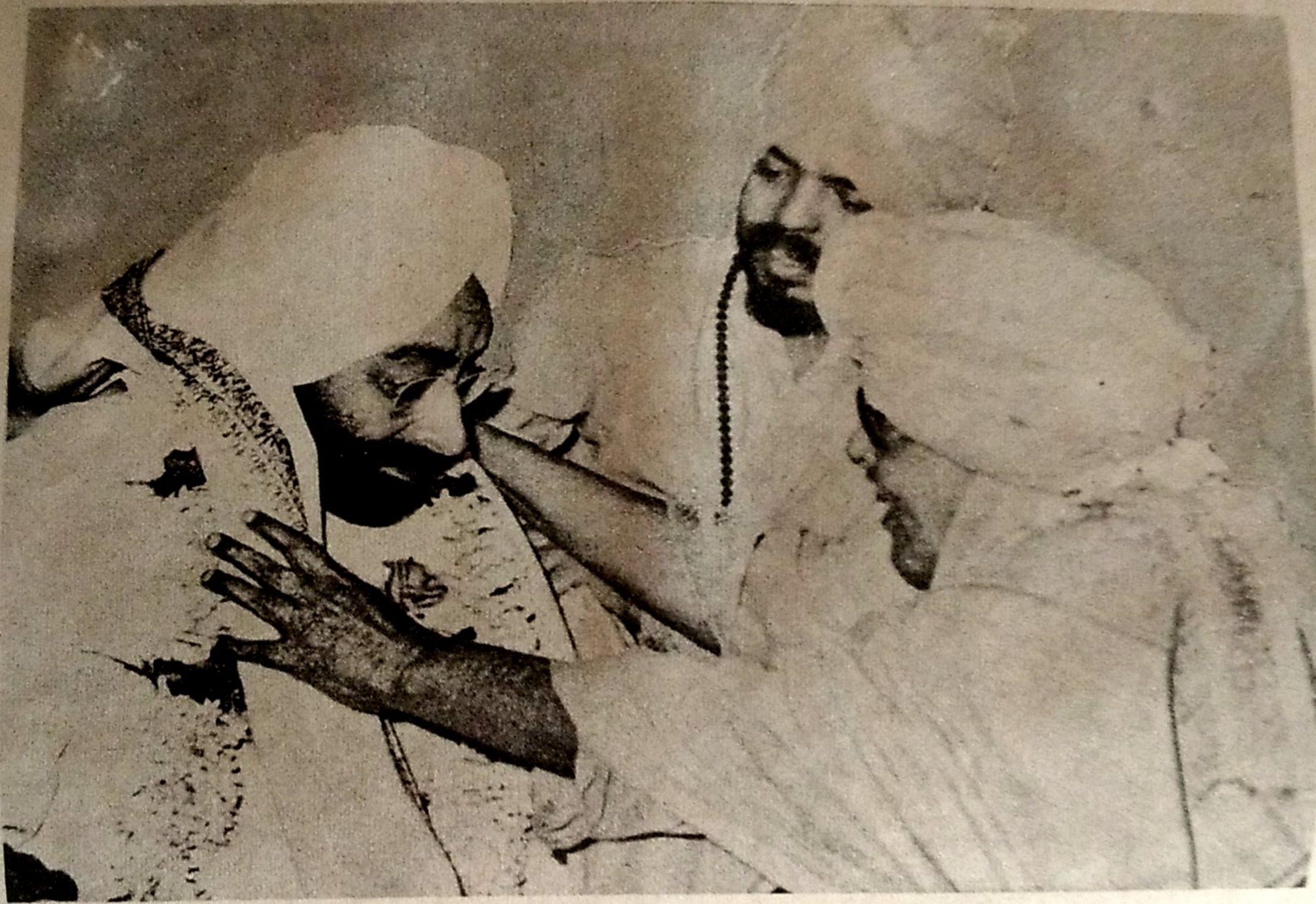
শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজের ব্যাবহারিক জীবন

১৯৪৫ সাল থেকে শেষ পর্যন্ত সর্ব সময়ের জন্য প্রধান কার্যালয়ে থেকে পূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজীকে অতি নিকট থেকে দেখার ও পবিত্র সাহচর্য লাভের অপূর্ব সুযোগ পেয়ে তাঁর ব্যাবহারিক জীবনে যা দেখেছি, সে সম্পর্কে কিছু নিবেদন করবো।

তখন ব্রহ্মচর্য সংস্কার প্রাপ্ত হওয়ার পর সঙ্ঘ-সন্তানদের প্রধান কার্যালয়ে ২।১ বছরের জন্য শ্রীগুরুমন্দিরের মার্জনা, পূজা-আরতির জোগাড়, ভোগপাক, ভোগ নিবেদন, পরিবেশন, বৃদ্ধ, প্রবীণ, অক্ষম ও অসুস্থ সন্ন্যাসীদের সেবা পরিচর্যার কাজে নিয়োজিত রাখা হ'ত। সে সময় দেখেছি পূজনীয় শ্রীমৎ বড় স্বামীজী সর্ব্বাগ্রে রাত ৩ টায় শ্রীগুরু মন্দিরে এসে করতাল বাজিয়ে 'দিনমপি রজনী সায়ংপ্রাতঃ' বা মোহমুদ্গরের বৈরাগ্যমূলক ও গুরুশরণাগতি মূলক গানগুলি আবেগের সঙ্গে একা একা গেয়ে যাচ্ছেন। মঙ্গল আরতির পর শ্রীগুরুবিশ্রাম মন্দিরে গিয়ে স্বীয় আসনে উপবেশন করে সকল সঙ্ঘ-সন্তানকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করছেন। ত্রিসন্ধ্যা আরাত্রিকের পর তিনি তা করতেন, এবং নিত্য প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা আরাত্রিকে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতেন। প্রাতে, দ্বিপ্রহরে ও সায়ংকালে আরতির পর ভোগ নিবেদন করা হ'ত। পূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজী তালপাতার পাখাখানা নিয়ে শ্রীগুরু আসনে মনপ্রাণ ঢেলে ব্যজন করতেন। প্রাতঃকালীন আরতির পর ভোগ দেওয়া হ'ত দই, চিড়া, মুড়ি, মিষ্টি ইত্যাদি। বাজার থেকে মুড়ি চিড়ার ঠোঙাগুলি এক রকম সরু পাটের সুতলি



সোভিয়েট উচ্চশিক্ষার উপমন্ত্রী Mr. N.S. Egorov এর নেতৃত্বে চার সদস্যযুক্ত এক প্রতিনিধিদলকে কলিকাতা আশ্রমে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ (ইং ১৯/১২/৮৭)



ভারতের রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং-কে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন
শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ (ইং ৮/২/৮৬)

দিয়ে জড়ানো থাকত। ভোগ নিবেদনের শেষে ঐ পরিত্যক্ত সুতলিগুলি নিজে হাতে সংগ্রহ করে তাল পাকিয়ে রাখতেন, টাকা গুণে বাণ্ডিল করার সময় ঐ সুতলিগুলি ব্যবহার করা হ'ত। এভাবে কিছু পয়সার সাশ্রয় হ'ত। বলতেন, "কোন জিনিস ফেলা যায় না। যাকে রাখো সেই রাখে।"

দ্বিপ্রহরে ভোগ দেওয়ার পর কয়েকটি বড় বড় বাটিতে ভোগের অন্ন-ব্যঞ্জনাদি একটি র‍্যাকে তুলে রাখতে বলতেন; কি জিনিস কতখানি রাখতে হবে তাও বলে দিতেন। যে সমস্ত সঙ্ঘসন্তান দৈনন্দিন চাঁদা আদায়ের পর একটু দেরীতে ফিরত বা বহিরাগত সন্ন্যাসী বা কর্ম্মী অসময়ে এসে পড়তো ঐ সব তুলে-রাখা ভোগের প্রসাদ দেওয়া হ'ত তাদের।

প্রতিদিনের ভোগের বাজার ও সর্বসাধারণের পাকের জন্য বাজার করার সময় তিনি নিজ হাতে জিনিসের তালিকা তৈরী করে হিসাব মত টাকা পয়সা দিতেন। বাজার থেকে ফিরে এলে হিসাব বুঝে নিতেন। চার পয়সা উদ্বৃত্ত হলেও তা ফেরৎ নিয়ে বলতেন—প্রতিদিন চার আনা বাঁচলে মাসে সাড়ে সাত টাকা, বছরে ১০০ টাকা সাশ্রয় হয়। এভাবে একশত ভাই চেষ্টা করলে বছরে হাজার টাকা সাশ্রয়। তা দিয়ে অনেক কাজ হয়। ভোগের জন্য যদি কোন ভক্ত কাঁচা তরকারী আনত, তবে বাজার করার সময় সেগুলির খোঁজ নিতেন এবং সেই হিসাবে বাজারের টাকা দিতেন। ফলমূলাদি কোনও ভোজ্য দ্রব্য এলে শ্রীগুরুর ভোগ না দিয়ে গ্রহণ করতেন না! কোন্ দিন কি রান্না হবে তার তালিকা করে হিসাব মত টাকা দিতেন।

সেবার ঝাড়গ্রামে আশ্রমের জমিতে প্রচুর মিষ্টি কুমড়ার চাষ হয়েছিল। এক একটির ওজন ১৫।২০ সের। ৫টি কুমড়া বস্তায় করে এনে পূজনীয় বড় স্বামীজীর বিশ্রামকক্ষে নিয়ে দেখালাম। মুখে সুন্দর হাসি ফুটিয়ে দত্ত মশায়ের তারিফ করে বললেন—"অবাক্ কাণ্ড! কাঁকর বালির শুকনা মরুভূমির মত মাটিতে এগুলি

ফলিয়েছে ?" হাত বুলিয়ে দেখে বললেন, "শ্রীগুরু বিশ্রাম-মন্দিরে নিয়ে রাখ। ঠাকুরের ভোগ হবে।"

১৯৫০।৫১ সালের কথা। পূজনীয় বড় স্বামীজীকে ডালহাউসী স্কোয়ারে একদিন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি অফিসে যেতে হয়েছিল। গরমের সময়! সম্ভবত মে মাস।

সেবককে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দুপুরে প্রচণ্ড রোদ। গেটের বাইরে এসে ট্যাক্সি আনার জন্য অনুমতি চাইলাম। বললেন, "এগিয়ে চল।" ট্রাম টারমিনাসে গিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠে শেষের আসনে বসলেন এবং কৃপা করে নিজের পাশে এই নগণ্য সেবককে বসালেন। আমি সঙ্ঘের পরম পূজ্য সভাপতির এরূপ কাজ দেখে অবাক্ হয়ে ভাবছি। ট্যাক্সিতে না গিয়ে কেন ট্রামে উঠলেন নানা ঝুঁকি নিয়ে। বললেন, "দুপুরের গাড়ীতে বেশী ভীড় হবে না। শোভাবাজার বাগবাজার থেকে, মির্জাপুর থেকে সে সময় হেঁটে এসে বালিগঞ্জে চাঁদা আদায় করেছেন স্বামীজীরা। ট্রাম ভাড়া সাশ্রয় হ'ত। সে দিনের কথা চিন্তা করলে আর ট্যাক্সিতে ৪।৫ টাকা খরচ করতে গায়ে লাগে।" সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠার শুরুতে ট্রেনে, ষ্টীমারে এবং কলকাতায় ট্রামে বাসে বক্স কলেকসনে টাকা সংগ্রহের কথা শুনিয়ে কি ভাবে তিলে তিলে সঙ্ঘকে গড়ে তুলেছিলেন তা বলতে লাগলেন।

বাজিতপুর থেকে একবার কলকাতায় আসার পর পয়সার অভাবে শিয়ালদা থেকে কি ভাবে হেঁটে হেঁটে বালিগঞ্জের আশ্রমে পৌঁছেছিলেন তাও বললেন। সেদিন শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ ৩।৪ জনকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে করে আশ্রমে এসেছিলেন। তাঁর হাতেও সেদিন টাকা ছিল না। কলকাতায় এসে স্বামী আত্মানন্দজীর থেকে টাকা নিয়ে ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। আর সঙ্ঘের সহ-সভাপতি বড় স্বামীজী গুরু মহারাজের নির্দেশে হেঁটে হেঁটে এসেছিলেন। বললেন, "তিনি যা করিয়েছেন, তাই করেছি। আজও তা করে যাচ্ছি।" মহাজীবনের এ শিক্ষা

বিরল। অকপটে সব কথাই বলে গেলেন নগণ্য সেবকের শিক্ষার জন্য।

প্রতি বছর বাজিতপুর সিদ্ধপীঠে আমরা সদলবলে মাঘী পূর্ণিমা উৎসব পালনের জন্য যেতাম। পূজ্য বড় স্বামীজী সকল সঙ্ঘ-সন্তানকে নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর ট্রেনে একত্রে গেছেন। প্রবীণ সঙ্ঘ-সন্ন্যাসীদের জন্য ২।৩ খানা ইণ্টার ক্লাস টিকেট কেনা হ'ত। কিন্তু বড় স্বামীজী আমাদের সকলের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীতেই গেছেন। গাড়ীর মধ্যে পূজা-প্রার্থনা হয়েছে। নিজ হাতে প্রসাদ দিয়েছেন। আনন্দের হাট বসিয়ে মহাতীর্থে যাত্রা হ'ত। ষ্টীমারের কেবিন রিজার্ভ থাকলেও তিনি আমাদের সঙ্গেই যেতেন একত্র হয়ে। খুলনায় ট্রেন থেকে মালপত্র নামানো হ'ত। ষ্টীমারে মাল তোলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সর্বক্ষণের সাথী দণ্ডটি ধারণ করে এক নাগাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন মালগুলি আগলিয়ে। আবার কলকাতায় ফিরেও দেখেছি শেষ মালটি না উঠা পর্যন্ত একই ভাবে দণ্ডের উপর ভর দিয়ে মাল আগলিয়ে আছেন।

কাশীতে দুর্গোৎসবে বা গয়ায় পিতৃপক্ষ মেলায় অথবা পুরীতে রথযাত্রা মেলায় যাওয়ার সময় এবং ফেরার সময় ঐ একই ভাবে শ্রীমৎ বড় স্বামীজীকে দেখেছি একই সাথে তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করতে। ঐ একই ভাবে এক শত শোয়া শত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী কর্মীর মালপত্র আগলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। শেষ পর্যায়ে ৩।৪টি ভারী মাল নেবার জন্য কুলি নেওয়া হ'ত। কুলির সঙ্গে দরদামও নিজেই ঠিক করতেন।

তখন শ্রীগুরুমন্দিরে ভোগের পর দোতলার হলে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, কর্মিগণ দ্বিপ্রহর ও রাত্রের খাওয়ার খেতেন। পূজ্য বড় স্বামীজী, শ্রীমৎ বেদানন্দ স্বামীজী ও অন্যান্য প্রবীণ সন্ন্যাসিগণ প্রথম ব্যাচে একত্র বসে খেতেন। খাওয়ার পর শ্রীমৎ বড় স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের আসনের পাশে দাঁড়িয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কার ভাত লাগবে, কার ডাল লাগবে, কার তরকারী লাগবে, কাকে জল

দিতে হবে, কাকে নুন দিতে হবে এবং কে কখন খেতে বসবে, কে কে কখন পরিবেশন করবে সব নির্দেশ দিতেন। খাওয়ার সময় নিঃশব্দ শান্ত পরিবেশন গড়ে উঠত।

বলতেন "লক্ষ্মীটি! পরিমাণ মত দাও! জলের ঘটিটা এগিয়ে দাও।" ডেলা পাকানো ভাত গুলো ভেঙ্গে দিতে বলতেন। ডেলা সমেত দিলে অতিরিক্ত ভাত পড়ে পাছে নষ্ট হয়, সে কথাও বলতেন। সে সময়ে ব্যক্তিগত থালা ঘটি বাটি ছিল না। ১৫।২০ খানা কলাই করা থালা, একটি এলুমিনিয়মের ঘটি। ঐ বাসনে বড় বড় স্বামীজীদের থেকে আরম্ভ করে সামান্য সেবক কর্মীটি পর্যন্ত পানাহার করত। তখন উৎসব ছাড়া বাজার থেকে কলাপাতা বা শালপাতা এনে খাওয়ানো হ'ত না। রাত্রের ভাত ডাল যা বাঁচত সকালে সন্ন্যাসীরা তাতেই প্রাতঃকালীন জলযোগ করে কাজে বেরিয়ে পড়ত। পৃথক্ ভাবে জলখাবারের ব্যবস্থা ছিল না। ২।৪ জন বয়স্ক সন্ন্যাসী বা যাঁরা অসুস্থ তাঁদের জন্য প্রয়োজন হোলে চিড়ে বা মুড়ির ব্যবস্থা করা হ'ত। সবই পূজ্য বড় স্বামীজী নিজে তদারকি করতেন। কে কে খেতে বাকী থাকল, তার কথা চিন্তা করতেন।

একবার মন্দিরের পূজা আরতির পাদুকা মোছার তোয়ালেটির মলিন অবস্থা দেখে সেটিকে পাঁচিলের বাইরে ফেলে দিই। একটি নতুন তোয়ালে কেনার আবেদন নিয়ে শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর নিকট আট আনা পয়সা চেয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন, "গুরু মহারাজের নিত্যপূজা আরতির ঐ তোয়ালে ফেলে দিতে নাই। সোডা দিয়ে একটু কেচে নিলে আরও কিছুদিন চলবে।" আমি তৎক্ষণাৎ কালবিলম্ব না করে ঐ ফেলে-দেওয়া তোয়ালের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

একদিন গরমের সময় দুপুরের পর শ্রীগুরুমন্দিরে ফল, মিষ্টি ও বেলপানা ভোগ দেওয়ার সময় বিশ্রাম মন্দিরে গিয়েছি। মেজের উপর পাতা পাটিতে বালিশ তোয়ালে, ঢাকা-দেওয়া গ্লাসে জল।

পাটির উপর শ্রীগুরুমূর্ত্তি স্থাপিত। পূজনীয় বড় স্বামীজী পাখা দিয়ে বাতাস দিচ্ছেন তন্ময় হয়ে। আমাকে দেখে চার আনা পয়সা দিয়ে বরফ আনতে বললেন।

বেলপানার সঙ্গে বরফ দিয়ে ভোগ দেওয়া হ'ল। বিশ্রাম মন্দিরে বসে সকলকে নিজ হাতে প্রসাদ তুলে দিয়েছেন সন্তান-বাৎসল্যে।

মাঘী পূর্ণিমার সময় বাজিতপুর উৎসবে অংশ গ্রহণের জন্য কাশী থেকে শ্রীমৎ মুক্তানন্দজী, গয়া থেকে শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দজী, গুজরাট থেকে শ্রীমৎ অদ্বৈতানন্দজী ও অন্যান্য প্রবীণ সন্ন্যাসীরা কলকাতায় আসতেন। সে সময় বড় বড় স্বামীজীদের পৃথক্ বিশ্রামকক্ষ ছিল না। পূজনীয় শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর বিশ্রামকক্ষে মেজের উপর বিছানা পেতে ৩।৪ জন এক সঙ্গে থাকতেন। খাট বা তক্তাপোষ ছিল না। মাদুর সতরঞ্চি কম্বল পেতে বিছানা। পূজনীয় বড় স্বামীজী সঙ্ঘ-সভাপতি—তিনি সঙ্ঘ-ভ্রাতাদের স্থান দিয়েছেন নিজকক্ষে। আহার করেছেন শ্রীগুরু-পাদমূলে বসে একসঙ্গে। সঙ্ঘের সাধারণ সমিতির সভার দিন গৃহী সদস্যদের বসিয়ে শ্রীগুরুপ্রসাদ দিয়ে আপ্যায়িত করা হ'ত বিছানাগুলি গুটিয়ে পূজ্য বড় স্বামীজীর বিশ্রামকক্ষে।

পূজনীয় বড় স্বামীজী ফাউণ্টেন পেন ব্যবহার করতেন না, দোয়াত কলমে লিখতেন। প্রত্যেকটি চিঠির জবাব নিজ হাতে দিতেন। দুপুরের পর ডায়েরী লিখতেন। সঙ্ঘবাণী, সঙ্ঘগীতা ও শ্রীমদ্‌ভগবত গীতা ছিল নিত্য পাঠ্য। শঙ্করাচার্য গ্রন্থাবলী, বিবেকচূড়ামণি, অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ পাঠ তাঁর স্বাধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাত্রে আহারাদির পর মহাভারত ও রামায়ণ থেকে সুর করে পাঠ করে শোনাতেন স্বামী নিখিলানন্দজী। স্বামীজীর অনুপস্থিতিতে স্বামী সম্বিদানন্দজী, স্বামী দিব্যা-নন্দজী, স্বামী পরমাত্মানন্দজীকে মাঝে রামায়ণ পাঠ করে শোনাবার আদেশ করেছেন। এই নগণ্য সেবকের উপরও কৃপা করে মাঝে মাঝে পাঠের আদেশ করেছেন। রামায়ণ বা মহাভারত পাঠের পর

সঙ্ঘগীতার কয়েকটি পত্র পঠিত হ'ত। স্বামী ভূমানন্দজী বা স্বামী সচ্চিদানন্দজী গুরুশরণাগতি ও বৈরাগ্যমূলক গান—যেমন 'যে পথে মুক্তি মিলে ডাকিলে কাঁদিলে গুরু দেন বলে,' বা 'এ মায়া প্রপঞ্চময়'—অথবা 'চরম শয্যায় কাপড়খানি শিরে পায়'—ইত্যাদি গান করে শ্রীমৎ বড় স্বামীজীকে শুনাতেন। ৮।১০ জন অন্তরঙ্গ শ্রোতা থাকতেন। পাঠ ও গানের পর বলতেন "যাও, সকলে বিশ্রাম কর।" তৎপূর্বে ঠাকুরের শয়ন দেওয়া হ'ত। নিজে গিয়ে শ্রীগুরু বিশ্রামমন্দিরে ও নিত্য পূজামন্দিরে এসে প্রণাম করে শয্যাগ্রহণ করতেন। ইলেকট্রিক পাখা ব্যবহার করতেন না। তাঁর ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বালানো হ'ত না। লণ্ঠন প্রস্তুত থাকত। সরষের তেলের সলতে দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হ'ত রাত্রে পাঠের সময়। বলতেন "ইলেকট্রিক পাখার হাওয়া ও বিদ্যুতের আলো স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। পাখা আলো নিয়ন্ত্রিত হলে খরচও কম হয়।"

রাত্রে পাঠের সময় অনেক সময় শিশুর মত সরলতা নিয়ে শ্রীমৎ বেদানন্দ স্বামীজী পূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজীকে পাখার হাওয়া করতেন। যে কোন কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য শ্রীমৎ যোগানন্দজী, শ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দজী ও অন্যান্য প্রবীণ সন্ন্যাসীরা হেড্ অফিসে উপস্থিত থাকলে একত্র বসে কর্ত্তব্য স্থির করতেন পূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর বিশ্রামকক্ষে।

তখন সংবাদপত্রে সঙ্ঘের খবর বের হলে পূজ্য বড় স্বামীজী ৫০।৬০ খানা আনিয়ে প্রচারক দলে ও আশ্রমে পাঠাবার ব্যবস্থা করতেন। একদিন গরমের সময় দেখা গেল শ্রীমৎ বড় স্বামীজী খবরের কাগজ থেকে সঙ্ঘের সংবাদগুলি কেটে কেটে খাতায় আঠা দিয়ে লাগাচ্ছেন। গরমে গলদ্ঘর্ম। বাম হাতে দু'একবার পাখার বাতাস নিচ্ছেন। আমি ঘরে গিয়ে পাখা খানা হাতে নিয়েছি। বললেন—"বিশ্রাম-মন্দিরে কেউ নেই, বড় গরম। সেখানে গিয়ে একটু হাওয়া দাও।" শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের কথা উল্লেখ করে

আরও বললেন "কাগজে সংবাদ দেওয়া, সংবাদ সংগ্রহ করে কাটিং রাখার বিষয়ে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। রাসবিহারী বাবুকে দিয়ে এ সব নিজে করাতেন। বিশাল গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সত্যেন মজুমদার, মতিলাল ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি বাঘা বাঘা সাংবাদিক ও এডিটরদের সঙ্ঘের কর্ম-পরিকল্পনা বিষয়ে অকাট্য যুক্তি দিয়ে তাঁদের কনভিন্স্ করেছেন। পিছনে একদিকে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখতাম শুনতাম।"

পূজ্য বড় স্বামীজীর আদেশে রিপোর্ট লিখে খবরের কাগজের অফিসে বহু বছর যাতায়াত করেছি। রিপোর্ট তৈরী করে তাঁকে দেখালে উপযুক্ত কোন্ শব্দটি কোথায় বসালে ভাল হয়, তারও নির্দেশ দিতেন। কাশীতে দুর্গোৎসবের সময় স্থানীয় সংবাদপত্রে উৎসবের রিপোর্ট প্রকাশ করার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতেন। বিভিন্ন স্থানে সাময়িক সেবাকেন্দ্রে চিঠি লিখে স্থানীয় সাংবাদিকদের মারফৎ কলকাতার কাগজগুলিতে সংবাদ পাঠানোর নির্দেশ দিতেন। সংবাদ বের হলে তা দেখে তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করতেন এবং শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের সংবাদপত্রে প্রচারের আগ্রহ বিষয়ের উল্লেখ করে অনুপ্রেরণা জোগাতেন।

সুদীর্ঘকালের কত কথাই না মনে পড়ে। স্বাস্থ্যের জন্য ডাঃ নরেশ ভট্টাচার্যের পরামর্শে তিনি প্রায়ই ঝাড়গ্রামে গিয়ে ২।৩ সপ্তাহ থেকে আসতেন। যখন নিজস্ব আশ্রম হয়নি, তখন পুকুরিয়ার সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে শাল, মহুয়া, কাজুবাদাম জঙ্গলের মধ্যে ডাক্তার বাবুর খালি বাংলো বাড়ীতে গিয়ে উঠতেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর শুভ প্রচেষ্টায় পুকুরিয়ায় আদিবাসী কল্যাণ-কেন্দ্র গড়ে উঠল। সেখানে দোলে উৎসব প্রবর্তন করলেন। নৈশ বিদ্যালয় গড়ে তুললেন, পরে পরে ওদিকে কার্যের বিরাট প্রসার লাভ করল।

ঝাড়গ্রামের মহারাজা ১৮ বিঘা জমির উপর পিয়ারা বাগান সহ তাঁদের কাছারী বাড়ী মাটি-খড়ের ঘর সঙ্ঘের কর্মবিস্তারের জন্য

দান করলেন। সেই খড়ের ঘরটিতে গিয়ে তিনি থাকতেন। মহুয়া তেলের প্রদীপ জ্বলত শ্রীগুরুমন্দিরে। সেই অন্ধকার ঘরে একদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের আসন করে ত্রিসন্ধ্যা পূজা-প্রার্থনা, ভোগ-নিবেদন হ'ত। আমরা সবাই বারান্দায় থাকতাম। আমাদের পাঠাতেন সাঁওতাল পল্লীতে ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে গ্রামে প্রচার, যজ্ঞ, মিটিং করার জন্য। দুবরাজপুর সাঁওতাল পল্লীতে গরুর গাড়ীতে করে নিজে প্রতিবারই গেছেন। তাদের আশীর্বাদ করেছেন, অভাব অভিযোগে কাপড় কম্বল দান করেছেন। ভালবেসে আশ্রমে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মাতৃস্নেহে পেট ভরে খাইয়েছেন ঐ সব দুঃস্থ, অনুন্নত, অজ্ঞ মানুষ-জনদের।

সে-বার তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তা দেখা গেল। পুকুরিয়া আশ্রম থেকে কলকাতা রওনা হওয়ার ২।৩ মিনিট পরে মুষলধারে বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি আরম্ভ হল। মেটে রাস্তা উঁচু নীচুর জন্য রিক্সাগুলিকে আমরা ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি। মহাদুর্যোগে আশ্রমে ফিরে যাওয়ার জন্য স্বামী নিখিলানন্দজী প্রস্তাব করলেন। শ্রীমৎ স্বামীজী বললেন, "না—যখন সংকল্প নিয়ে বেরিয়েছি, ফিরব না।" কিছু দূরে নরেন্দ্র রায়ের বাড়ীতে পোষ্ট অফিসের সংকীর্ণ বারান্দায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়া হল। ১ ঘণ্টা পর বৃষ্টি বন্ধ হলে ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করলেন। বললেন, "গুরুমহারাজ সংকল্প রক্ষার উপর খুব জোর দিতেন। সংকল্প থেকে কোনও ভাবে বিচ্যুত হতে নাই।"

১৯৫২ সালে ভারতীয় সংস্কৃতি মন্দিরে ধর্মশাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ হয়। প্রতি শনিবার ও রবিবার সপ্তাহে দু'দিন করে সভা বসত। বিরাট হলটি পরিষ্কার করার আলাদা লোক থাকতো না। একদিন ঝাড়ু নিয়ে হলঘরটি পরিষ্কার করছিলাম। সকালের দিকে শ্রীমৎ বড় স্বামীজী প্রাতঃভ্রমণে বের হয়ে ঐ বাড়ীতে গেছেন, সব ঘুরে ঘুরে দেখছেন। পেছন ফিরে তাঁর সামনে পড়ে গেলাম। প্রণাম করতেই বললেন, "পুরীতে গুণ্ডিচা বাড়ীতে কবুতরের মলে

স্তূপীকৃত আবর্জনা জমে থাকতে দেখে মহাপ্রভু সম্মার্জনী হস্তে ঐ ময়লা অপসারণ করেছিলেন। এতে মান অভিমান নষ্ট হয়। হৃদয়ের মালিন্য কেটে যায়। প্রয়োজনে যেমন অফিসের কাজ করতে হয়, শ্রীগুরুমন্দির মার্জনার ভিতরও অশেষ কল্যাণ।" একদিন অবাক্ হয়ে দেখলাম শ্রীগুরুমন্দিরের সামনের বারান্দায় শ্রীমৎ বড় স্বামীজী নিজে ঝাড়ু নিয়ে পরিষ্কার করছেন।

বছর তিনেক আগে এক রাতের ঝড়ে কলকাতা আশ্রমের আমগাছটি রাস্তার উপর পড়ে। বাইরে যাওয়ার জন্য মাথা নীচু করে গাছের তলা দিয়ে যেতে হ'ত। শ্রীমৎ বড় স্বামীজী প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। ভ্রমণসঙ্গী কানহাইয়া লাল (স্বামী হংসেশ্বরানন্দ) পূজনীয় বড় স্বামীজীকে মাথা নীচু করে গাছের তলা দিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করেছে। ৫।৭ সেকেণ্ড স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে গাছটির যেখানে মূল উপড়ে গেছে, সে দিক দিয়ে মাথা উঁচু করে পেরিয়ে গেলেন এবং বললেন, "জীবনে এক জনের কাছে মাথা নীচু করেছি। অন্য কারু কাছে মাথা নীচু করব না".—বলেই মধুর হাসি। সেই সরলতা মাখা মিষ্টি হাসির রেশ আজও চোখের সামনে ভাসছে।

স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ

<u>চিকিৎসকের ডায়েরী থেকে</u>

মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণ

শনিবার, ৭ই জানুয়ারী, ১৯৮৯

যথারীতি চেম্বারে কাজ সেরে গাড়ীতে বোসলাম। ড্রাইভারকে বললাম বালীগঞ্জ স্টেশানের কাছে চল। ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল 'আশ্রমে'? আমি বললাম 'হ্যাঁ'? কারণ গত বেশ কয়েক দিন নিয়মিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ মহারাজজীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা আমার নিত্যনৈমিত্তিক

কাজের মধ্যে পরিণত হয়েছে; মহারাজজী গুরুতর অসুস্থ। কিছু দিন আগে সুন্দরবন চব্বিশ পরগণার উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে যায় তাতে ঠাণ্ডা লেগে তিনি ব্রঙ্কাইটিস্ ও নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হ'ন, তারই চিকিৎসার জন্য আমার রোজ আশ্রমে যাওয়া, মহারাজজী বরাবরই হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার ভক্ত, আমি প্রথম তাঁর উপর এলোপ্যাথিক ওষুধ প্রয়োগ করি, অবশ্য এতে তাঁর সম্মতি ছিল। বিগত কয়েক বছর ধরে এই চিকিৎসাই চলে আসছে, তাতে তিনি ভালোই আছেন। মাঝে মাঝে দু'-একবার খুব বাড়াবাড়ির সময়ও এই চিকিৎসায় তাঁকে ভালো ক'রে তুলেছে, তবে এবারকার অবস্থা অনেক বেশি খারাপের দিকে। এলোমেলো চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত। হঠাৎ দেখি কখন গাড়ী আশ্রমের দোরগোড়ায় হাজির। তিন চারজন আশ্রমের সাধু আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে মহারাজজীকে পরীক্ষা করার জন্য দোতলায় তাঁর নিজ ঘরে গেলাম। রাত প্রায় এগারটা। এ সময় কোলকাতায় রাত্রির ঘোর আরম্ভ হয়, রাস্তাঘাটে যানবাহন কমতে শুরু করে। সারাদিনের পরিশ্রান্ত রাস্তাগুলি জনাকীর্ণতার ক্লান্তি বিনোদনের চেষ্টা আরম্ভ করে। অধিকাংশ ঘরের বাতি নিষ্প্রভ বা সম্পূর্ণ নেভানো। আশ্রমেও এর ব্যতিক্রম থাকে না। এখানেও দিনের ক্লান্তি দূর করার চেষ্টায় অধিকাংশ সাধুসন্তরা শয্যামুখীন হন। কিন্তু আজ এত রাত্রিতেও এখানে দিনের ব্যস্ততা বিদ্যমান। সব সাধুরাই এদিক ওদিক ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছেন। প্রত্যেকের চোখে মুখে অজানা আতঙ্কের ছাপ, কথায় বলে 'পুলিসে ছুঁলে বার ঘা', আমার মনে হয় বার্ধক্যে ছুঁলে মানুষের দেহে চল্লিশ ঘাকেও অতিক্রম ক'রে যায়। এ সময় মানুষের শরীরে বার্ধক্যজনিত বহু অসুখের আগমন ও সমাবেশ দেখা যায়। সাধু সন্ন্যাসীরাও এর হাত থেকে রেহাই পান না। তাঁর দেহে একের পর এক বহু অসুখের আগমন হয়েছে, যথারীতি তাঁকে পরীক্ষা করলাম, অবস্থা সত্যিই খারাপ।

ভবিষ্য কর্মপদ্ধতি ও চিকিৎসা কি হবে, কি কি ওষুধ চলবে বা বাতিল হবে এই নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম, বহু অনুরাগীর বহু প্রশ্নের উত্তর ঠাণ্ডামাথায় স্থির হ'য়ে দিতে লাগলাম। অসুখের প্রভাবে মহারাজজী এখন বেশ ঘোরেই রয়েছেন। একটু আধটু হ্যাঁ-না করতেও খুব কষ্ট হয়। তবুও জ্ঞান কতটা আছে দেখবার জন্য স্বামী বিশ্বপ্রেমানন্দজীকে বললাম, "আমি যে এসেছি মহারাজজীকে বলুন।" স্বামীজী মহারাজজীর কানের কাছে জোরে জোরে বললেন, "বাবা, বাবা, ডাক্তার বাবু এসেছেন। ডাক্তার পি· সি দাস এসেছেন আপনাকে দেখতে।" এহেন অবস্থায় হঠাৎ আমি সহ ঘরশুদ্ধ সকলে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। হঠাৎ মহারাজজী স্বামীজীকে অতি স্পষ্টভাবে আদেশ করলেন, "একটা মালা দিতে পারনি, একটা মালা পরিয়ে দাও।" তখনই স্বামীজী এক নিমিষে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ প্রণবানন্দজীর মন্দির থেকে আশীর্বাদী মালা এনে আমায় পরিয়ে দিয়ে মহারাজজীকে জানালেন। যাঁর মুখ দিয়ে ক'দিন ধরে কোন কথা বেরোয় নি, তিনি কি ক'রে এ রকম কথা বললেন তা নিজে একজন ডাক্তার হ'য়ে অবাক্ হ'য়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম। মহারাজজীর মুখে একটা আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেতে পেতেই তিনি আবার সংজ্ঞাহীন হলেন। এই দৃশ্য এই ঘটনা প্রবাহের তড়িৎ-গতিতে আমি স্বভাবতই আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম। দীর্ঘদিন আমি যাঁকে চিকিৎসা করেছি, যিনি কখনও আমাকে এভাবে অভিনন্দিত করেন নি, তিনি আজ এমন করলেন কেন? মন এলোমেলো চিন্তায় জর্জরিত হ'ল। আমি চিন্তার খেই হারালাম, প্রসঙ্গত একটা কথা বলা দরকার যে, যখনই আমি মহারাজজীকে দেখতে আসতাম তিনি সব সময় আমাকে ঠাকুরের প্রসাদ দিয়েছেন। এমন কি শীতের মরসুমে পিঠেপুলিও খাইয়েছেন। নিজস্ব ভঙ্গীতে মাথায় হাত দিয়ে আমাকে আশীর্ব্বাদ করেছেন। কতবার বলেছেন "তুমি আমাদের নিজের লোক, তোমার ঋণ আমরা কোনদিন শোধ

করতে পারব না।'' প্রসঙ্গত আর একটা কথা বলে রাখি, আমি সঙ্ঘের আরো অনেক স্বামীজীদের চিকিৎসা করতাম। কিন্তু আজ যা' ঘটলো তা কোনদিন কখনও আগে ঘটেনি। কাজ শেষ হ'লে যখন আমরা বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বিদায় নিই, তখন যেমন আমরা মালা পরিয়ে দিয়ে বিদায় অভিবাদন জানাই, এ যেন ঠিক সেই মত ব্যাপার মনে হ'ল। তিনি শুধু আমাকেই মালা পরিয়ে বিদায় দিলেন না, সেই সঙ্গে তাঁর পার্থিব জীবনের উপর বোধ হয় এবার ইতি টানলেন। সেই সময় প্রত্যেক সন্ন্যাসীদের মনও এই প্রতিক্রিয়ায় ভারাক্রান্ত হ'ল।

পরের দিন রবিবার, ৮ই জানুয়ারী।

আমার বহুদিনের প্রথানুযায়ী মাসের দুটি রবিবার আমার দেশের বাড়ী তমলুক শহরে যাই। ভোরের ট্রেন ধরার আগেই সবার অনুরোধে মহারাজজীকে একবার দেখে যেতে হ'ল, এখন আরো খারাপ অবস্থা দেখলাম। তিনি প্রায় সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন। যাই হোক, যথারীতি নির্দেশ দিয়ে ভোরের গাড়ীতে তমলুক রওনা হলাম। ফেরার সময় বিকেল বেলা অবশ্যই তাঁকে দেখে যাব স্বামীজীদের এ কথা দিয়ে গেলাম। তাঁর দয়ায় আমি কথা রাখতে পেরেছিলাম। হাওড়া স্টেশান থেকে একেবারে সোজা আশ্রমে এসে তাঁকে আমি আমার জীবনে শেষ বারের মত পরীক্ষা করে যাই। সন্ধ্যা তখন প্রায় সাড়ে ছ'টা সাতটা। তাঁর দৈহিক অবস্থা যে অত্যন্ত খারাপ ছিল, আর তিনি যে নির্বিকল্প সমাধির দিকে ধীরে ধীরে পদ সঞ্চালন আরম্ভ করে দিয়েছিলেন তা' বলাই বাহুল্য। যে কোন দুর্ঘটনার জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলে আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ী ফিরলাম। বাড়ী ফেরার ঘণ্টা খানেক পরেই ঘন ঘন কলিংবেলের শব্দে নীচে নেমে দেখি দু'জন সন্ন্যাসী আশ্রম থেকে উপস্থিত। তাদের মুখে কোন বাক্য ছিল না। তাদের মুখের চেহারা দুর্ঘটনার ইঙ্গিত প্রকাশ করছিল। আমি অনুভব করলাম সব শেষ হ'য়ে গেছে। এই সময় তারা

চাইলেন আমি যেন আর একবার এই বিপদের সময় আশ্রমে কিছুক্ষণের জন্য যাই। ট্যাক্সি দাঁড়িয়েই ছিল। আমি উনাদের সাথে রওনা হলাম। নীরবতা ভঙ্গ করে আমি বললাম, "আপনারা মহারাজকে যেভাবে সেবা শুশ্রূষা করেছেন এর পর আর কিছুই করার ছিল না। আপনাদের দুঃখ করার কিছু নেই। তাঁর ঈপ্সিত স্থানেই তিনি গমন করেছেন।" খবর তখনও বিশেষ ছড়িয়ে পড়েনি, আশ্রমে অন্য দিনের মতই ভীড় ছিল। মহারাজজীর ঘরে 'ওঁ হর গুরো শঙ্কর শিব শম্ভো' নাম গান হচ্ছিল। আর আমার মনে হ'ল তাঁর সারা শরীর থেকে একটা উজ্জ্বল জ্যোতি বার হচ্ছিল। স্বামী বিজয়ানন্দজী কাছেই ছিলেন, তিনি কাঁদতে কাঁদতে আমায় বললেন, "কাল গুরুদেব আপনাকে মালা পরিয়েছিলেন, আজ আপনি তাঁকে শেষ মালা পরিয়ে দিন।" আমি একটা ফুলের মালা তাঁর গলায় পরিয়ে দিলাম। তারপর অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে স্থিরভাবে কিছুক্ষণ বসলাম। খানিক সময় কাটানোর পর Death Certificate লিখে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। ফেরার পথে মন কেবল উদাস হ'তে লাগল। যে মহাপুরুষ আজ বিদায় নিলেন আমার মত সংসারী মানুষেরও অনেকে কাছের লোক ছিলেন। আমাকে এত ভালো-বাসতেন যে, আমার নাম শুনলেই এই মহাব্যাধির নিরবচ্ছিন্নতার নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেও কখন কখন তিনি চোখ মেলে আমার দিকে তাকানোর চেষ্টা করতেন। আমার আনন্দ শুধু এই যে, তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত মধুমাখা কথাগুলি নিজের কানে প্রবেশ করাবার অবাধ অধিকার পেয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিছক ডাক্তার-রোগীর সম্পর্কের চেয়ে অনেক বেশি ও সুদূরপ্রসারী ছিল। তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে স্থূল শরীরে নেই সত্যি, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার গত কয়েক বছরের যোগাযোগের ঘটনাপঞ্জী এখন মহারাজজীর সত্যিকারের মূর্ত্তি ধরে আমার হৃদয়ে চির জাগ্রত রইল। জীবনে জীবিকা নির্বাহ করার জন্যে হাজার হাজার

রোগী দেখলাম, অনেক সাধু-সন্ন্যাসীরও চিকিৎসা করলাম, কিন্তু এই মহাপুরুষের কাছে সেবা করার সুযোগে যা দেখলাম, যা পেলাম, তা' সবই অনুভবের, সবটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারলাম না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতার কয়েক লাইন মনে পড়ে—

"... ... .. জানি তব করতলপুটে
অজস্র ধন কত লুটে কত টুটে
তারা ক্ষণকাল তরে আমার জীবনে আসি
চিরকালতরে সার্থক করে প্রাণ।"

---

* Prof. P. C. Das

M.D.(Cal.). F.I.C.A. (U.S.A.) F.C.C.P. (U.S.A) Professor and Head of the Department of Medicine, Calcutta National Medical College. Senior Visiting Physician, Chittaranjan Hospital, Extra Mural Teacher, College of Medicine, Calcutta University.

ভক্তের ভগবান

সে প্রায় ১৮/১৯ বছর আগেকার কথা। বছর দেড় দুই হ'ল পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজের সেবায় নিযুক্ত হয়েছি। তাঁর ভাবধারা বিশেষ কিছু বুঝে উঠতে পারিনি। ফলে প্রায়ই নানা রকম ভুল করে বসি। কোন সময় তিনি আমার এই অবোধ ভাব দেখে স্নেহপরবশ হয়ে হাসেন। আবার কোন সময় শিক্ষা দেবার জন্যে স্নেহের শাসনও করেন—এইভাবে দিন কাটছে।

একদিন বেলা সাড়ে নয়টা-দশটার সময় তিনি চিঠি লিখতে বসলেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। হঠাৎ বৃষ্টি এলো। চিঠিটা বোধহয় খুব জরুরী ছিল। প্রাকৃতিক আবহাওয়ার দিকে তাঁর খেয়াল ছিল না। তিনি একমনে লিখে যাচ্ছেন। জানালার পাল্লা বন্ধ করে দিলাম। হঠাৎ ঘর অন্ধকার হ'ল। তিনি আমার দিকে

তাকিয়ে বললেন, "কি করস্ ?" আমি ভয় পেয়ে বললাম—বৃষ্টি আসছে। তিনি বললেন "সে-কিছু না, খুলে দে।" আমি জানালা খুলে দিলাম। কিন্তু ঘরে বৃষ্টি সে ভাবেই পড়ছে দেখে আমি আবার জানালা বন্ধ করায় ঘর অন্ধকার হ'ল। বিরক্তির সুরে বললেন—"তোর জ্ঞান থাকা দরকার, আমি লিখতে বসেছি, সঙ্ঘের কাজ, দরকার হলে স্বামীজী মহারাজ নিজে দাঁড়িয়ে জানালা পাহারা দেবেন। জল আসবে না, জানালা খুলে দে।" আদেশ পেয়ে জানালা খুলে দিলাম। তিনি চিঠি লিখে চল্লেন। বৃষ্টি হচ্ছেই। আমি জানালার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ঘরে আর জল এলো না।

আর একদিনের ঘটনা। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজ রথযাত্রার পর কলকাতা আসার জন্য পুরী ষ্টেশনে এসেছেন। তখন সকলেই একসঙ্গে একই বগীর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতেই আসতেন।

বলা বাহুল্য, আজ পরমপূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজেরও সকলের সঙ্গে একই বগীতে আসার ব্যবস্থা। আজও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। পুরী এক্সপ্রেস ষ্টেশনে আসার পর পরই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সকলে ভিজতে ভিজতেই ট্রেনের মধ্যে মাল উঠালাম। আমাদের নির্দিষ্ট বগীটা শেডের বাইরে ছিল। শ্রীমৎ ওঁকারানন্দ স্বামীজী পূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজকে নিয়ে শেডের নীচে অপেক্ষা করছেন। এদিকে ট্রেন ছাড়তেও খুব বেশী আর দেরী নেই। বগীর মধ্যে তাঁর আসন করা হয়েছে। মালপত্র সাজানো হয়েছে। এবার শুধু তাঁর উঠার অপেক্ষা। ছাতা নিয়ে আমরা তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছি। কি ভাবে তাঁকে নেওয়া হবে, নানা রকম জল্পনা-কল্পনা চলছে। তিনি আমাদের এই অবস্থা আর বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য তাঁর চিন্তা—বৃষ্টিতে ভিজে তারা অসুস্থ হয়ে পড়বে। এইসব কথা হতে হতেই শ্রীমৎ ওঁকারানন্দ স্বামীজী

তাঁকে বললেন—"এবার চলুন, আর দেরী করা যায় না।" শুনে তিনি বল্লেন—"চল যাই।" সেদিন আমরা অভিভূত হয়ে গেলাম—ঠিক যে মুহূর্তে তিনি বগীতে আসলেন ঠিক সেই সময়ে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য আচমকা বৃষ্টিটা থেমে গেল। তিনি ট্রেনে উঠার সাথে সাথেই আবার প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়তে থাকল!

আর একবারও তিনি রথের পরে পুরী থেকে ফিরছেন। এবার পূজ্য শ্রীমৎ যোগানন্দ স্বামীজী ও শ্রীমৎ অদ্বৈতানন্দ স্বামীজী উপস্থিত আছেন। সকলকারই টিকিট রথযাত্রার পরের পরের দিন। এবার শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর শরীরটা বিশেষ ভাল নেই। শ্রীমৎ যোগানন্দ স্বামীজী রথের পরের দিন সকাল বেলা এসে শ্রীমৎ বড় স্বামীজীকে রাত্রের গাড়ীতে কলকাতা রওনা হয়ে যেতে বললেন। যাতে আগামীকাল এই ভীড়ের মধ্যে তাঁর কষ্ট না হয়। তিনিও রাজী হয়ে গেলেন। শ্রীমৎ বড় স্বামীজী সহ আমরা কয়েকজন কলকাতা এসে পেঁছিলাম। আদেশ মতো পরের দিন ট্রাক ও গাড়ী নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে পেঁছে জানলাম—গাড়ী আসতে দেরী আছে। বন্যায় রেল লাইন ডুবে গেছে। পুরী এক্সপ্রেস আসতে পারছে না। আমরা আশ্রমে চলে এলাম। তৃতীয় দিন রাত্রি প্রায় দশটায় সকলে ফিরলেন। সকলের শরীরের সে কি করুণ অবস্থা! শ্রীমৎ স্বামীজীরা সহ প্রায় সকলের মুখে এক কথা—শ্রীমৎ বড় স্বামীজী কি অদ্ভুতভাবেই না আগের দিন চলে আসলেন। অসুস্থ শরীরে তিনি এই অবস্থার মধ্যে পড়লে তাঁর অত্যন্ত কষ্ট হোত! পরের দিন সকালে এসব আলোচনার সময় পূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজ বললেন—"তিনি কি ভাবে যে রক্ষা করেন তা তিনিই জানেন!"

সে-বার শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজ নবনির্মিত শ্রীগুরুমন্দির উদ্বোধন করতে শিলিগুড়ি যাচ্ছেন। বিকালে দার্জিলিং মেল। তখন তিনি অতি বৃদ্ধ। সাধারণতঃ ফার্ষ্ট ক্লাসে টু বার্থ ক্যুপ (coupe) রিজার্ভেশন করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। ফোর বার্থে অন্য লোকের

মধ্যে উঠলে তাঁর একটু অসুবিধা হয়। ষ্টেশনে পেঁছানোর পরে আমরা জানতে পারলাম তাঁর রিজার্ভেশন ফোর বার্থ এ হয়েছে। বাইরে থেকে রদ বদলের কোন উপায় নেই। গাড়ী ছাড়তেও বেশী দেরী নেই। আমরা তাড়াতাড়ি মাল উঠিয়ে ফেললাম। ক্যুপের মধ্যে দেখি বিশিষ্ট সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসু তার মধ্যে আছেন। শ্রীমৎ বড় স্বামীজী যদি এর মধ্যে না যেতে চান এই ভেবে আমরা উদ্বিগ্ন। কারণ, সম্মানিত লোকদের তিনি বিশেষ মর্যাদা দিতেন। তাঁদের সামনে কোন কিছুই করতে চাইতেন না। ঠিক তাই হ'ল। সব দেখে শুনে তিনি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। আমি আর স্বামী হংসেশবরানন্দজী তাঁকে বললাম—"আপনি একটু বসুন, আমরা দেখি কি করতে পারি।" একটা টু বার্থ ক্যুপে দেখলাম স্বামী-স্ত্রী বসে আছেন। আমরা তাঁদের পূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজের বয়স ও শারীরিক অবস্থা জানিয়ে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করতে লাগলাম আসন বদল করার জন্যে। বার বার অনুরোধেও তাঁরা কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। এই কথাবার্ত্তা শুনে পাশের টু-বার্থ ক্যুপের ভদ্রলোক অযাচিতভাবে এসে বললেন—"আমাদের ক্যুপে নিয়ে আসুন, আমি ছেড়ে দিচ্ছি।" আমরা বললাম—"আপনাদের মালগুলো আমরা বাইরে রাখি। উনাকে আমরা এখানে নিয়ে এসে আপনার মাল আমরা পেঁছে দেব।" এই বলে যেই আমরা সেই মালে হাত দিয়েছি, আশ্চর্য্যের কথা কোথা থেকে আর এক ভদ্রলোক অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে আমাদের জিনিসপত্রসহ পূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজকে নিয়ে আসতে বিশেষ সাহায্য করলেন। আবার ঐ সহৃদয় ভদ্রলোকদের জিনিসপত্রও বিশেষ তৎপরতার সহিত ফোর-বার্থ ক্যুপে পেঁছে দিলেন। চলন্ত গাড়ীতে ঐ আগন্তুকের সাহায্য ছাড়া আমাদের দুজনের পক্ষে এই কাজ দুষ্কর হয়ে পড়তো। যে পরিবারটি স্বার্থ ত্যাগ করেছিল তাঁদের নিয়ে এসে শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর সহিত দর্শন করিয়ে প্রসাদ দিয়ে দিলাম।

এবার সাহায্যকারী আগন্তুক ভদ্রলোকটির সন্ধানে বেরিয়ে সবগুলি কুপ খুঁজেও তাঁকে দেখতে পেলাম না। বাথরুমগুলোর কোনটাতেও নেই। কৌতূহল বেড়ে গেল, তখন আমরা দুজনেই আবার তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁকে কোথাও পেলাম না। এর মধ্যে কোন ষ্টেশন আসেনি। ট্রেন কোথাও থামেও নি। সেই বগি দিয়ে অন্য বগিতে যাবার রাস্তাও ছিল না। তথাপি ভদ্রলোককে পাওয়া গেল না। একজন সাধারণ ভদ্রলোকের পক্ষে সেই মুহূর্তে ঐ ভাবে চলন্ত ট্রেনের মধ্যে থেকে অন্তর্ধান হওয়াটা বিস্ময়কর! এই অলৌকিক ঘটনা শুনে শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজের চোখ দুটো জলে ভরে গেল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—"এ যে কি রহস্য, এ যে তাঁর কি করুণা, আমার মতো নগণ্য সেবকের প্রতি তাঁর এ যে কি অসীম দয়া—তা কি করে বোঝাব।"

আমি রাখি যারে কে মারে তাহারে
আমি মারি যারে কে রাখে তাহারে
বাঁধা থাকি সদা ভক্তের দুয়ারে।
ভক্তির অনলে সঁপেছি প্রাণ,
ভক্তির কাঙ্গাল আমি চিরকাল,
ভক্ত আমার প্রাণের প্রাণ ॥

—সঙ্ঘভৃত্য

স্বামী অদ্বৈতানন্দজী : পূর্ব্বাশ্রমের আরো কথা

[প্রথম খণ্ডের পর]

মদীয় আপন খুল্লতাত স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল—রাজেন্দ্র নাথ আশ। যশোহর জেলার অন্তর্গত কেশবপুর থানায় সুফলাকাঠী স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পাশ করিয়া দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী কলেজে অধ্যয়ন করেন। সেখান

থেকেই খুলনা আশ্রমে ব্রহ্মচারী বিনোদের* আহ্বানে সাড়া দিয়া আশ্রমে চলিয়া যান। রাজেন্দ্র খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। একবার ইতিহাসের পরীক্ষায় এক শতের মধ্যে ৯৫ নম্বর পান। শিক্ষক মহাশয় বলেন—"একশ' নম্বর দেওয়ার নিয়ম নাই, নিয়ম থাকিলে একশ'ই দিতাম।" শিক্ষক মহাশয়েরা তাহাকে খুব স্নেহ করিতেন। তিনি যেমন লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন তেমনি পরোপকারীও ছিলেন। গ্রামে কাহারও কোন কঠিন অসুখ হইলে দিনরাত্রি সমানভাবে তাহার সেবা করিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতেন। সহপাঠীরাও তাহার এই কার্য্যে সহযোগী হইত। রোগীর ঔষধপথ্যাদি খাওয়ান, ডাক্তারের সহিত যোগাযোগ করা ইত্যাদি সব কাজই নিজেরা করিতেন। বাড়ীর লোক অপেক্ষা তাহারাই যেন রোগীর নিকট বেশী আপন হইয়া যাইত। পরবর্ত্তীকালে দেখা যাইত ২০।২৫টি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শিশির একটি কাঠের বাক্সে ঔষধ সাজান থাকিত। সাধারণ অসুখ হইলে সেই সব ঔষধ বিনামূল্যে রোগীদের দিতেন।

বর্ষাকালে গ্রামের কাঁচা রাস্তাগুলি জলকাদায় নষ্ট হইয়া যাইত। বর্ষার পর সেগুলি সংস্কারের চেষ্টা করিতেন। ছুটির দিনে সঙ্গীদের লইয়া রাস্তায় মাটি দেওয়া, রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতেন।

ধর্ম্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানেও তিনি খুব আগ্রহী ছিলেন। গ্রামে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা ইত্যাদিতে সুন্দর ভাবে পূজা আরতির ব্যবস্থা করিতেন। পূজার পর প্রসাদ বিতরণ করা হইত। একবার রথোৎসবে তিনি নিজে ঠিক করিলেন যে এমন ভাবে একখানা রথ তৈয়ারী করিবেন যাহা দেখিয়া গ্রামের লোক আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে। রথ যেন আপনা হইতেই চলিবে। পরিকল্পনা অনুসারে রথ তৈয়ারীর সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হইল। রথের চাকাও উহাতে লাগান ও কাঠের উপর বাঁশের বাকারী দিয়া

* পরবর্ত্তীকালে স্বামী প্রণবানন্দ

রথের পাটাতন তৈয়ার করা হইল। বাড়ীতে একটি ভাঙ্গা হালকা কাঠের বড় বাক্স ছিল। সেই বাক্সের উপরের ঢাকনী ও তলের অংশটি বাদ দিয়া চারিদিকের ঘেরাটি রাখা হইল। বাঁশের নির্ম্মিত পাটাতনের উপর উহা বসান হইল। রথের উপরের অংশটি সুন্দর-ভাবে সাজান হইল। বাক্সের ঘেরের মাঝখানে একজন লোক বসিয়া পা দিয়া রথটি আস্তে আস্তে চালাইবে। বাহিরের লোক তাহাকে দেখিতে পাইবে না। তাই মনে হইবে জগন্নাথদেবের রথ যেন আপনা হইতেই চলিতেছে। তাঁহার এই অদ্ভুত পরিকল্পনায় গ্রামের লোক সত্যই খুব আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল। গ্রামের পাশেই সদর রাস্তার ধারে একটি বটবৃক্ষ। এই বটবৃক্ষের তলেই রথের মেলা বসিত। রথ টানা হইত। এই বটবৃক্ষের একটা দিকে ইঁট দিয়া বাঁধান একটা বড় বেদী। এই বেদীর উপরেই গ্রামের বিভিন্ন পূজা-অনুষ্ঠান, হরিলুট ইত্যাদি হইত।

প্রতি বৎসর গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়ীতে জাঁকজমক করিয়া লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে। রাজেন্দ্রদের বাড়ীতেও লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে প্রচুর পরিমাণে খই, মুড়কী, নারিকেলের নাড়ু করা হইত। বাড়ীতে প্রচুর নারিকেল, গুড়, ধান ইত্যাদি থাকায় এইসব ব্যাপারে কৃপণতার লেশমাত্র ছিল না। লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে গ্রামের সকল বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করা হইত। পূজার রাত্রিতে বা তাহার পরের দিন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের খই, নাড়ু ফলাদি খাইতে দেওয়া হইত। প্রথা অনুসারে কাঙ্গালীর দলও বাড়ীতে বাড়ীতে আসিত, তাহাদেরও খই, নাড়ু ইত্যাদি দেওয়া হইত। তিনি যদি খই নাড়ু দিতে বসিতেন তবে অচিরেই পাত্র শূন্য হইয়া যাইত। কারণ, যে যাহা চাহিত তিনি প্রাণ ভরিয়া তাহাকে তাহা দিয়া দিতেন। শুধু এই ব্যাপারে নয়, অন্যান্য জিনিস, যেমন আম, কাঁঠাল, নারিকেল ইত্যাদিও লোকে চাহিলে দ্বিধাহীন ভাবে দিয়া দিতেন। শুধু তিনি নন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মদীয় পিতৃদেব হৃদয়নাথ আশও ঠিক এই প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। লোকে কিছু চাহিলে বা

তাহাদের অভাব দেখিলে টাকা-পয়সা বা জিনিসপত্রাদি দিয়া তিনি তাহাদের আশা পূরণ করিতেন।

তখন গ্রামে একটি সুন্দর নিয়ম প্রচলিত ছিল। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে গ্রামে বেশ কিছু সংখ্যক বাড়ীতে সত্যনারায়ণের শিন্নি দেওয়া হইত। এই উপলক্ষ্যে রাজেন্দ্রের নেতৃত্বে চাঁদা তুলিয়া কয়েকটি বিরাট আকারের বেতের ধামা তৈয়ার করান হয়। চালের গুড়া দিয়া দুধ, কলা, গুড় সহযোগে ঐসব ধামায় শিন্নি গোলা হইত। ইহার জন্য কাহাকেও কোন জিনিস কিনিতে হইত না। গ্রামের প্রত্যেক বাড়ী হইতে পালাক্রমে দুধ, গুড়, কলা ইত্যাদি চাহিয়া লইয়া ইহা করা হইত। কেহ কোন আপত্তি করিত না। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকদেরও নিমন্ত্রণ করা হইত। বহুলোক আসিত। ছেলে, মেয়ে, বৃদ্ধ কেহই বাদ যাইত না। প্রত্যেকে আবার বাড়ীতে শিন্নি লওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরণের পাত্র লইয়া আসিত। যাহারা আসিত তাহারা সকলেই বসিয়া শিন্নি প্রসাদ গ্রহণ করিত এবং পাত্র পূর্ণ করিয়া বাড়ীতে লইয়া যাইত। এইরূপ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া গ্রাম্য জীবনে সত্যই বেশ আনন্দের সাড়া পড়িয়া যাইত। রাজেন্দ্র অগ্রণী হইয়া সহকর্মীদের লইয়া এই সব কার্য্য সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করিতেন।

খেলাধূলার প্রতিও তাঁহার নিত্যকার একটি আকর্ষণ ছিল। প্রতিদিন স্কুল হইতে আসিয়া কিছু জলযোগের পর সমবয়সীদের সহিত মাঠে ছুটিতেন। গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে ছিল একটি বিস্তীর্ণ মাঠ। সেই মাঠে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ধরণের খেলা খেলিতেন। মাঠের ঠিক পশ্চিম পার্শ্বেই ছিল একটি বিশালকায় বটবৃক্ষ। বৃক্ষটি বেশী উঁচু ছিল না। কিন্তু তাহার প্রচুর বড় বড় শাখা-প্রশাখা নীচেতে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ছিল। বালকেরা সেই শাখা প্রশাখায় চড়িয়া দোলনায় চড়ার ন্যায় দুলিতে থাকিত। কেহ বা তাহার ঝুরি ধরিয়া দোলা খাইত। ইহাতে মনে হইত বৃক্ষটি যেন স্বেচ্ছায় উঁচু না হইয়া বালকদের সঙ্গলাভে আনন্দ উপ-

ভোগের জন্য দোলনার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের আকর্ষণ করিতেছে।

বৃক্ষের মূলটি ছিল এমন, মনে হইত বৃক্ষের চারিপার্শ্বে যেন সে শয্যা বিছাইয়া রাখিয়াছে। এই শয্যা কোমল না হইতে পারে। কিন্তু তারও আকর্ষণ ছিল প্রবল। কৃষকেরা যখন কাজ করিতে করিতে খর তাপে ক্লান্ত হইয়া পড়িত তখন এই বৃক্ষমূলেই বিশ্রাম করিত। রাখাল বালকেরা গোচারণের সময় এই বৃক্ষশাখে ও বৃক্ষমূলে বসিয়া গরুগুলি লক্ষ্য রাখিত। বালকেরা খেলার পর এইখানেই বিশ্রাম করিত। হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি হইলে বৃক্ষটির নীচের বড় বড় গহ্বরগুলিতে আশ্রয় লইয়া নিজদিগকে রক্ষা করিত। দিনান্তে ক্লান্ত বকেরা যখন এই বৃক্ষোপরি আশ্রয় লইত তখন তাদের ঝাপ্‌টা ঝাপ্‌টি শব্দ বড়ই মধুর লাগিত। বকের ডানার সাদা রঙে বৃক্ষটি সাদা রঙে ভরিয়া যাইত। মাঠের পূর্ব প্রান্তে ছিল একটি প্রশস্ত বিল। জোয়ারের জলে বিলটি যখন পূর্ণ হইয়া যাইত তখন উহা সমুদ্রের ন্যায় দেখাইত। কূলে জলের ছক্ ছক্ শব্দ। বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দ জায়গাটিকে মনোরম করিয়া তুলিত। এই পরিবেশের মধ্যে যে মাঠটি সেই মাঠে রাজেন্দ্র সঙ্গীদের সহিত একটি দিনও না যাইয়া থাকিতে পারিতেন না। মাঠের পাশে প্রায়ই ২।১ খানা নৌকা বাঁধা থাকিত। যে দিন বেলা না হইত সেদিন নৌকা পাইলে নৌকায় বসিয়া সময় কাটাইতেন। কোন কোন দিন মাঠে বা বট বৃক্ষমূলে বসিতেন।

সমবয়সীদের মধ্যে তাঁহার একটি নেতৃত্ব ভাব ছিল বরাবরই। প্রতিদিন বিকালে খেলা বা গল্প শেষে—সন্ধ্যা হইলেই তিনি সকলকে বলিতেন "আর না, এখন সবাই চল, হাত পা ধুয়ে পড়তে বসবে।" এই কথাটি তাঁহার যেন একটি নিত্যকার অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। সকল কথা ও কাজে তিনি সঙ্গীদের উপর অভ্যাসমত নিজের অজ্ঞাতেই নেতৃত্বভাব দিয়া গেলেও কেহ তাঁহার উপর বিরূপ মনোভাব পোষণ করিত না।

একবার তিনি চিন্তা করিলেন হাতে লেখা একটি ম্যাগাজিন বাহির করিতে হইবে। তাঁহার সর্বক্ষণের সঙ্গী তাঁহার খুড়তুতো ভাই নলিনী এবং অপর তিনজন ছাত্র যাহারা তাহাদের বাড়ীতে থাকিয়া সুফলাকাঠি স্কুলে পড়িত তাহাদের সহিত আলোচনা করিয়া কাজ আরম্ভ করিলেন। এই সময় পাড়ার প্রত্যেক বাড়ীতে দুই একজন করিয়া ছাত্র থাকিয়া পড়াশুনা করিত। সকলকে ছোট ছোট গল্প বা প্রবন্ধ লিখিতে বলিলেন। ক্লাসেও সকল ছাত্রকে লিখিতে বলা হইল। প্রথম দিকে বহু চেষ্টা করিয়া কিছু সংখ্যক লেখা সংগ্রহ করা হইল। তাহা হইতে ভাল লেখা সংগ্রহ করা হইল। কাগজ কিনিয়া খাতা বাঁধা হইল। উহাতে প্রবন্ধ ও গল্পগুলি সুন্দর ভাবে হাতে লেখা হইল। এইরূপে উদ্যমী পুরুষের সম্পাদনায় "উদ্যম" নামে ত্রৈমাসিক হাতে লেখা ম্যাগাজিন প্রকাশিত হইল। পরবর্ত্তী সময়ে লেখা সংগ্রহ করিতে বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। তিনমাস অন্তর হাতে লেখা 'উদ্যম' নিয়মিত বাহির হইতে থাকিল। উদ্যমের প্রত্যেকটি সংখ্যায় হাতের লেখাটি এতই সুন্দর ছিল যে দেখিলেই মনে হইত অসীম ধৈর্য্যের পরিচয় বটে! রাজেন্দ্র সন্ন্যাসী হওয়ার বহুকাল পর পর্য্যন্তও "উদ্যম" এর বেশ কিছু সংখ্যক কপি তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমে সযত্নে সুরক্ষিত ছিল। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময় সেগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

একবার তিনি পরিকল্পনা করিলেন একটি লাইব্রেরী করিবেন। খুড়তুতো ভাই নলিনীর সহিত আলোচনা করিলেন। পরে সহপাঠী বিজয় গোলদার, শ্রীকান্ত রাহা, বীরেন ঘোষ, রতিকান্ত হালদার, পুলিন নাথ প্রভৃতির সহিত আলোচনা করিয়া পুস্তক সংগ্রহের দায়িত্ব দিলেন। পুস্তক সংগ্রহ অভিযান চলিল। অল্পদিনের মধ্যেই প্রচুর পুস্তক সংগৃহীত হইল। এখন সমস্যা দেখা দিল কোথায় কি ভাবে পুস্তকগুলি রাখা হইবে। তিনি একটু চিন্তা করিলেন এবং অচিরেই সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজিয়া

বাহির করিলেন। এক ছুটির দিনে সহকর্ম্মীদের সকলকে সকালের দিকে আসিতে বলিলেন। নির্দিষ্ট দিনে সকলে আসিলে পর নিজেদের বাঁশবন হইতে কিছু সংখ্যক বাঁশ কাটিলেন। বাঁশের বাকারী তৈয়ার করা হইল। লাইব্রেরী ঘরের জন্য ঘরের বড় বারান্দাটি সুন্দর রূপে ঘিরিয়া লওয়া হইল। বই রাখিবার জন্য বাকারী দিয়া তাক তৈয়ার করা হইল। উহাতে সমস্ত বই সাজাইয়া রাখা হইল। খাতা বাঁধিয়া সমস্ত বইতে ক্রমিক নম্বর দিয়া খাতায় লেখা হইল। পাড়ার ভিতরে বইগুলি পড়িতে দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। লাইব্রেরীতে বসিয়াও বই পড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বাল্যে বা যৌবনে খাওয়ার ব্যাপারে তিনি বড় উদাসীন ছিলেন। খাইতে বসিলে যাহা কিছু তাঁহার মুখে ভাল লাগিত তিনি তাহা নির্ব্বিকারে খাইয়াই চলিতেন। ইহাতে হুঁস্ থাকিত না। খাওয়ার পর যখন উঠিতেন ও বুঝিতেন যে খাওয়া অত্যন্ত বেশী হইয়া গিয়াছে তখন পরিবেশককেই অপরাধী সাজাইতেন। পরবর্ত্তী কালে সন্ন্যাস জীবনেও কিন্তু তাঁহার এই ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। বাড়ীতে যেদিন পীঠা পায়স তৈয়ার হইত সেদিন তিনি ভাতই খাইতেন না। পীঠা পায়স খাইয়াই উদর পূর্ত্তি করিতেন। বাড়ীর নিকটেই আম কাঁঠালের বাগান ছিল। খুড়তুতো ভাই নলিনীর সহিত প্রায়ই বাগানে যাইতেন। গাছে পাকা কাঁঠাল পাইলেই দুইজনে তলায় বসিয়া খাইতেন। পাকা কাঁঠালের সহিত কাসুন্দী ও লেবুর রস মাখিয়া খাইতে তাঁহার ভাল লাগিত। বাড়ীতে একদিন চিড়া কোটা হইতেছে। সেই সময় নলিনীর সঙ্গে বাজি রাখিলেন—কে আধসের চিড়া ঐখানে বসিয়া খাইতে পারিবে। নলিনীর পক্ষেই উহা সম্ভব হইয়াছিল। কারণ, তাহার স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য ছিল সেইরূপ। রাজেন্দ্র বাড়ী ছাড়িয়া আশ্রমে আসিলেন। বাড়ীতে থাকাকালীন যে সকল জিনিস তিনি খাইতে ভালবাসিতেন তাঁহার মা সেগুলি খাওয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে

বাড়ী হইতে ডাজা পাঠা, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি বালীগঞ্জ আশ্রমে মাঝে মাঝে পাঠানো হইত। স্বামীজীরা সেগুলি খুব তৃপ্তির সহিত আহার করিতেন। সেই কথা জানিবার পর হইতে তাঁহার মা পুনরায় সেগুলি আহার করিতেন।

রাজেন্দ্র বাড়ী হইতে আশ্রমে চলিয়া যাওয়ার পর তাঁহার মা তাঁহাকে বাড়ী আসিবার জন্য প্রায়ই চিঠি দিতেন। তিনি সে চিঠির কোন উত্তর দিতেন না। বহু কাল পরে একবার চিঠি দিলেন, লিখিলেন—"চারিদিকে শত শত মা তোমার ন্যায় আমায় ডাকিতেছে। আমি কোন্ দিকে যাইব?" পরে রাজেন্দ্রের মা শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের নিকট পত্র লিখিতে থাকেন। প্রায় বার বৎসরাধিক কাল পর শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের নির্দ্দেশে একদিনের জন্য তিনি বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। একরাত্রি যাপন করিয়া পরদিন তিনি চলিয়া যান। বাড়ীতে নিরামিষ আহার করিলেন। তাঁহার বৌদি বাড়ীতে যাহাকে তিনি মায়ের ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন, সব সময় আবদার করিয়া আহারাদি করিতেন—তিনিই তাঁহার শুইবার জন্য সুন্দরভাবে বিছানা করিয়া দিলেন। রাজেন্দ্র পূর্ব্বে কোল বালিস ছাড়া শুইতে পারিত না। তাই বৌদি বিছানার ওপর একটি কোলবালিশ দিলেন! তখন তিনি বৌদিকে বলিয়াছিলেন—"আমি এখন ইঁট মাথায় দিয়া শুইতে পারি।"

খুলনা আশ্রমের উৎসবে প্রতি বৎসর গ্রাম হইতে বহু লোক নৌকা ভাড়া করিয়া যাইত। একবার তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়া এক আত্মীয় তাহার শিশুপুত্রকে তাঁহার নিকট দাঁড় করাইলে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি ওকে ধরিব না; মায়া বাড়িয়া যাইবে।" ইহাতেই বোঝা যায় তিনি আশ্রমজীবনের প্রথম দিকে নিজেকে কত সতর্ক ভাবে রাখিতেন।

শিশুকালে রাজেন্দ্রের একবার কঠিন পীড়া হয়। বাঁচিবার আশা ছিল না। ডাক্তার বহুদিন চিকিৎসা করিয়াও কিছু করিতে পারে নাই। গ্রামে কেদারনাথ পাল নামে এক ব্যক্তি তিন দিন মন্ত্র

পড়িয়া ঝাড়াইয়া দেওয়ায় তিনি সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। পাল মহাশয় বলিলেন—এ যাত্রায় তুমি রক্ষা পাইলে। কিন্তু ঝাড়াইবার তিন দিন পর হইতেই পাল মহাশয় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং অল্পদিন মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। জানি না—এই বাঁচা-মরার মধ্যে কোন রহস্য নিহিত আছে কি না!

ইনি বিবাহ প্রত্যাখ্যান করেন। ঈশ্বরারাধনা ও মানব সেবাই তো জীবনের উচ্চ লক্ষ্য। এই সংস্কার তাঁহার আবাল্য। 'আদর্শ বিদ্যার্থী' গ্রন্থে তিনি স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন তাহার উদ্ধৃতি দিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি—

"আমার বাল্যকালের ছাত্র-জীবনের কথা। সেই কালে আমরা কী রূপ এক শ্রেণীর দরদী, মরমী শিক্ষক ও গুরুজনের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম এবং তাঁদের আদেশ নির্দেশ কীরূপ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত পালন করতে অভ্যস্ত ছিলাম! বেশ স্মরণ হচ্ছে—যে অঞ্চলের ছাত্র ছিলাম, সেই অঞ্চলটি ছিল একান্ত দুর্গম। সেখানে না ছিল তেমন ভাল রাস্তা-ঘাট, না ছিল স্বচ্ছ পানীয় জল। তথাকার জীবনযাত্রার মানও ছিল অনেক খানি অনুন্নত ধরণের। এরূপ দীন পরিবেশের মধ্যে নিকটবর্তী একটি পল্লীতে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে কয়েকখানি টিনের ঘরে স্থাপিত হয় একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। সৌভাগ্য-ক্রমে বিদ্যালয়টির অধিকাংশ শিক্ষক ছিলেন আদর্শনিষ্ঠ ও সেবা-ভাবী। মুখ্যতঃ তাঁদের নির্দেশে আমরা শুরু করি গ্রামের রাস্তা-ঘাট নির্মাণ ও সমাজ সংস্কারের কাজ এবং তাঁদের প্রেরণাতেই আরম্ভ করা হয়—দীন-দুঃখীর পরিচর্য্যা ও মৃতের সৎকারাদি সেবামূলক প্রচেষ্টা।

এইকালে পুলিন বিহারী সরকার নামক আমার সমবয়স্ক জনৈক সহপাঠীর একটি কথায় আমার জীবনে কী অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছিল, তাও উল্লেখযোগ্য। বন্ধুটি একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন—'ভগবান্ লাভই মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য।' তার সেই

কথাটি শুনতেই যেন আমার মনের একটা পর্দা খুলে গেল। তখনই মনে মনে স্থির করে নিলাম—মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য যখন ভগবান্ লাভ তখন সেইটিই হবে আমার জীবনের পরম লক্ষ্য বস্তু। বলা বাহুল্য, তখন হতে স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে আমার শুরু হলো মহাপুরুষদের জীবনী ও ধর্ম-গ্রন্থাদির নিত্য পঠন-পাঠন। সৌভাগ্যক্রমে, এই কালেই শুরু হয়—দেশব্যাপী ভারতের মুক্তি আন্দোলন। ভাগবৎচিন্তা ও স্বদেশসেবার সমন্বিত আদর্শের চিন্তা-কল্পনা তখন হতে হলো আমার নিত্যকালের ধ্যান-জ্ঞান। সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে নিয়ে সেই আদর্শকে রূপায়িত করবার জন্য নিকটবর্তী পল্লী সমূহে আরম্ভ করা হলো বিবিধ সেবামূলক কাজ কর্ম। অর্থাভাবের জন্য বাঁশ কেটে তৈরী করা হলো আলমারী এবং তার মাধ্যমে আরম্ভ করা হলো একটি লাইব্রেরী, সমবেত চেষ্টায় একটি Parkও তৈয়ারী করা হলো পল্লীর সৌন্দর্য-শ্রী বাড়াবার জন্য। এরূপ কাজকর্মে নিযুক্ত থাকার ফলেই আমাদের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রামের বহির্মুখী বৃত্তি হলো ঊর্ধ্বমুখী, স্বদেশ-সেবা ও ভগবৎ-সেবার সমন্বিত আদর্শই ছিল এইকালে আমার জীবনের মুখ্য ব্রত।"

—বীরেন্দ্র আশ

প্রণমি তোমারে আজি

[শ্রীমৎ আত্মানন্দজী-স্মরণে]

প্রণমি তোমারে আজি হে স্বামীজী! হে ঋষি মহান্!
আত্মভাবনায় দীপ্ত, হে নির্লিপ্ত, মুক্ত মহাপ্রাণ!
'নিকুঞ্জ'—জননী-অঙ্কে, দেবশিশু নয়নাভিরাম,
সংঘকুঞ্জে সুপ্রসন্ন, তাই হ'ল 'আত্মানন্দ' নাম।
সেই সে কিশোর কালে কি সুর বাজিল তব প্রাণে,

তুচ্ছ হ'ল ভোগ-মায়া, বাহিরিলে স্বরূপ-সন্ধানে।
আপনারে সমর্পি'লে শ্রীগুরুচরণে নিরন্তর,
শুরু হ'ল আত্মযোগে শ্রান্তিহীন সাধন দুশ্চর।
'জয় শ্রীপ্রণবানন্দ!'—অনুক্ষণ কণ্ঠে উদীরণ,
প্রচারিলে যুগবার্ত্তা হে প্রবক্তা, হে মহাচারণ!
তুমি শিষ্য শিষ্টমতি শ্রদ্ধাবান্ শুশ্রূষু ধীমান্,
শ্রীগুরুবচনামৃত হে অভীত! করিয়াছ পান।
সে অমৃতরসরাশি গ্রন্থে গ্রন্থে রাখিলে সঞ্চয়,
অহো কি যে মধুচক্র! সুখাস্বাদ্য, সুরভি-নিলয়!
সে মধু করিয়া পান ভাগ্যবান শত ভক্তজন,
নাচে গায় ছন্দে ছন্দে মহানন্দে সদা নিমগন।
তুমি যদি না করিতে কে বা দিত মানুষেরে আনি,
গুরু-ভগবান্‌প্রোক্ত যুগবেদ 'সঙ্ঘগীতা' খানি?
তোমার 'সাধনবাণী' চিত্তগ্লানি করে অপনীত,
অপূর্ব্ব, অপূর্ব্ব দান—'যুগাচার্য্য-উপদেশামৃত'।
'জীবন-সাধন-পথে' বন্ধ, বিঘ্ন, বিপদ বিস্তর,
তব সারস্বত সেবা সুপথের দিল সুখবর।
তিলে তিলে উৎসর্গি'লে শরীর-শোণিত রাশি রাশি,
বিশ্বের অশেষ হিতে কি তপস্যা করিলে, সন্ন্যাসি?
অবিশ্রান্ত, অনিন্দিত প্রজ্ঞাদীপ্ত কর্ম্মশ্রম দানে,
সাফল্যের শত দীপ জ্বালি দিলে শত দিক পানে।
হে স্বামীজি!
মায়ামোহে মগ্ন আজি অন্ধ হেন মর্ত্ত্যের মানুষ,
অনাত্ম বস্তুতে করে আত্মবোধ তবু নাহি হুঁশ।
তোমার জীবনবেদ সে অধ্যাসে করি নিরসন,
আত্মার আনন্দবার্ত্তা দিকে দিকে করুক ঘোষণ।

স্বামী আত্মানন্দজী-স্মরণে

'প্রণব' পত্রিকার সম্পাদক তথা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দজী আর স্থূল শরীরে বর্ত্তমান নেই। গত ১৯শে অক্টোবর, ১৯৮৭ (বাংলা ১লা কার্ত্তিক, ১৩৯৪) সোমবার রাত্রি ১-৫০ মিনিটে অষ্টাশি বৎসর বয়সে Calcutta Pay clinic-এ তিনি শ্রীগুরুচরণে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত। তাঁর তিরোধানে যে স্থান শূন্য হলো তা সহজে পূর্ণ হবার নয়। স্বামীজীর উদ্দেশ্যে জানাই অন্তরের আকুতিভরা শ্রদ্ধা ও প্রণতি।

'প্রণব' পত্রিকার সূত্রে স্বামীজীকে খুব কাছে থেকে পেয়েছিলাম মদীয় সঙ্ঘজীবনের প্রথম ঊষাতেই। ইং ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত তিনি প্রণব পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ। শারীরিক কারণেই ঐ পদ থেকে অবসর নেন এবং উক্ত দায়িত্ব এসে পড়ে এই অযোগ্য সঙ্ঘসেবকের উপর। কিন্তু ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ বেদানন্দজীর তিরোধানে প্রণব পত্রিকার সম্পাদনের ভার শ্রীমৎ আত্মানন্দজীকেই গ্রহণ করতে হয়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সম্পাদকরূপে তাঁর নাম প্রণব পত্রিকার সহিত সংযুক্ত ছিল। এই সময়ে স্বামীজীকে আরো নিকটে পেয়ে কৃতার্থ হই। তদীয় স্নেহ, ভালবাসা, আশীর্ব্বাদ ও সংশিক্ষায় প্রচুর উপকৃত হয়েছি। স্বয়ং সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেও এই সেবককে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা ও সাহচর্য্য দিয়েছেন, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং কার্য্যতঃ তারই উপর ছেড়ে দিয়েছেন পত্রিকার সমস্ত কার্য্যের গুরুভার। এমন কি একবার সম্পাদকের পদটি পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে চেয়ে চিঠি লিখেন। কিন্তু, না, তা হতে পারে না। উত্তর দেওয়া হয়—"আপনি যেমন আছেন, তেমনি থাকবেন। আপনার অভিভাবকতার পুণ্য ছায়ায় কাজ করে সুখীই আছি।" তিনি ক্ষান্ত হন।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কলাগাছিয়া গ্রামে বাংলা ১৩০৬ সালে এক সম্ভ্রান্ত বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে এই মহাপুরুষের শুভ

জন্ম। পূর্ব্বাশ্রমের নাম নিকুঞ্জ। পিতা—রাজকুমার মৈত্র ; মাতা কামিনী সুন্দরী। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, কিঞ্চিৎ খর্ব্বতনু নিকুঞ্জ বাল্যাবধি শান্ত, সৌম্য, ধীর, স্থির। এই দেববালক যে অন্য সমবয়স্কদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তা তাঁর স্বভাববৈশিষ্ট্যেই প্রকাশ পায়। পাঠশালার পাঠ সমাপনান্তে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্ত্তি হন বাজিতপুর রাজকুমার-এড্ওয়ার্ড উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে। সঙ্ঘনেতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ (তাৎকালিক শ্রীবিনোদ) তখন উক্ত বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র। ঘটনা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের। বিষ্ণুনন্দন বিনোদ তৎকালে স্কুলের ছাত্র হয়েও আপন তপঃসাধনের খ্যাতিতে ব্রহ্মচারী বিনোদ নামে সাধারণ্যে অভিনন্দিত, সম্মানিত। শ্বেতবস্ত্র, শ্বেতোত্তরীয়, নগ্নপদ, সংযমনিষ্ঠ ও ব্রহ্মচর্য্যে সমুজ্জ্বলপ্রভ সেই দিব্য পুরুষের প্রথম দর্শনেই নিকুঞ্জ মুগ্ধ, অভিভূত, অতি-আকৃষ্ট। কিন্তু দ্বিধা ও সঙ্কোচে ঐ গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি বিরাট ব্যক্তিত্বের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তখনো আসতে পারেন নি। তিনি যে বালক, আর ঐ জ্ঞানতাপস বয়সে নবীন হয়েও প্রাবীণ্যে প্রদীপ্ত। সমীপবর্ত্তী হতে না পারলেও নিকুঞ্জ এই মহাপুরুষের স্বরূপ-পরিচয় সম্বন্ধে উৎসুক ও জিজ্ঞাসু। তাঁর নিজের ভাষায়—"যখনই দেখিয়াছি তখনই বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে কেবলই অবাক্ হইয়া ভাবিয়াছি এই ব্যক্তি কে ?*** কিন্তু বালক আমি, বিনা পরিচয়ে তাঁহার মত মহান্ ব্যক্তির সঙ্গে কি কথা বলিব ? তাই অন্তরের আকাঙ্ক্ষা অন্তরেই বিলীন হইয়া যাইত, দূর হইতে শুধু তাঁহাকে নির্ণিমেষ নেত্রে তাকাইয়া দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইতাম।"

এইরূপে অতিক্রান্ত হয় দীর্ঘ তিনটি বৎসর। অতঃপর শুভ সময় আসে বাং ১৩২৪ সালের জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৯১৭, এপ্রিল) মাসে। সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ লজ্জার অবসান, ভক্তের সহিত ভগবানের মুখোমুখী সাক্ষাৎকার। নিকুঞ্জ যে যুগপুরুষের চিহ্নিত লীলাপার্ষদ! সে তো অপরিচিত হতে পারে না! উভয়ের

সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের। সুতরাং, ঘনিষ্ঠতা-বৃদ্ধিতে বিলম্ব ঘটবে কেন? নিকুঞ্জ প্রায়ই যাতায়াত করে বাজিতপুরে ব্রহ্মচারীর সাধন-কুটীরে। কখনো একাকী, কখনো কুমুদ, সুরেশ, বাণীকান্ত প্রভৃতি অন্যান্য সাধননিষ্ঠ ভক্ত যুবাদের সঙ্গে। কখনো দিনে, কখনো সৌরতাপদগ্ধ নিদারুণ নিদাঘে, কখনো সর্ব্বতঃপ্লাবী বিপুল ভরাবর্ষায়। কখনো প্রকাশ্যে, কখনো বা অভিভাবকগণের অগোচরে। তরুণ নিকুঞ্জ শুদ্ধ বিবেক ও বৈরাগ্যের বিমল জ্যোতিতে উজ্জীবিত। বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠক্রমের সহিত চলে সাধন-ভজনের দৈনন্দিন নিয়মিত নিষ্ঠা। ব্রহ্মচারীর উপদেশ গুণে তথা তদীয় পূত সঙ্গলাভে নিকুঞ্জ ক্রমেই নির্ব্বেদপ্রাপ্ত।

অভিভাবকেরা প্রমাদ গণেন। এ ছেলে তো ঘরে থাকবে না। দাও ওকে সংসারে বেঁধে। উদ্বাহবন্ধনের প্রস্তাব। তীব্র আপত্তি নিকুঞ্জের। তর্ক-বিতর্ক চলে অভিভাবকদের সঙ্গে বেশ কিছুকাল। মহাপুরুষের ইচ্ছা-শক্তিতে শক্তিমান তরুণ আজ অকুতোভয়। একাই সে সংগ্রামরত বহুর সঙ্গে। কিছুতেই ছেলেকে বাগে আনতে সমর্থ না হয়ে এবার অভিভাবকেরা ক্রমেই কঠোর। নির্দ্দোষ যুবার উপর চলে রকমফের শাসন ও আক্রমণ, তার উপর চাপ সৃষ্টির জন্য। এক ঘোর সন্ধ্যায় নিকুঞ্জকে হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় এক আন্ধা পুষ্করিণীর পারে। 'দেখি তুই কেমন সাধু' ব'লে তাকে একজন চুবিয়ে ধরেন ঐ পুষ্করিণীর কদর্য্য জলে, যা কচুরী পানায় ভর্ত্তি, অগণিত ভেক, মৎস্যভুক্ সর্প, মশক ও রক্তপায়ী জলৌকায় পূর্ণ। পুষ্করিণীর পাড়ে বালবৃদ্ধ ও স্ত্রীপুরুষেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে, আর তামাসা দেখছে। নিকুঞ্জ কিন্তু নির্ব্বিকার। সাধক মুদ্রিত নয়নে পরমারাধ্য ব্রহ্মচারীর স্মরণ, মনন ও ধ্যানে আত্মসমাহিত। কতক্ষণ এ ভাবে কাটে তা সে জানে না। অতঃপর একজন হাত ধরে টেনে তুলতে সম্বিৎ জাগে। আশ্চর্য্য! সাধক সম্পূর্ণ অক্ষত। অথচ ঐ জলে ক্ষণকাল

হাত ডুবালেও রক্ষা নেই ; পানিজোঁকগুলি কিল্‌বিল্ ক'রে আক্রমণোদ্যত হয়।

বিজয়ী বীর নিকুঞ্জ। সংসারত্যাগের সমস্ত পথই এক্ষণে নির্ব্বাধ। ইং ১৯২২ সালে অন্যান্য কয়েকজন প্রথম সারির সঙ্ঘ-সাধকের সহিত তিনিও ব্রহ্মচর্য্যব্রত বরণপূর্ব্বক পূর্ব্বাশ্রমের সহিত সর্ব্বপ্রকার মায়িক সম্পর্কত্যাগী। ইং ১৯২৪ সালে হয় সন্ন্যাসদীক্ষা। আত্মনিষ্ঠ তরুণ তাপসের নাম হয় স্বামী আত্মানন্দ। সাধু-জীবনের প্রথম পর্য্যায়ে তিনি খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত মানুষের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সফল সেবাব্রত উদ্‌যাপনকারী। মাদারীপুর আশ্রমে অবস্থান কালে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে প্রাণসংশয় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। সেও তাঁর জীবনে এক মহাপরীক্ষা। শ্রীগুরুকরুণায় এ যাত্রাও তিনি রক্ষা পান। তাঁর যে অনেক কাজ! সঙ্ঘাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত যুগমহাযজ্ঞে তিনি যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরোধা।

সাধনজীবনে সফল এই মহাত্মা সঙ্ঘের লোক-কল্যাণকর্ম্মেও আপন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। কয়েক বৎসর সঙ্ঘের নওগাঁ (রাজসাহী) সেবাশ্রমের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর এক চারণদলের দক্ষ নায়করূপে তিনি বঙ্গ ও আসামের বহু নগরে ও জনপদে পরিব্রাজন করেন। সঙ্ঘের ভাবাদর্শ প্রচারে তাঁর অনলস প্রয়াস বিশেষ স্মরণীয়। স্বামীজীর বক্তৃত্বশক্তি ছিল অতি সুন্দর। ভাষার বৈভবে এবং বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার নৈপুণ্যে তা ছিল রসোত্তীর্ণ। ইষ্ট শ্রীগুরুর মহিমা বর্ণনপ্রসঙ্গে অন্তরের অনুভব যখন প্রগাঢ়, তখন ভিতরের উৎসারিত আবেগ তিনি আর ধরে রাখতে পারতেন না। কণ্ঠ রুদ্ধ, চক্ষুঃ অশ্রু-বিগলিত হতো। মানুষও হতো মহাভাবে অভিভূত, অনুপ্রাণিত।

শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের আদেশক্রমে চারণদল থেকে অবসর নেন, চলে আসেন সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়ে। সেটা সম্ভবতঃ বাং ১৩৪২ সাল। এই সালেই সঙ্ঘের মাসিক পত্রিকা 'প্রণব' ত্রৈমাসিক থেকে



সঙ্ঘের পঞ্চম প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দজী মহারাজ

মাসিকে রূপান্তরিত হয়। স্বামী আত্মানন্দজী বৃত হন পত্রিকা প্রকাশ ও কার্য্যাধ্যক্ষরূপে। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়ের সাধারণ করণিক দপ্তরটির ভারও তাঁকেই গ্রহণ করতে হয় এবং সঙ্ঘপ্রবর্ত্তিত হিন্দু মিলন মন্দির ও রক্ষিদল আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ের দায়িত্ব তাঁরই উপর এসে বর্ত্তায়। শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের প্রত্যক্ষ আদেশ ও নির্দ্দেশক্রমে এই সমস্ত কার্য্যই তিনি নিখুঁত ভাবে উদ্‌যাপন করেছেন। চলতি কাজ-গুলির আশু সমাধানে অনেক সময় গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বিনিদ্র ভাবে তাঁকে কর্ম্মরত থাকতে হতো।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ আইনতঃ রেজেষ্ট্রি হয়। তৎকালে তিনি সঙ্ঘের অন্যতম সহ-সম্পাদক। ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘের যুগ্মসম্পাদক পদে বৃত হন। অতঃপর ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রধান সম্পাদক পদে উন্নয়ন। জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। আকৈশোর শ্রীশ্রীসঙ্ঘাচার্য্যের প্রত্যক্ষ শিক্ষা, উপদেশ, সাহচর্য্য উপজীব্য করে এবং তাঁরই অমোঘ শক্তি, আশীর্ব্বাদ, কৃপা ও মহাভাবের দিব্য আনুকূল্যগুণে শ্রীগুরুশরণৈক এই বরেণ্য সাধক আমাদের জন্য রেখে গেছেন এক নিষ্কলঙ্ক মহৎ জীবনের অনবদ্য দৃষ্টান্ত। অপূর্ব ত্যাগ ও তপস্যার মূর্ত্তবিগ্রহ এই মহাপুরুষ আত্মনিষ্ঠার অস্খলিত বীর্য্যে সত্যই এক মহাশক্তিধর পুরুষ। আচার্য্যোত্তর কালে তিনি অগণিত ধর্ম্মার্থী নরনারীর দীক্ষাদাতা গুরু ও উপদেষ্টা।

পূজ্য স্বামীজীর বিষয় লিখতে গিয়ে সর্ব্বোপরি যা স্মরণে জাগে তা হলো সঙ্ঘের সাহিত্যভাণ্ডারে তাঁর অপরিমেয় দানের কথা। এক্ষেত্রে তিনি যে সম্পৎ দিয়ে গেছেন তা তুলনাহীন। কবি বা প্রাবন্ধিক হতে তিনি চান নি, দার্শনিকতার জন্যও লেখনী ধরেন নি। তিনি চেয়েছেন খাঁটি জীবন, আর সেই লক্ষ্যেই নিয়ন্ত্রিত করেছেন আপন চিন্তা, ভাবনা ও প্রচেষ্টাকে। স্বামীজীর সাহিত্যকৃতিতে তারই পরিচয় ছত্রে ছত্রে। 'জীবন সাধনার পথে,'

'সাধনবাণী', 'রত্নকণিকা,' 'অন্তর্বাণী', 'পাথেয়' প্রভৃতি রচনায় তিনি মানুষকে নীতিনিষ্ঠ জীবনের অমৃত-সন্দেশ প্রাণ খুলে বিতরণ ক'রে গেছেন। প্রথিতযশাঃ সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামীজীর এই শ্রেণীর রচনায় ভাবের গভীর আন্তরিকতা ও প্রকাশভঙ্গীর উদাত্ত ওজস্বিতা লক্ষ্য করেছেন। 'জীবনসাধনার পথে' গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে যেয়ে তিনি বলেছেন—"যে সমস্ত গুণের বিকাশ না হইলে প্রকৃত মনুষ্যত্বের স্ফূরণ অসম্ভব, গ্রন্থকার সেই সমস্ত গুণের অনুশীলন সম্বন্ধে অতি সরল ও আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষায় আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন।"

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে পূজ্য স্বামীজী তদীয় আরাধ্য দেবতার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে প্রথম আসেন, তা পূর্ব্বে আলোচিত। স্বামীজীর জীবনেতিহাসে ঐ দিনটি সদাস্মরণীয় মহাপুণ্য ক্ষণ। এ কথা তিনি নিজেই লিখেছেন। এই সাক্ষাৎকার ঘটে বাজিতপুরের সাধনকুটীরে। ভাগবত পুরুষের সান্নিধ্যে যে মহৎ উপদেশ সেদিন লাভ হয়, গৃহে ফিরে এসে তা আপন দিনলিপিতে লিখে রাখেন। আচার্য্য-প্রসঙ্গ দিয়েই আরম্ভ হয় লেখনী ধারণ। মহাযোগীশ্বর মহাপুরুষের অলৌকিক অন্তঃপ্রেরণাই আত্মোন্নতিকামী যুবাকে এই পুণ্যকর্ম্মে ব্রতী করে। এ প্রকারে ১৯১৭ থেকে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমস্ত সাক্ষাৎকারের বিবরণ সযত্নে লিখিত ভাবে সংরক্ষিত হয়। এই দিনলিপি সঙ্ঘের সেই আদিতন দিনগুলির একখানি প্রামাণিক দলিল। বাং ১৩৪০ সালে 'প্রণব' পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর উক্ত দিনলিপি সাধারণ্যে প্রকাশে উদ্যোগী হন। পারিপার্শ্বিকের সুন্দর সুললিত হৃদয়গ্রাহী বর্ণনার বৈচিত্র্যবৈপুল্যে শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের মহিমদৃপ্ত ভাগবত জীবনের কথা এবং তদীয় লোককল্যাণকর উপদেশ ও অনুশাসনাবলী প্রণবের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক ভাবে বর্ণাঢ্য হয়ে উঠে। স্বয়ং আচার্য্যদেব এই রচনা অনুমোদন করেন। ভক্তজন

পরিতৃপ্ত। সাহিত্যাচার্য্য ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের ন্যায় মনীষীও এই রচনার প্রশংসাকারী। উল্লেখ্য যে, ডঃ সেন স্বামীজীকে শ্রদ্ধা-মিশ্র স্নেহদৃষ্টিতে দেখতেন। তদীয় খর্ব্বকায় ক্ষীণ তনু দর্শনে পরিহাসছলে তাঁকে বলতেন—স্বামী খড়িকানন্দ। কিন্তু এই ক্ষীণকায় তাপসের ভিতরে যে ব্রহ্মচর্য্য দৃপ্ত প্রতিভাজ্যোতিঃ বিদ্যমান তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। আচার্য্যোত্তরকালে প্রণবের পৃষ্ঠার উক্ত রচনাবলী সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয় স্বামীজীর প্রথম স্মরণীয় গ্রন্থ "শ্রীশ্রীযুগ্যাচার্য্য-সঙ্গ ও উপদেশামৃত।"

পর্য্যালোচনায় দেখা যাবে, স্বামীজীর উপযুক্ত গ্রন্থ কেবল সঙ্ঘের তাৎকালিক বাহ্য ঘটনাপঞ্জীর দলিলই নয়, এই গ্রন্থ মূলতঃ সঙ্ঘের অধ্যাত্ম সাধনার এক মূল্যবান আদি ইতিহাস। যুগাচার্য্য তদীয় ভবিষ্য অভীষ্ট সঙ্ঘরচনায় কি ভাবে স্বীয় উত্তর সাধকগণকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক আপন ভাগবত ব্যক্তিত্বের অতি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এনে তাদিগকে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রদীপ্ত আলোকে গড়ে তুলছিলেন,, 'শ্রীশ্রীযুগাচার্য্যসঙ্গ ও উপদেশামৃত' গ্রন্থে তারই বিবরণ বিধৃত। গ্রন্থোক্ত উপদেশাবলী সত্যই অমৃতসমান। আচার্য্যদেব ত্যাগী ও ভোগীর জীবনের পার্থক্য বুঝিয়ে দেন। বলেন—সাধন-জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সমগ্র ভারতকে ভোগপ্রবণতার পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধারের জন্য চরম আত্মত্যাগে প্রস্তুত হতে হবে। ধ্যানের শক্তি ও মহিমা ব্যাখ্যা পূর্ব্বক তিনি নিরন্তর ভগবচ্চিন্তায় উৎসাহ-দাতা। দৃষ্টিসংযম, আলস্য জয় ও শীতজয়ের কৌশল, কুচিন্তার ভয়াবহতা, ধ্যান-জপের সঙ্গে আসন অভ্যাসের প্রকরণ, ইচ্ছাশক্তিবৃদ্ধি ও মনকে স্ববশে আনার উপায়, ইষ্টচিন্তা, মৃত্যুচিন্তা, ভগবন্নামের শক্তি ও মাহাত্ম্য, সাধন ও যোগাঙ্গের এই সকল বিষয় অতি সহজ প্রণালীতে শিখিয়ে দিয়ে তিনি তরুণ সাধকগণকে অধ্যাত্ম সাধনে উদ্বুদ্ধ করেন। আত্মোন্নতিকামী সাধকের আত্মরক্ষার সুদৃঢ় বর্ম্ম—সর্ব্বদা স্বাতন্ত্রিকতাবোধ। সাধারণ বিষয়ী মানুষের চেয়ে আমি স্বতন্ত্র—এই বোধই তাকে অবাঞ্ছিত সঙ্গ ও পরিবেশ থেকে

দূরে রেখে নানা সম্ভাব্য আবিলতা হতে রক্ষা করে। আচার্য্যদেব তদীয় ভবিষ্য সঙ্ঘের বীর সৈনিকদের সমক্ষে সাধনজীবনে অপরিহার্য্য সংগ্রামশীলতার কথা বলেন। আবার জীবন সংগ্রামে বিজয়লাভার্থ চাই উদ্যম, উৎসাহ ও অধ্যবসায়, চাই—আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্য্যাদাবোধ, তাও বুঝিয়ে দেন। ব্যায়ামানুশীলন, আহার-সংযম, বিলাসিতা ত্যাগ, সময়ের সদ্ব্যবহার, সৎগ্রন্থ অধ্যয়ন, অপরের উচ্ছিষ্ট গ্রহণের দোষ, এক শয্যায় শয়নের নৈতিক অপকারিতা—এমন কত শত সদুপদেশের সমাবেশই না দেখি আলোচ্য গ্রন্থাভ্যন্তরে। বিদ্যার্থী যুবাদিগকে মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনার কথা বলেন, যাতে পরীক্ষার ফল ভাল হয়; আবার সৎ ভাবাপন্ন ছেলেদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে ভাল কাজ করার নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গতঃ মানবসেবায় চরিত্রগত লাভ কিরূপ হয় তাও বিশ্লেষণ করে বুঝান। এই সকল উপদেশ, আদেশ ও নির্দ্দেশ শুশ্রূষু ভক্ত তরুণদের অন্তরের অন্তঃস্থলে গভীর ভাবে রেখাঙ্কিত হতো এবং তারা দৃঢ়তার সঙ্গে তা প্রতিপালনে তৎপর ছিল। ঠিক এমনি পরিবেশেই শ্রীমৎ আত্মানন্দজীর অধ্যাত্ম জীবনের প্রথম বনিয়াদ গড়ে উঠে। তাই তাঁর জীবন এত সুন্দর, এত সমুজ্জ্বল। যে অমৃত পানে তিনি স্বয়ং অমর, সেই অমৃত বিশ্বজনের হিতে পরিবেশনের ঔদার্য্যেই 'শ্রীশ্রীযুগাচার্য্যসঙ্গ ও উপদেশামৃত' গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ। সমগ্র জীবনে স্বামীজী যদি আর কোন কাজ নাও করতেন, তবে এই একখানি গ্রন্থের দ্বারাই তিনি সঙ্ঘে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

অন্যতর একটি মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বামীজী সঙ্ঘ-সন্তানগণকে চিরঋণপাশে আবদ্ধ করেছেন। "শ্রীশ্রীসঙ্ঘগীতা" নামে যে গ্রন্থখানি আজ জীবনবেদরূপে সমাদৃত ও পরিসেবিত, তার মূলে আছে শ্রীমৎ আত্মানন্দজীর শ্রম, নিষ্ঠা ও প্রযত্ন। ইং ১৯১৭ থেকে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরমারাধ্য সঙ্ঘগুরু তদীয় সাধক সন্তানগণকে অধ্যাত্ম জীবনের নানা সমস্যার সমাধান দিয়ে এবং আত্মোন্নতির নির্দ্দেশ ক'রে যে সকল উপদেশপত্র

লিখেছেন, সে সকল পত্রের সঙ্কলন আলোচ্য সঙ্ঘগীতা-গ্রন্থ। মাদারীপুর সেবাশ্রমে তিনি কিছুকাল আচার্য্যের সঙ্গে একই গৃহে অবস্থানকারী। সেই সূত্রে আচার্য্যদেবের ঘনিষ্ঠ সেবকরূপে অনেক ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন ঐ সকল পত্রের অনুলেখক। আপন অন্তঃপ্রেরণা বলেই স্বামীজীর উপলব্ধি—এই পত্রাবলী অতি মূল্যবান্ সম্পৎ, হারিয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না এবং তা হবে এক অবর্ণনীয় ক্ষতি। সুতরাং, প্রতিটি পত্রের অনুলিপি তিনি পাকা বাঁধানো খাতায় সযত্নে সংরক্ষিত করেন। তিনি যদি এ কাজটি না করতেন তবে আমরা গুরুতর ভাবে বঞ্চিত হতাম। সঙ্ঘের অধ্যাত্ম সাধনায় এই সঙ্ঘগীতাখানি এক নববেদ।

“শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ-স্মৃতিচয়ন”—স্বামীজীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থের বিশেষ অংশ জুড়ে বর্ত্তমান রয়েছে শ্রীশ্রীআচার্য্য-দেবের ব্যাবহারিক জীবনকথার অনেক বিবরণ। নিবন্ধগুলি ক্ষুদ্রায়তন, কিন্তু পরিচ্ছন্ন। শ্রীশ্রীআচার্য্যের দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট ব্যবহারের ভিতরেও কি মহতী শিক্ষার সঙ্কেত সেই রহস্য উপলব্ধিবান্ লেখকের অনুভবে ধরা দিয়েছে। রচনাগুলি সার্থক। এই গ্রন্থেরই শেষার্দ্ধে স্থান পেয়েছে স্বামীজীর মৌলিক ভাবনাপ্রসূত নীতিকথামালা—‘অন্তর্বাণী’ ‘রত্নকণিকা’ শিরোনামায়।

হিন্দু-সমাজ-সমন্বয় আন্দোলন প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীসঙ্ঘাচার্য্য যে সকল উপযোগী কথা বলেছেন, প্রয়োজনীয় চিঠি পত্রাদি দ্বারা কর্ম্মিগণকে নির্দ্দেশ দিয়েছেন এবং স্বয়ং ছোট ছোট নিবন্ধের অবতারণাপূর্বক তার ভিতর দিয়ে আপন চিন্তা, ভাবনা ও কর্ম্মপরিকল্পনার স্বচ্ছ রূপটি তুলে ধরেছেন, সে সমস্ত উপকরণ একত্রিত করে এবং উপযুক্ত মন্তব্য ও পাদটীকা লিখে স্বামীজী “হিন্দু-সমাজ-সমন্বয়” নামে আর একখানি গ্রন্থের প্রকাশক ও সম্পাদক। শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব সম্পর্কিত অতি খুঁটিনাটি বিষয়-গুলিকেও তিনি উপেক্ষা করেন নি। যেখানে যা পেয়েছেন, ছাপার অক্ষরে সংরক্ষিত করে গেছেন। সঙ্ঘ ও সঙ্ঘনেতার উপর ভবিষ্য

গবেষণাব্রতীদের পক্ষে এই সকল গ্রন্হ হবে প্রামাণিক তথ্যের নির্ভুল প্রাচুর্য্যের আকর।

"মনীষীদের দৃষ্টিতে আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ" গ্রন্হখানি স্বামীজীর আর এক স্মরণীয় কীর্ত্তি। তিনি যে কিরূপ সফল সম্পাদক এই গ্রন্হ তার দৃষ্টান্ত। সঙ্ঘাচার্য্যের মহাপরিনির্বাণের পর দেশের বিশিষ্ট অধ্যাপক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, দার্শনিক, দেশনেতা, ঐতিহাসিক, কবি, আইনবিৎ, বিপ্লবী নেতা, রাজনৈতিক নেতা, সমাজসেবী প্রভৃতিরা তাঁদের বিদগ্ধ লেখনীতে আচার্য্যদেবের মহাজীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর বুদ্ধিদীপ্ত আলোকপাত-পূর্বক রচনা পরিবেশন করেন। উক্ত রচনাবলী সম্পাদিত হয়েই প্রাগুক্ত গ্রন্হের আত্মপ্রকাশ। প্রচুর শ্রম নিয়োগ করেছেন স্বামীজী এই কার্য্যে।

সুলেখক, সুবক্তা, সুপ্রশাসক স্বামীজী মানুষের কল্যাণে আজীবন মানুষের পাশে। সেই ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তাঁকে যেমন আমরা খুলনা সাতক্ষীরার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সেবায় আত্ম-নিয়োজিত দেখেছি, তেমনি উত্তরকালে দেখেছি তিনি ঝাড়গ্রাম মহকুমার উপজাতীয় ও শবরপল্লীতে অনুন্নত, অবজ্ঞাত, অশিক্ষিত, দারিদ্র্যগ্রস্ত মানুষের বন্ধুরূপে অশেষ দরদ ও ভালবাসার আন্তরিক উপচার নিয়ে অনলসভাবে কর্ম্মব্রতী। ঝাড়গ্রাম মহকুমার পুকুরিয়া পল্লীতে সঙ্ঘপরিচালিত উপজাতীয় কল্যাণ কেন্দ্রটির প্রসিদ্ধি আছে। প্রাক্-অপরাধপ্রবণ শবরদের জন্য বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে দেওয়া হয়েছে, চাষের জন্য দেওয়া হয়েছে জমি, পাঠশালা ও উচ্চ বিদ্যালয় গড়া হয়েছে, ছাত্রাবাস পরিচালন করা হচ্ছে, সেবা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কাজ নানা উপায়ে চলছে। এই উন্নয়নকল্পের পরিধির ভিতরে সাঁওতালরাও সংযুক্ত। এ সকল কল্যাণযজ্ঞের পুরোধা ছিলেন শ্রীমৎ আত্মানন্দজী। এই সকল মানুষের অকুণ্ঠ সেবায় তিনি আপনার তনুমনপ্রাণ অকাতরে উৎসর্গ করেছিলেন। যতদিন সুস্হ শরীরে ছিলেন, ততদিন এই সেবাব্রতে নিখুঁত অংশ

গ্রহণ করেছেন। দিনের পর দিন অবস্থান করেছেন এই সকল মানুষের ভিতরে। সমাজের মূলপ্রবাহের সঙ্গে এই সমস্ত মানুষকে যুক্ত করে নিতে স্বামীজীর প্রযত্ন ও আত্মত্যাগের তুলনা নেই। কর্ম্ম-সাধনার ভিতরেও ছিল কর্ম্মযোগী মহাত্মার সুগভীর আত্মনিষ্ঠা। তাই তদনুষ্ঠিত প্রতিটি কর্ম্মই অনবদ্য। স্বামীজীর এই চরিত্রমহিমা আমাদিগকে নিত্য অনুপ্রাণিত করুক!

স্বামী হরিহরানন্দজী

লোকোত্তর পুরুষ সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের পূত ভাগবত সান্নিধ্য লাভপূর্ব্বক যে সকল ভাগ্যবান্ শুদ্ধসত্ত্ব সর্ব্ব-ত্যাগী চিহ্নিত সন্তানেরা আধ্যাত্মিক সাধনার সহিত মানুষের কল্যাণব্রতে নিয়োজিত থেকে সন্ন্যাস-ধর্ম্মের নূতন আদর্শের প্রদর্শয়িতা, তাঁদেরই আর একজন গত ২৭শে মে, ১৯৮৭, বাং ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪, বুধবার সন্ধ্যায় পুণ্যভূমি গয়াধামে ইষ্টচরণে বিলীন হলেন। ইনি শ্রদ্ধেয় স্বামী হরিহরানন্দজী। দ্বিতীয় দলে যাঁরা সঙ্ঘের সন্ন্যাসভুক্ত, ইনি তন্মধ্যে অন্যতম। মৃত্যু-কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯। বার্দ্ধক্যজনিত শারীরিক ব্যাপারে তিনি অনেক দিন ভুগছিলেন।

শ্রীধাম বাজিতপুরে দাস, দত্ত, ঘোষ, নাগ, চৌধুরী, বসু, নিয়োগী, সরকার, গুহ, মিত্র, উজীর পদবিধারী বেশ কিছু কায়স্থ পরিবারের বাস। এরূপ এক বিশেষ পরিবারেই স্বামীজীর শুভ জন্ম। পূর্ব্বাশ্রমের নাম বাণীকান্ত; পিতার নাম শ্রীনাথ দাস। একই পল্লীর এবং পাশাপাশি পাড়ার অধিবাসী রূপে বাণীকান্তের সুযোগ হয়েছিল বাল্যাবধি শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের সঙ্গ লাভ করার। বাজিতপুর রাজকুমার-এড্ওয়ার্ড উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে বাণীকান্তের অন্তরে বৈরাগ্যের প্রভা জ্বলে উঠে। এই স্বভাবসরল

মানুষটি সংসারের কিছুই বুঝতেন না। ও-সব তাঁর জন্য নয়। যুগপুরুষের অধ্যাত্ম প্রভাব তাঁকে পরম নির্বেদের অভিমুখে টেনে নিয়ে যায়। ইং ১৯২১ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে একদা তিনি গৃহনিষ্ক্রান্ত। কোথায় গেল নিরীহ ছেলেটা? পিতা-মাতা ব্যাকুল হয়ে উঠেন। কিন্তু তাঁদের বুঝতে অসুবিধা হয় না বাণীকান্ত ব্রহ্মচারী বিনোদের (স্বামী প্রণবানন্দ) পিছুই ধরেছে। তাকে খুঁজে পাওয়া যায় আশাশুনিতে। ব্রহ্মচারীজীর নেতৃত্বে তখন দুর্ভিক্ষ সেবাকার্য্য চলছিল খুলনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে। আশাশুনি পল্লীতে ঐ সেবাকার্য্যের কেন্দ্রীয় শিবির।

বাণীকান্ত আর ঘরে ফিরে যায় নি। কয়েকটি বৎসর কাটিয়েছে দুর্গত মানুষদের পাশে—আশ্রমের অন্যান্য মুখ্য ত্যাগী কর্ম্মীদের সহযোগী রূপে। তথায় সাময়িক সাহায্য বণ্টন পরিসমাপ্তির পর দুর্ভিক্ষোত্তর গঠনমূলক কাজ চলছিল। বাঁশ ও বেতের শিল্প, গ্রামে গ্রামে পাঠশালা পরিচালন, তাঁতের কাজ, পল্লীর অনুন্নত ও অবজ্ঞাত মানুষদের ভিতরে ধর্ম্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি কর্ম্মের প্রসার এতদঞ্চলে বিশেষ সাড়া জাগিয়ে তোলে। পরিচালক বর্গের আজ্ঞাবহ এবং কষ্ট বরণে অপরাঙ্‌মুখ বাণীকান্ত প্রতিদিন পাঁচ ছয় মাইল পথ হেঁটে অনুন্নত পল্লীতে স্কুল করতে যেতেন এবং ঐ পথ হেঁটে আশ্রম-শিবিরে ফিরতেন। সকালে দুমুঠো খেয়ে আবার রাত্রে এসে খেতেন। এত পরিশ্রমেও কিন্তু তাঁকে কখনো কাতর হতে দেখা যায় নি। ইং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের পুণ্যা মাঘী পূর্ণিমায় হয় তাঁর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য-সংস্কার এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস।

ভারতীয় গুরুগৃহের আদর্শে মাদারীপুরে একটি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় চলছিল। স্বামী হরিহরানন্দজী ঐ আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে নিয়োজিত হন। সুন্দর এই আশ্রমটি। পাকা ঘাটবাঁধানো পুষ্করিণী, কাকচক্ষুঃ-স্বচ্ছ শীতল জল, আম্র-পনস-কদলীর সুবিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণী, পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বে নানা জাতীয় ফুলের

সমারোহ,—স্নিগ্ধ, শান্ত পরিবেশ। পীত বসন ও পীত উত্তরীয়-পরিহিত আশ্রম-বিদ্যার্থীরা এই সৌন্দর্য্যকে আরো সমুজ্জ্বল, আরো পবিত্র ক'রে তুলতো। রাত্রি চারটায় বিদ্যার্থীদের শয্যাত্যাগ। শৌচ কর্ম্মাদির পর পুষ্করিণীতে অবগাহন। স্নানান্তে আশ্রম-মন্দিরে বৈদিক অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন ও শ্রীশ্রীগুরু-পূজারতি। অতঃপর কিছুক্ষণ গীতাপাঠ। তদন্তে ব্যায়াম, বিশ্রাম ও প্রাতরাশ। এর পর বেলা দশটা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন। দশটার পর আশ্রমকর্ম্মাদি, মাধ্যাহ্নিক পূজারতি ও আহার। আহারান্তে চারটা পর্য্যন্ত পুনঃ পড়াশুনা। বৈকালে খেলাধূলা, সন্ধ্যায় আরতি, রাত্রে আবার পড়াশুনা। নৈশ আহারান্তে শয়ন ও নিদ্রা। স্বামী হরিহরানন্দজী এই দিনচর্য্যার ভিতর দিয়ে বিদ্যার্থীদের পরিচালন করতেন—তাঁর বুদ্ধি ও সামর্থ্যানুসারে যথাসম্ভব নিখুঁত ভাবে—শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের আদেশ ও নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য ক'রে। শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব কখনো কখনো স্বয়ং শুভাগমন করতেন বিদ্যার্থী-দিগকে স্নেহ, উপদেশ, আশীর্ব্বাদ ও সাহচর্য্য দ্বারা অভিসিক্ত করতে। শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব বাজিতপুর মঠে এসেছেন সংবাদ পেয়ে স্বামীজী নিজেই বিদ্যার্থীদের নিয়ে নয় দশ মাইল পদব্রজে কখনো কখনো তদীয় দর্শন মানসে মাদারীপুর থেকে বাজিতপুরে উপস্থিত হতেন। এই ভাবেই অনলস ভাবে তিনি কর্ম্মে ব্রতী ছিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হয়েছে, স্বামীজী ছিলেন আবাল্য সরলস্বভাব। আরো বলা যায়, তিনি ছিলেন বিষয়ানভিজ্ঞ এবং সদা আত্মভোলা। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় তিনি নূতন। এত বড় সহরের এত সব ব্যাপার তিনি বুঝে উঠতে যেন পারছেন না। ডাক বাক্সে আশ্রমের একখানি চিঠি পোষ্ট করতে গিয়ে ফিরে আসেন। বাক্সে ফুটো নেই। চিঠি ফেলবেন কোথা? আসলে 'ফায়ার বক্স'কেই তিনি ডাক বাক্স মনে ক'রে ভ্রমে পতিত। হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেনে বক্স কালেক্‌শন্ (বাক্সে ক'রে ভিক্ষা সংগ্রহ) করতে গিয়ে একদা বিপন্ন হন। ট্রেন ছেড়ে দেয়। নামতে পারেন না। ট্রেনটি ছিল

তারকেশ্বরের। অনেক ঘুরে ফিরে অনেক কষ্টে কয়েক দিন পর আশ্রমে ফিরলে সকলের উদ্বেগ দূরে হয়। সঙ্ঘের বহুবাজারস্থ ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া বাড়ীতে কোন শৌচাগার ছিল না। টিরিটি বাজারের পাবলিক্ পায়খানায় সঙ্ঘকর্ম্মী ও সঙ্ঘসন্ন্যাসীদের প্রয়োজন নির্ব্বাহ করতে হতো। একদা রাত্র ৩টায় পায়খানায় যেতে গেলে 'কোন্ হ্যায়' ব'লে পুলিশ দেয় তাড়া। পুলিশের শাসানি শুনে হতচকিত সরল মানুষটি দিলেন এক দৌড়। আর যায় কোথা! চোর সন্দেহে ধৃত হয়ে থানায় নীত হন। পরে আশ্রম থেকে লোক গিয়ে সকল পরিচয় দিয়ে নির্দ্দোষ মহাত্মাকে ছাড়িয়ে আনে।

সকল অবস্থার ভিতরেই এই সরলতা তাঁকে কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে খুবই প্রিয় করেছিল। মাদারীপুর আশ্রমে থাকাকালীন স্বামীজীকে কখনো কখনো ছোটখাটো বন্যা প্রভৃতিতে সেবাকার্য্যেও যেতে হতো, মাঝে মাঝে প্রচারে এবং অর্থসংগ্রহেও বেরুতেন। যেখানেই যেতেন, এই সরল মানুষটিকে পেয়ে সকলেই প্রীতিলাভ করতো এবং সমাদরে তাঁর সেবা-যত্নের ভার নিত।

তখন পাকিস্থানের শাসন। কণভিক্ষার উপর নির্ভর করে স্বামীজীকে আশ্রম চালাতে হতো। দু'-এক আনা সাহায্যও নিতেন। তা ছাড়া উপায় ছিল না। একবার বর্ষায় নৌকাযোগে গ্রামাঞ্চলে ভিক্ষায় বেরিয়ে অজাতশত্রু এই সাধু দস্যুর কবলে পড়েন। অতি কষ্টার্জ্জিত তাঁর ভিক্ষার কড়ি সমস্তই দস্যুরা কেড়ে নেয়—ধারালো তরবারি গলায় উঁচিয়ে। স্বামীজীর কাতর উক্তি—"তোমরা সবই নিয়ে যাচ্ছ, কিছু দিয়ে যাবে না? আমরা খাব কি?" স্বামীজীর কথাগুলি এতই সরলতা মাখা এবং প্রাণস্পর্শী ছিল যে দস্যুরা কয়েকটি টাকা স্বামীজীর হাতে প্রত্যর্পণ করে চলে যেতে থাকে। স্বামীজী আবার দস্যুদের ডাকেন—'শুন, শুন, আমার থলিটাও নিয়ে যাচ্ছ? থলিটা দাও, আর আশ্রমের জন্য কিছু চাঁদাও দিয়ে যাও।"

এবার দস্যুরা হেসেছিল কি না, জানি না। তবে স্বামীজীর সরলতায় মুগ্ধ হয়ে ছিল নিশ্চয়ই। দস্যুসুলভ কোন দুর্ব্যবহার বা কটূক্তি না করে তারা বিশ্বস্তের মত মিষ্টি কথায় বলে—"দেবো সাধুজী! কাল সকালে এখানে এসো।" স্বামীজী ভাবেন—ডাকাত হলেও মানুষগুলি মন্দ নয়। যখন কথা দিয়েছে, তখন অন্যথা করবে না। ডাকাতের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে পরদিন তিনি সকালে ঘটনাস্থলে আবার উপস্থিত। অত্যন্ত সোজা বুদ্ধির মানুষটি বুঝতেই পারেন নি, দস্যু কখনো ধরা দেয় না।

এই সরল এবং নিষ্পাপ জীবন নিয়েই তিনি পরিণত বয়সে শ্রীগুরুর-চরণে চির নির্ব্বাণ লাভ করলেন। তাঁর ভিতরে বহুমুখী প্রতিভা ও কৃতিত্বের ঔজ্জ্বল্য ছিল না বটে, কিন্তু তিনি রেখে গেলেন এমন এক সাধুজীবনের নিদর্শন যেখানে আত্মপর, সুখ-দুঃখ সব একাকার, যেখানে স্বল্পেই সন্তোষ, যেখানে সাংসারিক জটিলতা ও কুটিলতার লেশ মাত্রও ছিল না, যেখানে বিরাজ করতো একটি আত্মভোলা চিরশিশু।

গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়ে প্রয়াত স্বামীজীর স্মৃতিচারণ করেন সঙ্ঘের সহ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজ এবং সহ-সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী মহারাজ।

স্বামী পূর্ণানন্দজীর মহাজীবন

১১ই এপ্রিল, ১৯৮৬। অপরাহ্ন ৫-৪৫। গোধূলিলগ্ন। দিনান্তের ক্লান্ত রবি পশ্চিম গগনে বৈরাগ্যের গৈরিক রশ্মি বিকিরণ পূর্ব্বক অনন্তে অস্তমিত। এক অব্যক্ত পূরবী নাদ বিশ্বভুবনে পরিব্যাপ্ত। এমনি এক প্রাকৃতিক মুহূর্ত্তে সঙ্ঘের আর একটি ভাস্বর ভাস্কর দীর্ঘ ৬২ বৎসরের কর্ম্মময় ও সাধনময় সঙ্ঘজীবনে ইতি টেনে অনন্ত করুণাকান্ত ইষ্টের শ্রীচরণে পরিনির্ব্বাণ লাভ

করেন। আজীবন যিনি অখণ্ড বৈরাগ্যের পূজারী, তাঁর জীবনের অন্তিম সমাধানের এই মুহূর্ত্তটি বড় মহিমময়। নিঃসীম অম্বরের ঐ সান্ধ্য গৈরিক বিভূতি সাঙ্গীকরণ পূর্ব্বক জ্যোতি-মণ্ডিত হয়ে মর্ত্ত্যের ভোগবিরাগী যতি স্বীয় সাধনোচিত ধামে মহাপ্রস্থান করেন। ইনি সঙ্ঘের অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণানন্দজী মহারাজ।

স্বামীজীর মহাজীবন—সঙ্ঘের বৈচিত্র্যময় বহুমুখী সাফল্যের ইতিহাসে এক সমুজ্জ্বল অধ্যায়। যেমন অধ্যাত্ম সাধনে, তেমনি সঙ্ঘোদ্দিষ্ট মানবকল্যাণব্রতের বিবিধ ভূমিকায় এই মহাপুরুষ স্বীয় কীর্ত্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। শুধু ভারতে নয়, তাঁর কর্ম্মক্ষেত্রের পরিধি ছিল আরো বৃহত্তর আরো মহত্তর আরো কঠিনতর। সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় যান ভারতের বাইরে। নানা অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে সেখানে যে গঠনমূলক কর্ম্মযজ্ঞের সূচনা করেন একটি মাত্র জীবনের প্রচেষ্টায়, তার সাফল্য অভাবনীয়। পুনশ্চ বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদনের অন্তে যেন অন্তরাত্মার অলক্ষ্য ইঙ্গিতেই ফিরে আসেন স্বদেশের মাটিতে, মিলিত হন সঙ্ঘভ্রাতাদের সঙ্গে, আশীর্বাদ গ্রহণ করেন ৺মাঘী পূর্ণিমা ও ৺শিবরাত্রি মহোৎসবের। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রাক্কালে ঘুরে দেখে আসেন সঙ্ঘের গায়েনা, ত্রিনিদাদ ও কানাডা কেন্দ্রের কার্য্যাবলী এবং শেষ দর্শন দিয়ে আসেন তত্রত্য ভক্তমণ্ডলীকে, সঙ্কলিপত Prophet of a new Hindu age (By Prof. Ninian Smart) বইখানির রচনা ও প্রকাশের কাজও শেষ হয় তদীয় জীবদ্দশাতেই। সঙ্ঘের লণ্ডন আশ্রমের ভবিষ্য পরিচালনার বিধিব্যবস্থাও পাকা-পাকি করে আসেন। নিউ ইয়র্কে কাটান বারো দিন। প্রত্যহ বাড়ী বাড়ী ধর্ম্মীয় ভাষণ। দীক্ষাও দেন বহু প্রার্থীকে। কোন করণীয়ই অবশিষ্ট রাখেন নি। সকল কিছুর পূর্ণতার সমাবেশে পূর্ণানন্দের মাধুরী বুকে নিয়ে পরম প্রশান্তিতে তিনি চলে গেলেন শ্রীগুরুচরণে। ভারতের মাটিতেই শেষ শয়ন

রচনা করেন। স্বামীজীর জন্ম ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বৎসর।

"তাঁর স্মৃতি, তাঁর সঙ্ঘ" শীর্ষক নিবন্ধে (শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ—শতরূপে, শত মুখে—গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) স্বামীজী যা লিখে গেছেন তা থেকে জানা যায় তিনি ছিলেন উপসী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র হর্ষ মুখাজীর মুখে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘনেতা আচার্যদেবের প্রসঙ্গ প্রথম শ্রবণ করেন। তৎপরবর্ত্তী বৎসর ১৯২২ খৃষ্টাব্দে জাতীয় বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক শ্রীক্ষিতীশ চৌধুরী এবং পরবর্ত্তীকালে সঙ্ঘের শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দজীর নিকট আরো বিস্তৃত শুনে তিনি আচার্যদেবের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আচার্যদেবের সাক্ষাৎ দর্শন হয় —ভোজেশ্বরে। সঙ্ঘে যোগদান করেন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে। বহুবাজার ষ্ট্রীটের ভাড়াটিয়া বাটীতে তখন সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মহাদীক্ষা লাভ পূর্বক স্বামীজীর অধ্যাত্ম জীবন নিখুঁত নিষ্ঠায় অগ্রসর হয়। স্বামীজীর পূর্ব্বাশ্রমের নাম বঙ্কিম, পিতা—হর কুমার সেনগুপ্ত, পৈতৃক বাটী—ফরিদপুর জেলার নগর গ্রামে।

শুদ্ধ বৈরাগ্য ভাব নিয়েই স্বামীজীর আশ্রমধর্ম বরণ। বিধবা জননীর একমাত্র পুত্র সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সংসার তাঁকে আর ফিরিয়ে নিতে পারে নি। শ্রীশ্রীআচার্য্যোপদিষ্ট 'মৃত্যু চিন্তার' প্রভাবে সাধকের স্বচ্ছ উপলব্ধি—"জীবন অতি ক্ষণভঙ্গুর, পিতা-মাতা আত্মীয়-পরিজনের স্নেহবন্ধন দুদিনের, সংসার অনিত্য, আত্ম-তাত্ত্বোপলব্ধিই জীবনের মুখ্য লক্ষ্য, ঐ লক্ষ্য সাধনেই প্রযত্ন করতে হয়!" ৬. ৮. ৮৫ তারিখে লণ্ডন থেকে বর্ত্তমান লেখককে প্রেরিত এক পত্রে তিনি লিখেন—"শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত 'মৃত্যুচিন্তা' উপদেশের কি অতুলনীয় প্রভাব। পাঁচ ছয় মাস পূর্ব্বেও যে বিধবা গর্ভধারিণীকে 'মা, পায়খানায় যাই,' ব'লে পায়খানায় যেতাম, তাঁর একমাত্র মাতৃগতপ্রাণ পুত্র আমি, সেই

ক্রন্দনরতা, নিঃসম্বলা জননীকে 'মা, 'মাতামহের সাথে গয়াতে দেখা হয়েছে' এই এক লাইন লিখতেও অস্বীকার করি। মাতামহ হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকেন, আর একখানা দা আমার হাতে দিয়ে তাঁর মাথায় কোপ দিতে বলেন। প্রতিপালক মাতামহের প্রতি আপাত নিষ্ঠুর ব্যবহার বটে। কিন্তু অবিচলিত থাকি। অঙ্গীকার করেছি যে, আর ফিরে যাবো না।"

হাঁ, তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ পুরুষোত্তম প্রণবানন্দের কাছে, যাঁকে বরণ করেছেন পরমারাধ্যরূপে। সঙ্ঘভুক্তির প্রার্থনা জানালে আচার্য্যদেব বলেছিলেন—"যদি আশ্রমে থাকা ঠিক কর, তবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে ·····বাড়ীর সাথে কোন সম্বন্ধ রাখতে পারবে না, একখানা চিঠির দ্বারাও নয়, এক চক্ষু অন্ধ হয়ে গেলেও নয়, এক অঙ্গ Paralysis হয়ে গেলেও নয়।" প্রতিজ্ঞা খুবই কঠিন। কেবল নিজ শক্তিতে তা রক্ষা করা সম্ভব কি ? স্বামীজীর উক্তি—এ বিজয় গুরুশক্তিরই। তা না হলে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কি সহজ ছিল ?

সঙ্ঘজীবনের সূচনা থেকেই তিনি সংগ্রামী পুরুষ। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে আশ্রমজীবনে এসে প্রথমে কলকাতায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী পরিচালিত চারণদলে যোগদান। ঠিক ঐ সময়েই গয়াতীর্থ সংস্কারের জন্য সঙ্ঘের সুপরিকল্পিত প্রয়াস। পাণ্ডাদের জুলুম নিরাকরণ পূর্ব্বক নিরীহ তীর্থযাত্রীদের ধন, মান, প্রাণ রক্ষায় সঙ্ঘাচার্য্য সঙ্কল্পবদ্ধ। ভাড়াটিয়া বাটীতে হয় কর্ম্মকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা। পাণ্ডারা এই প্রথম তাদের শোষণকর্ম্মে সুসংবদ্ধ বাধা পেতে থাকে। সংঘর্ষ অনিবার্য্য। শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের আদেশে সেবক বঙ্কিম এই সংগ্রামের অন্যতম সৈনিক। পাণ্ডার লোকজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ, গয়া আশ্রমের জন্য জমি ক্রয়, পাণ্ডাদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত শর্ত্তে আপোষ—প্রতিটি কার্য্যেরই তিনি অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী। কাশী আশ্রমের জমি ক্রয়ের সময়েও শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব তাঁকে অন্যতম পার্ষদরূপে সঙ্গে

নিয়ে যান। বিহারে প্রথম চারণদলের নেতৃত্ব দেন শ্রীমৎ যোগানন্দজী। ভাল সহকর্ম্মীর প্রয়োজন। আচার্য্যদেব বলেন—"বঙ্কিম ভাল ছেলে, তাঁকে নিয়ে যাও তোমার সঙ্গে।" সন্ন্যাস গ্রহণের পর স্বামীজী চারণদলের সঙ্গে সারা ব্রহ্মদেশ ও সিঙ্গাপুর পরিভ্রমণ করেন। কিছু কাল তিনি চারণদলে নেতৃত্বও দেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে এই লেখকের সঙ্গে স্বামীজীর প্রথম সাক্ষাৎকার। তখন তিনি কেবল চারণদলের মুখ্য নেতাই নহেন, কৃতী বক্তাও।

সৎসাহসী, সুসংগঠক, সুবক্তা, চরিত্রবান্ এই সন্ন্যাসীর উপর ১৯৩৮ সালে নূতন গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়। সমগ্র বঙ্গদেশ তখন সাম্প্রদায়িকতার উলঙ্গ তান্ডবে বিধ্বস্ত। নিরীহ হিন্দুদের ধন, মান, প্রাণ বিপন্ন। নারী ধর্ষিতা, দেবমন্দির কলুষিত, বিগ্রহ চূর্ণিত। অথচ হিন্দুরা অসংগঠিত; সুতরাং, দুর্ব্বল এবং নিপীড়িত। সঙ্ঘাচার্য্য পল্লীতে পল্লীতে বিপন্ন মনুষদের সংগঠন চান। সর্বত্র হিন্দু মিলন-মন্দির ও রক্ষিদল গঠনের পরিকল্পনা। স্বামী পূর্ণানন্দজীকে আচার্য্যদেব চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ঢাকা প্রভৃতি কয়েকটি জেলার ভারার্পণ করেন। সে সংগ্রাম আরো কঠিন। জীবনপণে যে অকুতোভয়, সে-ই মাত্র এই কার্য্যের যোগ্য। স্বামীজী গুরূপদিষ্ট এই ব্রত সাহসের সহিতই উদ্‌যাপন করেন ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—যতদিন দেশখন্ডনের দুর্ভাগ্য জাতির শিরে আপতিত না হয়।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বন্যা ও বাত্যাবিধ্বস্ত ভোলার (বরিশাল) দুর্গত হিন্দু-মুসলমানের পাশে সেবা-ব্রতীরূপে দেখেছি স্বামী পূর্ণানন্দজীকে। আবার দেশবিভাগের পূর্ব পর্য্যন্ত তিনি একটানা কাজ করেন সর্ব্বাপেক্ষা সাম্প্রদায়িক উপদ্রুত অঞ্চল-গুলিতে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে লীগ শাসনের আমলে ঢাকা জেলার রায়পুরা, মেথিকান্দা, নরসিংদি প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। হিন্দুরা দলে দলে বাস্তুত্যাগী। নিঃসম্বল অবস্থায় হাজারে হাজারে মানুষ কুমিল্লা ও আগরতলায় আশ্রিত। আখাউরা

ষ্টেশন উদ্বাস্তু-পরিপ্লাবিত। সঙ্ঘ থেকে দ্রুত সেবাকার্য্যের ব্যবস্থা হয় এবং তৎসহ সংগঠন কার্য্যও চলতে থাকে। সেই অবস্থায় বাখরনগর গ্রামে সঙ্ঘের দুজন সংগঠনকর্মী প্রহৃত। পলায়িত হিন্দুদের গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনের মনোবল নেই। এদিকে ১৪৪ ধারার ফলে কোথাও প্রকাশ্য সভা-সমিতি বা জমায়েত হতে পারবে না। এই পরিস্থিতিতে স্বামী পূর্ণানন্দজী যে পরিকল্পনার উদ্ভাবন করেন, তা তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি, সংগঠনপ্রতিভা এবং দুঃসাহসিকতারই প্রকৃষ্ট পরিচয়। তিনি বাখরনগর গ্রামে আয়োজন করেন এক অভূতপূর্ব্ব মহাযজ্ঞের। ধর্ম্মীয় জমায়েতে বাধা নেই। এই উপায়েই তিনি লক্ষাধিক হিন্দুর সমাবেশ ঘটাতে চান। প্রায় ছোটখাটো এক পুষ্করিণীর সমান যজ্ঞকুণ্ড খনিত॥ গোটা একটি বেলগাছ ছেদনপূর্ব্বক শাখা-পত্র সমেত পুঁতে দেওয়া হয় যজ্ঞের মধ্যখানে। তিন চার টিন ঘৃত সংগৃহীত। এত ফল-মূলের উপচার আসতে থাকে যে তা স্তূপীকৃত হয়ে যেন পাহাড়ের সৃষ্টি হয়। ঐ ফল-স্তূপের এ পারে দাঁড়ালে ও-পারের মানুষ দেখা যায় না। সরকার আশঙ্কিত। ঢাকা সহর থেকে সশস্ত্র পুলিশ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত। কিন্তু এই মহাসম্মেলন ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ। গৃহত্যাগী মানুষগুলির মনোবল ফিরিয়ে আনতেই এই নির্দ্দোষ ধর্ম্মীয় সমাবেশের আয়োজন। নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়ে যায়। উদ্বাস্তুরা ধীরে ধীরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করতে থাকে। বাংলা ১৩৫২ সনের (ইং ১৯৪৬) অগ্রহায়ণে মালপদিয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত অনুরূপ আর এক মহাযজ্ঞে শত মণ সমিধ ও দশ লক্ষ বিল্বপত্র আহুতি দেওয়া হয়। তাতে সারা বিক্রমপুরের অন্যূন পঞ্চাশ সহস্র নরনারী ভেঙ্গে পড়ে। পাউলদিয়া ও মীরকাদিমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর ক্ষতিগ্রস্তদের ভিতরে সংগঠন ও নৈতিক বল সঞ্চারেই এ প্রয়াস। এই সময়ে নারায়ণগঞ্জে স্থায়ী শিবির স্থাপন পূর্ব্বক স্বামীজী নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ মহকুমার পল্লীসমূহে কার্য্যরত ছিলেন।



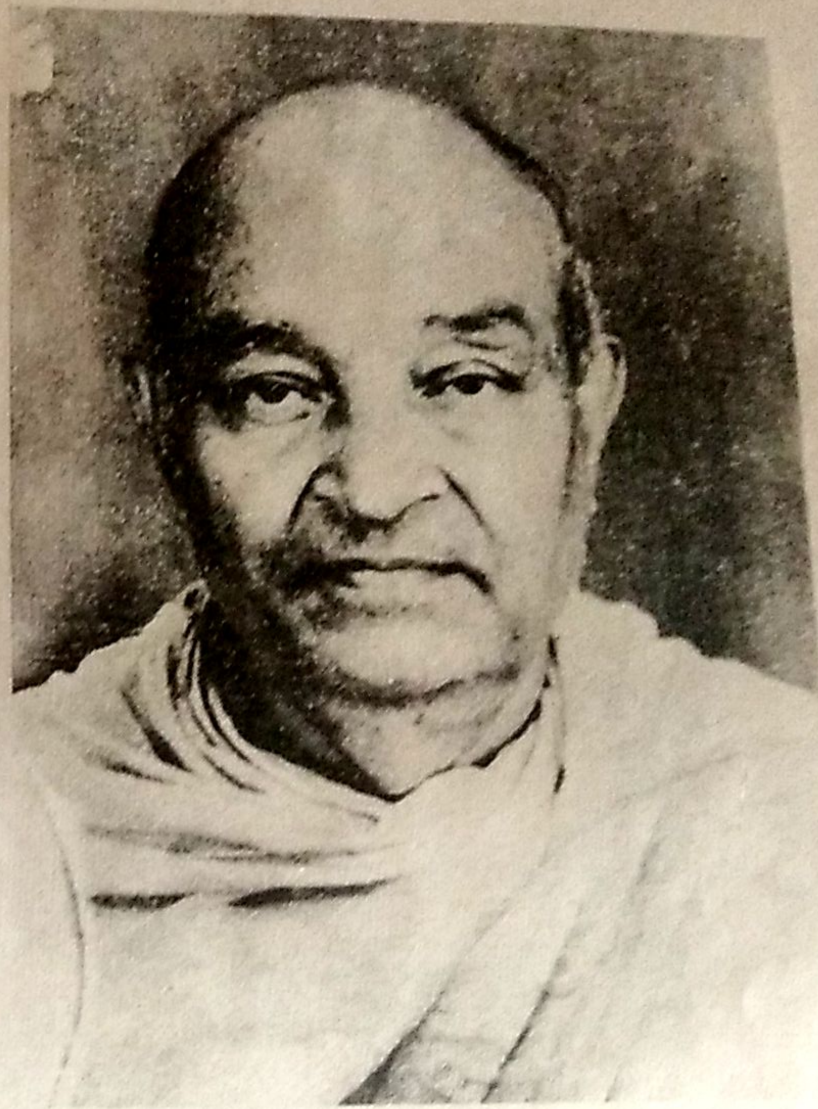
শ্রীমৎ স্বামী প্রকাশানন্দজী মহারাজ



শ্রীমৎ স্বামী সদানন্দজী মহারাজ



শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দজী মহারাজ



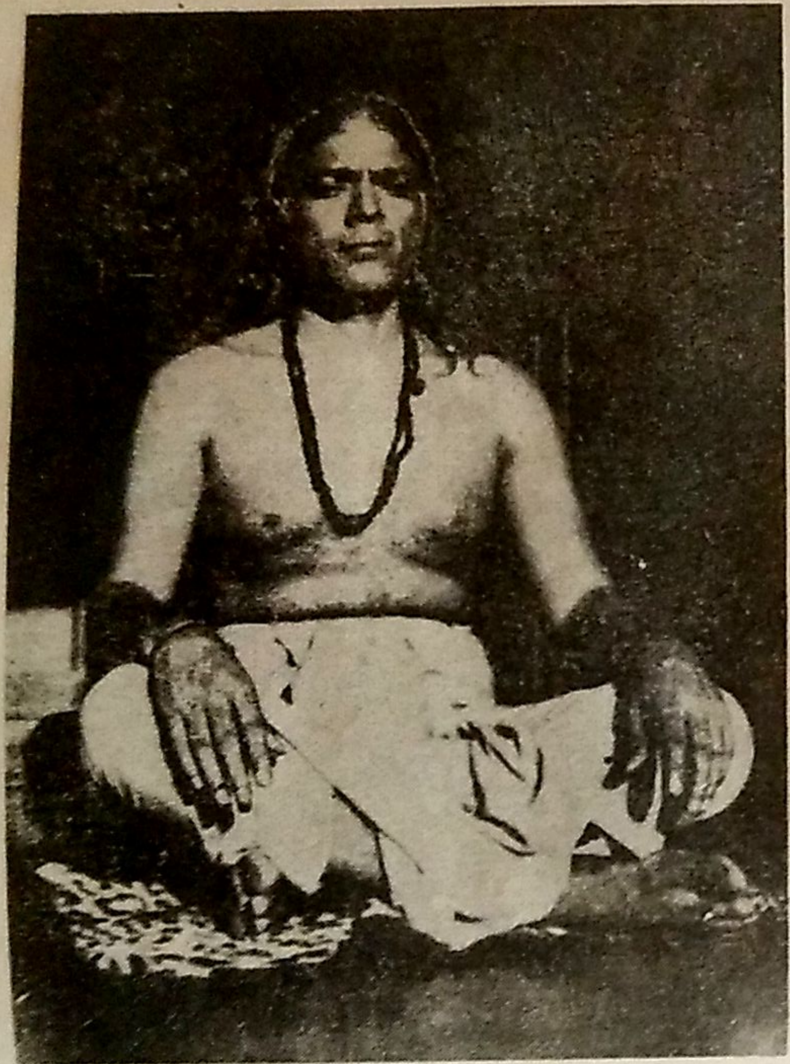
শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণানন্দজী মহারাজ



শ্রীমৎ স্বামী ত্রিলোচনানন্দজী মহারাজ



শ্রীমৎ স্বামী আত্মরূপানন্দজী মহারাজ



শ্রীমৎ স্বামী ধীরানন্দজী মহারাজ



শ্রীমৎ স্বামী নিখিলানন্দজী মহারাজ

সঙ্ঘের সৈনিকরূপে সাম্প্রদায়িকতা রুখতে যিনি এত কষ্ট বরণ করেন, দেশখণ্ডনে তিনি অত্যধিক মর্মাহত হবেন তা স্বাভাবিক। বেশ কিছুকাল অনুক্ষণ ধ্যান-জপ-তপস্যায় রত থেকে তিনি এ বেদনা ভুলতে চেষ্টিত। কিন্তু তাঁর জন্য ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়ে আছে—বিধাতার বিধানে। অন্তরের অব্যক্ত বেদনাকে সৃষ্টিরূপ দানের আর এক সুযোগ আসে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে।

স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর নেতৃত্বে সঙ্ঘের এক সাংস্কৃতিক মিশন যাবে ত্রিনিদাদ ও গায়েনায়। চার সদস্যবিশিষ্ট এই মিশনের সহকারী নেতা নির্বাচিত হন স্বামী পূর্ণানন্দজী। বৎসরাধিক পর মিশন ফিরে আসে ভারতে। কিন্তু তথাকার হিন্দুদের ভিতরে কাজ করার জন্য থেকে যান পূর্ণানন্দজী সেখানেই। এ যেন তাঁর অগস্ত্য যাত্রা। অতঃপর মাঝে মাঝে ভারতে এলেও দীর্ঘ ৩৬ বৎসর তিনি প্রবাসী। স্বামীজীর সঙ্ঘজীবনের এই অংশটি সাফল্যে সমুজ্জ্বল। গায়েনার পূর্ব্ব সমুদ্রোপকূলে কুড়ি বিঘা জমির উপর গড়ে উঠে আশ্রম, মন্দির, ছাত্রাবাস, প্রাথমিক বিদ্যালয়, হিন্দুকলেজ, কৃষিক্ষেত্র। আর এই আশ্রমকে কেন্দ্র করে সারা গায়েনায় সনাতন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রচার চলে। ত্রিনিদাদেও কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তত্তৎ দেশের ক্যারাবিয়ান্ হিন্দুরা যেন অকূলে কূল পায়। এই সকল হিন্দুদের পূর্ব পুরুষেরা কুলি-মজুররূপে গিয়েছিল সে দেশে ইংরাজ সরকারের চুক্তি অনুসারে। তাদের বংশধরেরা আজ তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বহুকাল স্বধর্ম, স্বসংস্কৃতি ও স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় ক্রমশই তারা ভাবান্তরিত ও রূপান্তরিত, অনেকে বা ধর্ম্মান্তরিত। সেই অবক্ষয় রুখে যায়। গায়েনা ও ত্রিনিদাদের পর লণ্ডন ও কানাডায় সঙ্ঘের স্থায়ী শাখা প্রতিষ্ঠিত। স্বামীজীর শেষ জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত লণ্ডনে। এখান থেকে প্রকাশিত Hinduism সাময়িক পত্রিকা খানি স্বামীজীর অন্যতম কীর্ত্তি।

গুরুগতপ্রাণ সাধক এক চিঠিতে লিখেন—"পূর্বাশ্রম থেকে পেয়েছি কেবল এই রক্ত মাংসের শরীরটা, আর যা কিছু সবই তো তাঁর দান।" এই প্রত্যয় স্বামীজীর আধ্যাত্মিক জীবনকে সুন্দর ও বলিষ্ঠ করে। এই প্রত্যয়ই তাঁকে বিজয়ী করে বিদেশেও সকল প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে। সম্পূর্ণ নিষ্কিঞ্চন অবস্থায় বিদেশে গিয়ে এত যে কাজ হলো তা কাঁর ইচ্ছায়? কাঁর শক্তিতে? নিজের অহং তিনি রাখেন নি। ভোগের দেশে গিয়ে ত্যাগের আদর্শকে বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। গয়া আশ্রমে থাকাকালীন শ্রীশ্রীআচার্যদেব স্বয়ং শ্রীহস্তে তাঁকে একখানি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ উপহার দেন। সেই গ্রন্থখানি তাঁর আজীবন সঙ্গী—নার্সিং হোমে পর্যন্ত। বৈরাগ্যশতক গ্রন্থখানিও তাঁর অত্যন্ত আদরের বস্তু। বৈরাগ্যবৃত্তি হচ্ছে সন্ন্যাসীর রক্ষাকবচ। নিজের জীবনে তিনি তা আচরণ করেছেন এবং অন্যকেও শিক্ষা দিয়েছেন।

স্বামীজীর ত্যাগ, বৈরাগ্য, কষ্টসহিষ্ণুতা, নীতি-শৃঙ্খলাবোধ, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি চরিত্রবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর লিখিত বিবরণের সারাংশ তুলে ধরছি।

স্বামী প্রেমানন্দজী লিখেছেন, একবার তিনি স্বামীজীকে নিয়ে যান বাকলসা হিন্দু মিলন-মন্দিরের উৎসবে। বর্ধমান জেলার অজয় নদের তীরে বাকলসা গ্রাম। কাটোয়া ষ্টেশনে গো-গাড়ী পাঠানো হয়েছে—স্বামীজীর জন্য। কিন্তু শূন্য গাড়ী ফিরে আসতে দেখে উদ্যোক্তৃগণ হতাশ হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পরেই দূরে দেখা যায়—স্বামীজী আসছেন পদব্রজে। নিকটে এসে পৌঁছালে কেন তিনি গাড়ীতে না এসে কষ্ট ক'রে হেঁটে এলেন, জিজ্ঞাসা করা হয়। উত্তরে বলেন—গরুগুলিকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ? নরম ধূলো মাটিতে হেঁটে এলাম, কোন কষ্ট হয়নি।

আত্মসুখের জন্য তিনি কোন ইতর প্রাণীকেও কষ্ট দিতে চান না।

নিজের ফটো তুলতে স্বামীজীর খুব বিরক্তি। স্বামী

অম্বরীষানন্দের কাছে বলেন—"এ একটা ব্যাগো।" সুরাট আশ্রমের সন্ন্যাসীদের বলেন—"কি জান? বিদেশে থাকি। সাধুসঙ্গ পাই না। তোমাদের সঙ্গ পেয়েছি। কি যে ভাল লাগে!" বিলেতে শরীরের ওজন হ্রাসের জন্য খাওয়া এত কমিয়ে ফেলেন যে একদিন রাস্তায় মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। যখন জ্ঞান ফিরে, তখন দেখেন তিনি আশ্রমে এবং ডাক্তার শিয়রে। অতিরিক্ত কঠোরতায় নিজের শরীরকে নিজেই নষ্ট করেছেন কি?

স্বামীজীর অন্তিম জীবনের শেষ কয়টি দিন ব্রহ্মচারী ঠাকুর-দাস তাঁর সেবারত ছিল। তার বিবরণে প্রকাশ, সাত টাকা দামের বেদানা তিনি দ্বিতীয়বার গ্রহণ করেন না—ডাক্তারের নির্দ্দেশ সত্ত্বেও। অত মূল্য দিয়ে কয়েক ফোঁটা বেদানা কি খাওয়া যায়? স্বামীজী বলেন—"ওতে উপকার না হয়ে অপকারই হবে। আমার বমি হয়ে যেতে পারে।"

ব্রহ্মচারীর বিস্ময়, যে মানুষটির পরমায়ুঃ আর মাত্র এক সপ্তাহও নয়, তিনি কি ক'রে ক্যালকাটা পে ক্লিনিক হোমের চার তলায় নিজেই হেঁটে উঠে গেলেন—অন্যের সাহায্য না নিয়ে ১১নং কেবিনে। এ ঘটনা ৫।৫।৮৬ তারিখের। ঐ তারিখেই তাঁকে নার্সিং হোমে চিকিৎসার্থ ভর্তি করা হয়। ৯ই এপ্রিল সারা রাতে ঘুম হয় নি। কখনো ধ্যানমগ্নতা, কখনো যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পড়ে কাটিয়েছেন মহাসাধক। ব্রহ্মচারী লিখেছে—

স্বামীজী ছিলেন কঠোর নীতিনিষ্ঠ। নার্সিং হোমে আমাদের যাতায়াতে কোন সময়ের বাধা নিষেধ ছিল না। কিন্তু হোমের নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে যখন তখন তাঁর কাছে কেউ যাতায়াত করুক, তা তাঁর পছন্দ নয়। সুবিধা পাওয়া গেছে বলেই কি তার অপব্যবহার করতে হবে? রাত্রি আটটায় হোমের সদর গেট বন্ধ হয়ে যায়। শুনেই আমাকে বলেন, "তাড়াতাড়ি চলে যাও।" এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াতে দেন না। আর বলে দেন—"আমার রাত্রের পথ্য নিয়ে যে আসবে সে যেন ফিরে যায়। দারোয়ানকে বলে যাও, তাকে যেন

সে ফিরিয়ে দেয়। এক বেলা না খেলে আমার কোন কষ্ট হবে না।''

আমি অত্যন্ত চিন্তিত! মরণাপন্ন রোগী অনাহারে থাকবেন! বললাম—''স্বামীজী! আমাদের যাতায়াতে কোন বাধা নেই। আপনি চিন্তা করবেন না।" স্বামীজীর দৃঢ়তর উত্তর—"আমি তোমার সমস্ত কথাই বুঝেছি। আমি না খেয়ে থাকতে রাজী, কিন্তু তুচ্ছ কারণে হাসপাতালের নিয়ম লঙ্ঘন করতে রাজী নই।" নীচে নেমেই দেখি, খাবার এসে গেছে। কিন্তু আমরা নিতান্ত ব্যথিত চিত্তে পথ্যবাহী ব্রহ্মচারীকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে আসি। দৃঢ়চেতা মহাপুরুষের কাছে ফিরে যেতে সাহস হয় না। জানি, তিনি এ পথ্য আজ গ্রহণ তো করবেনই না, অধিকন্তু নিষেধ অমান্য করার জন্য অত্যন্ত রুষ্ট হবেন।

নার্সিং হোমে নিয়মিত জপ, ধ্যান ও স্বাধ্যায়ে স্বামীজীর সময় অতিবাহিত হয়। আমি তাঁকে নিয়মিত ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাকথা পড়ে শুনাই। এ সময়ে "কণ্ঠে কণ্ঠে করুণা-কথা" এবং "শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ—শত রূপে, শত মুখে" বই দুখানি তাঁর নিত্য পাঠ্য ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের আসন পেতে দেওয়া হয়েছিল। নিত্য পূজা নিবেদন করতেন ঐ আসনে।

ব্রহ্মচারীর কাছে স্বামীজী বলেন—লণ্ডনে তার কত সাধারণ আহার্য্য ছিল। ভারতে আসার পূর্ব্বেও রুগ্ন শরীর নিয়ে কি কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন। কোন সপ্তাহে কেবল আলু সিদ্ধ, কোন সপ্তাহে কেবল পেপে সিদ্ধ, কোন সপ্তাহে কেবল ভাত, কোন সপ্তাহে কেবল রুটি, কখনো উপবাস চলেছে। ভারতে এসেও তাঁর এক তরকারী ভাতই যথেষ্ট। তার বেশী প্রস্তুত করলেও তিনি গ্রহণ করেন না। গুরু মহারাজ একদা স্বামীজীকে বলেছিলেন—"তোমাদের মত সাধুর এক তরকারী ভাতই যথেষ্ট। একাধিক তরকারী খাওয়া পাপ।'' সেই গুরুবাণী তিনি স্মরণে রেখেছেন জীবনের উপান্ত সময়েও।

একদিন স্বামীজী বলেন—'সব সময় সত্য কথা বলবে। আমি তোমাদের ক্ষমা করতে প্রস্তুত। কিন্তু, মিথ্যা বলার চেষ্টা করলে তা বরদাস্ত করবো না। ভুল ত্রুটি মানুষের হয়। কিন্তু তা চাপা দেওয়ার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা অন্যায়।"

অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশেও একদিকে কর্ম্ম এবং অন্যদিকে ধ্যান-জপ—দুইদিক সমান্তরালে চলেছে। ক্যাসেটে ধরা সঙ্ঘের ভজন গীতিগুলি ছিল তাঁর অন্যতম সাধনসঙ্গী। ভারত থেকে প্রেরিত একতারায় তর্জ্জনীর আঘাতে নাদঝঙ্কার তুলে বিরলে আপন মনে গেয়ে চলেন গুরুগুণগীতি, যদিও গান-বাজনা জানতেন না। সঙ্ঘভ্রাতাদের চিত্রসংগ্রহ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সেই সুদূর দেশেও তিনি যেন তাঁদের প্রত্যক্ষ সঙ্গ অনুভব পূর্ব্বক আনন্দানুভব করেন। এক চিঠিতে লিখেন (১০. ৯. ৮৫)—"ভারতে যাওয়ার কথা মনে এলে কেঁদে আকুল হই, তাতে কাজের ক্ষতি হবে তা চিন্তা করি না।" সঙ্ঘ এবং সঙ্ঘভ্রাতাদের আকর্ষণেই বিরহীর এই চিত্তের হাহাকার। ভারতের মাটি প্রতি ক্ষণে তাঁকে হাতছানি দেয়। এমন পুণ্যভূমি জগতে আর কোথায় ?

বৃদ্ধ বয়সেও সাধননিষ্ঠার কি তীব্রতা ? লিখেন—"ধ্যান-জপের আধা-ইচ্ছা ও অসমর্থতা ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে বড় ব্যথিত করিয়া তোলে। জীবনসন্ধ্যায় এ বিষয়ে আর কিছুই করা যাইবে না।*** ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মচর্য্যসংস্কার প্রাপ্তির রাত্রে তিনি আমাকে তাঁর পায়ের কাছে শোয়াইলেন, আর নীচ আমি কিনা রাত্রিটা ঘুমাইয়া কাটাইলাম। সকালে তাঁর পাকের যোগাড় দিতে বলিলেন। ভাব-ভক্তিহীন আমি মাত্র যোগাড়ই দিলাম, তাঁর জন্য পাক করিলাম না। এই যে মরিতে বসিয়াছি, সাধন-ভজন করি কি ?" প্রতি মুহূর্ত্তে কিরূপ আত্মবিশ্লেষণ পূর্ব্বক তিনি সাধন-জীবনে অগ্রসর হতেন, এ উক্তি তার দৃষ্টান্ত। বহু কৃচ্ছ্র সত্ত্বেও তাঁর মনে হতো কিছুই হচ্ছে না। আরো তীব্রতর সাধন চাই।

সাধনার এই যে ব্যাকুলতা, তা সাধককে অনুভূতির এক মহতী

ভূমিতে উন্নীত করে। শেষ জীবনের সাধনানুভূতি সম্বন্ধে লিখেন অন্তরঙ্গ সঙ্ঘভ্রাতাকে—"তাঁর দয়া অতুলনীয়, কিন্তু আমার নিশ্চেষ্টতা অসীম। তবু তিনি কেড়ে কিছু নেন নি, বরং সাহায্যই করছেন। নিজে যখন আরতি করি, তখন মনে হয় তিনি আমার হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত। এ অনুভূতি কখনো কিছু অস্পষ্ট, কখনো অতি সুস্পষ্ট। পূজার আসনের ঠাকুর এবং হৃদয়াসনের ঠাকুর যখন এক হয়ে যান, তখন কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ! এই অনুভবের সংজ্ঞা কি? বল্‌তে পার? তুমি তো শাস্ত্রজ্ঞ!" না, বল্‌তে পারি না। শুষ্ক পাণ্ডিত্যাভিমান দিয়ে এ জিনিস বুঝানো যায় না। কেবল বাসনা জাগে এমনটি কবে হবে আমাদের জীবনেও!

নীতিগত ও আদর্শগত প্রশ্নে স্বামীজী অত্যন্ত কঠোর—একান্ত আপোষহীন। ত্যাগীর পরিচ্ছদে ভোগীর আচার চলতে পারে না। এরূপ ঘৃণিত জীবনকে ধিক্‌কার দিয়েছেন চিরকাল, প্রতিবাদ করেছেন তীব্রকণ্ঠে। ভারত থেকে বিদেশে যারা ধর্ম্মপ্রচারে যায়, তাদের অনেকের ভিতরেই মেকীর বেসাতি দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ। ভারতের ভাবমূর্ত্তিকে কলুষিত করছে এই সব ভণ্ডের দল। ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ-বর্জ্জিত স্বকপোলকল্পিত ভ্রান্ত দর্শন ও ভ্রান্ত যোগের সস্তা প্রচারে সাময়িক ভাবে বাজার গরম করা যায়, কিন্তু পরিশেষে মানুষ বুঝতে থাকে তারা প্রবঞ্চিত হচ্ছে। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে স্বামীজী বিদেশে যা প্রচার করেন তা খাঁটি সনাতন ধর্ম্মের আদর্শ নীতি সাধন ও দর্শন। একটুও ভেজাল নেই। যার ভাল লাগে এসো, নচেৎ এসো না—এই ছিল স্বামীজীর বলিষ্ঠ নীতি।

যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের ভাগবত ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে এসে যাঁরা আত্মমুক্তি ও বিশ্বকল্যাণকর্ম্মে ব্রতী, তাঁদের প্রত্যেকের জীবনই অতি মহৎ। স্বল্পপরিসরে ঐ সকল মহাজীবনের সামগ্রিক মূল্যায়ন হয় না। স্বামী পূর্ণানন্দজীর সম্বন্ধে যা উল্লিখিত হলো তা খুবই সামান্য। দশ বৎসর পর তিনি শেষ ভারতে

আসেন। রোগজীর্ণ শরীর। কিন্তু রোগটা কি? আশ্চর্য্য! বিলেতের মত জায়গায় তার সঠিক নির্ণয় হয় না। হয়তো নিজের প্রতি স্বামীজীর ঔদাসীন্যেরই পরিণতি এই। ক্যালকাটা পে ক্লিনিক নার্সিং হোমে প্রকৃত রোগ যখন ধরা পড়ে তখন শেষ অবস্থা। আর কিছু করার নেই। দুরারোগ্য কর্কট রোগ। অগ্ন্যাশয় আক্রান্ত। তার প্রথম বহিঃপ্রকাশ কামলায়। সর্ব্বাঙ্গ হরিদ্রাভ। কিন্তু রোগের জন্য কোন দুভাবনাই নেই তাঁর। একদিন লেখককে হাসতে হাসতে বলেন—"দেখ, আমি হলুদানন্দ হয়ে গেছি।"

বর্তমান প্রবন্ধের লেখক ব্যক্তিগত ভাবে পূজ্য স্বামীজীর নিকট চিরঋণী। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে স্বামীজীই তাকে সঙ্ঘে এনেছেন। এই দীনের প্রতি তাঁর স্নেহবাৎসল্যও ছিল অপরিসীম। মৃত্যুর পূর্ব দিন ১০ই এপ্রিল সকালে নার্সিং হোমে স্বামীজীর সঙ্গে লেখকের শেষ দেখা। রোগীর কণ্ঠে কিঞ্চিৎ জড়তা ও ক্ষীণতা। কিন্তু স্বাভাবিক কথাবার্ত্তাই বলেন। খেতে পারছেন না, ঘুম হচ্ছে না, গা চুলকায়—এ ছাড়া কোন কষ্টের কথাই বলেন না। চিত্তের প্রসন্নতা অক্ষুণ্ণ, অম্লান। লেখক তখনো সচেতন ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি—স্বামীজীর আয়ুষ্কাল নিঃশেষিত। কিন্তু কি জানি কেন, তার অবচেতন মন থেকে একটা চাপা কান্নার রোল সহসা বেরিয়ে আসে তীব্র বেগে। অশ্রু সংবরণ সম্ভব হয় নি। মনের গভীরে যিনি অধিষ্ঠিত, সেই অন্তর্য্যামীরই যেন অব্যক্ত ইঙ্গিত—এই দেখাই শেষ দেখা!

স্বামী প্রকাশানন্দজী

বাংলা দেশে সঙ্ঘের অন্যতম দীপ্ত প্রদীপশিখাটি সহসা নিভিয়া গেল। বাজিতপুর শ্রীশ্রীপ্রণবমঠের অধ্যক্ষ স্বামী প্রকাশানন্দজী শ্রীগুরুচরণে বিলীন হইলেন। সঙ্ঘজীবনের প্রথম ঊষা হইতেই

তিনি বাজিতপুর প্রণবমঠের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। এই ব্রত তাঁহাকে দিয়াছিলেন স্বয়ং মঠাধীশ শ্রীগুরুই। তিনি এই কার্যের যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিলেন এবং যথাযোগ্য পাত্রেই দায়িত্ব সমর্পিত হইয়াছিল। জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া তিনি শ্রীগুরু-প্রদত্ত দায়িত্ব অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্‌যাপিত করিয়া গেলেন। তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

জন্মিলে মরিতে হইবে, ইহা সত্য। শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"কাল পূর্ণ যাহার হইবে, সে চলিয়া যাইবে।" কিন্তু স্বামী প্রকাশানন্দজীর তিরোধান প্রাকৃতিক নিয়মের স্বাভাবিক পথ ধরিয়া আসে নাই। ইহা আসিয়াছে অতর্কিতে এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। গত ১৬ই বৈশাখ, (১৩৮৯) শুক্রবার, (ইং-৩০।৪।৮২) ঊষাতেও অন্য পাঁচ জনের মতই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের মঙ্গল আরতিতে সেদিনও তিনি মনপ্রাণ ঢালিয়া আরাধ্য শ্রীগুরুচরণে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। অতঃপর মঠের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। প্রাত্যহিক কর্ম্মসূচী অনুসারে দ্বিপ্রহরে শ্রীমন্দিরে পূজা ও ভোগ নিবেদন করিয়াছেন, ভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদগ্রহণে চিত্তের প্রসন্নতায় ভরপুর হইয়াছেন, আশ্রমের অনাথ শিশুগুলিকে প্রতিদিনের ন্যায়ই অন্নদান করিয়াছেন, অপরাহ্ণের সময়গুলিও নির্বিঘ্ন কর্তব্যসাধনে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রতিদিনের মত সেই দিনও সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়াছে। মঠের অন্যান্য ব্রহ্মচারী, সেবক ও আশ্রিত শিশু-গুলির সঙ্গে মঠাধ্যক্ষও প্রতিদিনের মতই সেই আরতি সমাধা করিয়াছেন। কেহই জানে না, সেই দিনকার সান্ধ্য আরতিতে জীবনসন্ধ্যায় উপনীত অশীতিপর বৃদ্ধ কি প্রার্থনা করিয়াছিলেন আরাধ্যের রাতুল চরণে। কেহই বুঝে নাই, তৎকালে কি অপার্থিব মহাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছিল এই একনিষ্ঠ সঙ্ঘসাধকের প্রণত মস্তকোপরি। সান্ধ্য আরতির ভাবঘন নিবিড়তার সঙ্গে ধ্যানস্নিগ্ধতার আবেশে বৃদ্ধ আপন কক্ষে প্রশান্ত চিত্তে উপবিষ্ট।

আশ্রমসেবকদের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ চলিতেছিল। এমন সময় একজন সামরিক পোষাক পরিহিত ব্যক্তি এবং একজন খাকী পোষাক পরিহিত ব্যক্তি আশ্রমে প্রবেশ করে এবং কিছু তল্লাসী চালায়। তাহারা স্বামীজীকে বলে—"এখনই আপনাকে সমাদ্দার ব্রীজের নিকট যেতে হবে, সেখানে কমাণ্ডার সাহেব অপেক্ষা করছেন।" বাংলাদেশে তখন এরশাদ সাহেবের অধীনে সামরিক শাসন। কুচক্রীদের অভিসন্ধি না বুঝিতে পারিয়া সরলপ্রাণ অজাতশত্রু, আজীবন মানবসেবাব্রতী, আবাল্য সংসারবিরাগী, মানুষের সততায় অতিমাত্র বিশ্বাসী, নিরপরাধ বৃদ্ধ উভয়ের অনুসরণ করিলেন। সমাদ্দার ব্রীজের উপর আরো অন্ততঃ জনা পনর সশস্ত্র ব্যক্তি অপেক্ষা করিতেছিল। বেশ কিছু নাটকের পর গভীর রাত্রিতে তাঁহাকে শূন্য প্রান্তরে লইয়া যাওয়া হয়। শুক্লপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ তখন দিগন্তের অন্তরালে লুকাইয়া। চতুর্দিক অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ঘাতকের শাণিত ছুরিকা নৃশংস মূর্ত্তিতে সহসা ঝলসিয়া উঠিল। যাহা অমানবিক তাহাই ঘটিয়া গেল। স্বামীজীর নিষ্প্রাণ শরীরটি সমাদ্দারের খালের জলে নিক্ষেপ করিয়া ঘাতকেরা পলায়ন করে। কে সাক্ষী ছিল ? উপরে সাক্ষী অন্তর্যামী শ্রীভগবান্।

বিচার ঠিকই হইয়াছে। বিধাতার কর্ম্মে কখনো ভুল হয় না। বীর সন্ন্যাসীর জীবনাবসান বীরোচিত ভাবেই ঘটিয়াছে। আর কয়টা দিনই বা তিনি বাঁচিতেন। রোগে ভুগিয়া, জরায় জীর্ণ হইয়া মৃত্যুতে গৌরব কোথায় ? সাহসের সহিত কর্ত্তব্য পালন করিতে করিতে, প্রতিকূলতার সঙ্গে যুঝিতে যুঝিতে, ইষ্টের ন্যস্ত দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিতে করিতে সুস্থ শরীরে, শান্ত মনে, কাহাকেও কোন উদ্বেগ না দিয়া, কাহারো গলগ্রহ না হইয়া যে মৃত্যুবরণ, সে মৃত্যু অনন্ত জীবনের গৌরবই বহন করিয়া আনে। এই মৃত্যু অভিনন্দনযোগ্য।

সে ইংরাজী ১৯২২ সালের কথা। গঙ্গাচরণ নামক এক যুবা সংসারে বিরাগী হইয়া সাধুজীবন যাপনের আবেগে যুগপ্রবর্ত্তক

সঙ্ঘাচার্য্যের শ্রীচরণসান্নিধ্যে আশ্রয়প্রার্থী। ফরিদপুর জেলারই ছেলে। গোসাইহাট থানার অন্তর্গত বাগানবাড়ী গ্রামে জন্ম। পিতার নাম কৃষ্ণকান্ত ভাওয়াল। ছেলেটি দীর্ঘাঙ্গ। উস্কোখুস্কো চুল। বেশ-ভূষায় কোনও মনোযোগ নাই। কিন্তু দেখিলেই মনে হয়, বেশ উৎসাহী ও বুদ্ধিদীপ্ত। ছেলেটি যে স্বভাববিরাগী এবং কর্ম্মঠ তাহা বুঝিতে অন্তর্য্যামী আচার্য্যের বিলম্ব হয় না। তখনো ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আনুষ্ঠানিক জন্মলাভ হয় নাই, বাজিতপুরে চলিতেছে বাজিতপুর সেবাশ্রম। কতিপয় উচ্চকোটি বিবিক্ত সাধক আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মচারী বিনোদকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক আত্মোন্নতি সাধনের সহিত লোকমঙ্গল কর্ম্মে নিয়োজিত থাকিয়া ভবিষ্য মহাজীবনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। ঠিক এমনি এক যুগে গঙ্গাচরণ আসিয়া সেই সাধক-সঙ্ঘে যোগদান করেন। ইং ১৯২৩ সালে 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ' এই নামকরণ হয়। ইং ১৯২৪ সালে ব্রহ্মচারী মহারাজ স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক স্বামী প্রণবানন্দরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং ঐ বৎসরই সঙ্ঘের প্রথম সারির সাতজন সন্তানকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দেন। কিন্তু গঙ্গাচরণকে অপেক্ষা করিতে হয় আরো পুরা একটি বৎসর। ইং ১৯২৫ সালে হয় তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষা এবং ইং ১৯২৭ সালে সন্ন্যাস। সন্ন্যাসের পর গঙ্গাচরণ রূপান্তরিত হন স্বামী প্রকাশানন্দে। বাজিতপুর মঠেই স্বামীজীর অধ্যাত্মজীবনের সূচনা এবং এখানেই তাঁহার জীবনের সকল কিছু দক্ষতা ও মহত্ত্বের প্রকাশ, বিকাশ। সুদিনে বা দুর্দিনে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় সঙ্ঘসেবার যে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা তিনি দেখাইয়া গেলেন তাহা অতুলনীয়, অবিস্মরণীয়। বাজিতপুর মঠে তাঁহার শূন্য স্থান সহজে পূর্ণ হইবার নয়।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ইং ১৯২২ সালে গঙ্গাচরণ যখন এই অধ্যাত্ম সঙ্গে যোগদান করেন তখন পর্য্যন্ত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নামকরণ পর্য্যন্ত হয় নাই। বাজিতপুর আশ্রমেরও তখন শৈশবাবস্থা।

মাদারীপুরে, খুলনায় ও আশাশুনিতে তিনটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতায় তখন সবে মাত্র পা বাড়ানো হইয়াছে—বাগবাজারের ডিস্‌পেন্সরি লেনে তিন টাকায় একখানি অন্ধকুটীর ভাড়া নিয়া। কিন্তু যুগপ্রবর্ত্তক আচার্য্যের ভাগবত সঙ্কল্প ও ভাগবতী মহাশক্তির প্রচণ্ড আবর্ত্ত অনতিকাল মধ্যেই সঙ্ঘকে পরিণত রূপদানে অতিমাত্র তৎপর। বাজিতপুর প্রণবমঠেরও নবরূপায়ণ হয় ইং ১৯৩০ হইতে ইং ১৯৩৪ সাল এই চারি বৎসরের ভিতরে। স্বীয় অভীষ্ট ধর্ম্মচক্র ও কর্ম্মচক্রের ব্যাপক প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীশ্রীআচার্য্য সঙ্কল্পারূঢ় এবং এই জন্যই তদীয় ভাবকেন্দ্র ও শক্তিকেন্দ্র বাজিতপুর প্রণবমঠের বহুধা সম্প্রসারণে মনোযোগ দেন। শ্রীশ্রীআচার্য্য স্বয়ং নিজ তত্ত্বাবধানে মঠের জন্য সংগৃহীত জমি উঁচু করিয়া বাঁধাইয়া তাহাতে সঙ্কল্পিত নির্ম্মাণ-কার্য্যাদি সাধন করেন। রাজসভাপ্রাঙ্গণ, রাজমঞ্চ, দুইটি বড় টিনের নাটমন্দির, অগ্নিহোত্র যজ্ঞবেদী, ভোগপ্রাঙ্গণ, তপোবন, প্রণবধূনী, প্রণবগুম্ফা, প্রণবারাম, প্রণবোদ্যান, প্রচারতরণী কাণ্ডারী, বৃহৎ শিবিকা, শ্মশানমন্দির, যাত্রিনিবাস, সাধুনিবাস, অর্চ্চনালয় প্রভৃতি নির্ম্মাণ এবং প্রণবকুণ্ড ও সাধারণের জন্য পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম মঠের অবয়ব বৃদ্ধি করে। শ্রীশ্রীআচার্য্যের তপঃস্থান ও সিদ্ধাসনের উপর নির্ম্মিত হয় পাকা মন্দির ও বেদী। একটি দ্বিতল বিশ্রাম-মন্দিরও তৈয়ারী হয় স্বয়ং মঠাধীশের জন্য। শুধু বহিরঙ্গে নয়, মঠের অন্তরঙ্গ সত্তায়ও শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব ভাবের পর অধ্যাত্ম মহাভাবের বিপুল তরঙ্গ তুলিতে থাকেন এবং তাহার ভিতর দিয়াই তদীয় ভাগবত মহিমার মহাপ্রকাশ ঘটিতে থাকে। কখনো শিববেশে অধিষ্ঠিত হন, কদাপি রাজাধিরাজ বেশে। এই রূপে ও এই বেশে সহস্র সহস্র ভক্তের জীবনে মহাশক্তির সঞ্চার করেন। অষ্টোত্তরশত কলসী তীর্থবারিতে মহাভিষেক, অষ্টোত্তরশত ব্যঞ্জনে অন্নকূট ভোগ, দোললীলা, লক্ষ ফুলে পূজা,

অবিশ্রান্ত শ্রীশ্রীগুরুপূজারতি, ত্রিশূলোৎসব, মাঘী পূর্ণিমায় বিরাট আবির্ভাবোৎসব, মহাযজ্ঞেশ্বররূপে আশীর্ব্বাদ বিতরণ —ভাবময়ের কত বিচিত্র মহাভাবের প্রকাশই না দেখা গিয়াছে এই মঠভূমিতে। শ্রীশ্রীপ্রণবমঠের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে এই যে নব নব ভাবের নব নব রূপায়ণ, এই মহাযজ্ঞে যাঁহারা যুগাচার্য্যের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, স্বামী প্রকাশানন্দজী তাঁহাদের অন্যতম। বিশেষতঃ মঠের বৈষয়িক ব্যাপারে ও বহিরঙ্গ কর্ম্মকাণ্ডে স্বামিজীর আনুগত্য ও কর্ম্মদক্ষতা তাঁহাকে ইষ্ট শ্রীগুরুর শুভদৃষ্টি ও শুভাশীর্বাদ লাভের যোগ্য করিয়াছিল। অনেক সময় বাহিরের বিচারে মানুষটিকে কাটখোট্টা, শুষ্ক রুক্ষ, তর্কপ্রবণ, সংশয়ী, বে-রসিক বলিয়া ভ্রম হইতে পারিত। খুব জোরে জোরে কথা বলিতেন। গলার জোরে নিজের বক্তব্য ও যুক্তিকে সর্বদাই প্রতিপক্ষের উপরে তুলিয়া ধরিতেন। কিন্তু এই মানুষটিই কিরূপ আস্তিক ও গুরুভক্ত তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত তখন, যখন শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব নানা কর্ম্মের অবসরে মাঝে মাঝে মঠে আগমন করিয়া কিছু দিন অবস্থান করিতেন। তৎকালে শ্রীগুরুসেবার জন্য যাহা করণীয় সকলই তিনি সম্পাদন করিয়াছেন। নিঃসংশয়ে বলিব, তাঁহার ছিল সুন্দর ইষ্টনিষ্ঠা এবং অবিচল সঙ্ঘানুগত্য। ছিল তাঁহার প্রখর বাস্তববুদ্ধি, আর ছিল এক নিপুণ শিল্পীর মানসিকতা। শ্রীশ্রীপ্রণবোদ্যানকে তিনি নন্দনকানন সদৃশ করিয়া তুলিয়াছিলেন আপন কল্পনায়, শ্রমে ও অনুরাগে। এই খানেই স্বামীজীর চিত্তের সরসতা ধরা পড়িয়াছে। নানা জাতের গোলাপ, গন্ধরাজ, জবা, গাঁদা চম্পক, অশোক, টগর, অপরাজিতা, বেলী, যুঁই, ব্রাইওনিয়া, রজনীগন্ধা ও ঋতুপুষ্পের সম্ভারে প্রণবোদ্যান সুস্মিত হইয়া থাকিত। এই ফুল্ল কাননে আচার্য্যদেব মধ্যে মধ্যে আসিয়া বিশ্রাম লইতেন এবং সন্ন্যাসী ও গৃহীভক্তকেও সঙ্গ দান করিতেন। এই প্রণবোদ্যানের কুসুমেই ত্রিসন্ধ্যা মঠাধীশের পূজারতি সম্পাদিত হইত। এই

ফুলেই ভক্তেরা গাঁথিতেন বিবিধ প্রকারের মালা শ্রীগুরুর শ্রীকণ্ঠে পরাইতে।

ইংরাজী ১৯৪১ সালে শ্রীশ্রীসংঘনেতার ভাগবত শরীর অপ্রকট হয়। কলিকাতা হইতে শ্রীশরীর বাজিতপুর মঠে আনিয়া সমাধিস্থ করা হয় পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত বেদীতে। স্বামী প্রকাশানন্দজীর দায়িত্ব বাড়িল। শ্রীগুরুর অধিষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া নিখুঁত আন্তরিকতার সহিত তিনি নিত্য সেবা-পূজাভোগাদি কৃত্য চালাইতে থাকেন। তাঁহার স্বহস্তে রচিত প্রণবোদ্যানের ফুলগুলি সমাধিবেদীকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিত। নিজেই তিনি ফুল তুলিয়া দিতেন। প্রত্যহ সাতটি আসনের পূজায় সেই ফুল উপচিত হইয়া মঠের ভাবপরিবেশকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিত।

তাহার পর ইং ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ। পূর্ব্ব বঙ্গের নাম হইল পূর্ব্ব পাকিস্থান—মানে পুরাপুরি ঐশ্লামিক রাষ্ট্র। লক্ষ লক্ষ হিন্দু দেশত্যাগী এবং ভারতে আশ্রিত। বার বার এ-পারে এবং ও-পারে সাম্প্রদায়িক গোলযোগে শত শত নিরীহ মানুষের শোণিতপাত। কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবের এই পৌনপুনিক উদ্বেলতার ভিতরেও স্বামী প্রকাশানন্দজী অচল, অটল। তিনি দেশের এই রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনকে আনুগত্যের সঙ্গেই স্বীকার ও বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। অন্য পাঁচ জনের মত তিনিও পূর্ব্ব পাকিস্থানের একজন বিশ্বস্ত নাগরিক। দেশত্যাগের কল্পনা পর্য্যন্ত তাঁহার ভিতরে কদাপি আসে নাই। কোন প্রকার মানসিক দুর্ব্বলতা ও নৈতিক পরাভবকে তিনি আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেন নাই। হিন্দু বা মুসলমানের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র পক্ষপাত বা ভেদদৃষ্টি ছিল না। তিনি সকলেরই বান্ধব ও হিতার্থী। শ্রীশ্রীসিদ্ধপীঠের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার আশীর্ব্বাদ তাঁহার চেতনায় মহাশক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। সেই আত্মিক বলের প্রভাবেই তিনি বিজয়ীর গৌরবে যথেষ্ট সাহস ও মর্যাদার সঙ্গেই অবস্থান করিতেন। সেখানে এক

স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজী ও পরে স্বামী ভবানন্দ ব্যতীত কোন যোগ্য সঙ্গী তাঁহার ছিল না। ইং ১৯৭২ সালে স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজীর তিরোধান ঘটে। স্বামী ভবানন্দও শ্রীগুরুচরণে নির্ব্বাণ লাভ করে। অন্তরঙ্গ গৃহীভক্ত রমেশ দাস ইং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় ঘাতকের হস্তে প্রাণ দেন। কিন্তু এই নিঃসঙ্গতার বেদনাকেও তিনি সহজে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন এই বোধে যে স্বয়ং প্রাণদেবতা ঠাকুরই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন এই মঠভূমিতে। দেশবিভাগের ফলে সঙ্ঘের মূল কেন্দ্র হইতে মঠ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। আন্তর্জাতিক আইন কানুনের বেড়াজালে কোন প্রকার অর্থনৈতিক বা কায়িক সহযোগিতা পাঠানো যায় নাই মঠে। কিন্তু মঠ অচল হয় নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য পূজারাধনা, মাঘী পূর্ণিমায় বিরাট মেলা ও মহোৎসব, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, পৌষে ত্রিশূলোৎসব, চৈত্রে নীলপূজা সবই ঠিকঠাক মত চলিয়াছে। দাকোপ (খুলনা) এবং বাজিতপুরের ভূসম্পত্তিগুলির উপস্বত্ব হইতে মঠ সুন্দর ভাবেই চলিয়াছে এবং এই সাফল্যের মূলে ছিল স্বামীজীর অপরিসীম যোগ্যতা।

ইংরাজী ১৯৭১ সালে পূর্ব্বঙ্গের রাষ্ট্রীয় জীবনে আর এক বিরাট বিবর্ত্তন। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পূর্ব্ববঙ্গ স্বাধীন হইয়া বাংলাদেশ নাম ধারণ করিল। এই বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে খান সেনাদের হস্ত হইতে ধন-মান-প্রাণ রক্ষায় সহস্র সহস্র মুসলমানের সহিত অন্ততঃ এক কোটি হিন্দু ভারতে আশ্রয় লয়। দুই দেশের সীমান্তে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ তখন প্রতিদিন ২ লক্ষাধিক হিন্দু-মুসলমান শরণার্থীর সহিত শত শত মুক্তি-যোদ্ধাকে অন্ন দিতেছে। যুদ্ধোত্তর কালে সঙ্ঘ বাংলা দেশের ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি জেলার সহরে ও পল্লীতে লক্ষ লক্ষ টাকার সেবাসামগ্রী বিতরণ করে। এই রাষ্ট্রীয় দুর্য্যোগেও স্বামী প্রকাশানন্দজী আপন জীবন বিপন্ন করিয়া মঠের মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন। তিনি যদি চলিয়া আসেন তবে মঠে

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য সেবা চলিবে কি করিয়া ? ঠাকুর কি উপবাসী থাকিবেন ? মঠের ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনাকেও তো উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যদিও স্থানীয় ভক্ত ও দেশপ্রেমিক মুসলিমরা মঠের নিরাপত্তায় সহানুভূতিশীল, কিন্তু উন্মত্ত জনতাকে বিশ্বাস কি ? স্বামীজী মঠ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে পারেন নাই। পলায়ন তাঁহার স্বভাব নয়। কিঞ্চিৎ আড়ালে অবশ্য নিজেকে রাখিলেন, কিন্তু সদা সতর্ক দৃষ্টি রহিল মঠের প্রতি। এই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের অরাজক পরিস্থিতিতেও একটি দিনের জন্যও মঠের সেবাপূজা বন্ধ হয় নাই এবং মঠ অক্ষতই ছিল। বাংলাদেশ হইবার পরও তথায় রাজনৈতিক অস্থিরতা অবিরাম চলিতেছে। সকল পরিস্থিতির সঙ্গেই তিনি মানাইয়া চলিয়াছেন। কোন ত্রুটি হয় নাই। তবে অহেতুক অন্যায়ের কাছে তিনি কোন দিন মাথা নত করিতে পারেন নাই। মঠের বিষয়সম্পত্তির নিরাপত্তাকেও আপোষে বিঘ্নিত হইতে দেন নাই। কিছু সংখ্যক সুযোগ ও হুজুগপ্রিয়দের কাছে এটা হয়তো ভালো লাগার কথা নয়। এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে তাহাদেরই চক্রান্ত। কিন্তু তাঁহার তিরোধানে শান্তিপ্রিয় হিন্দু-মুসলমান সমভাবেই ব্যথিত ও শোকাহত। শহীদ মহাত্মার তপঃপূত শরীর প্রণবমঠের ভূমিতে যথোচিত মর্য্যাদার সঙ্গে সমাহিত করা হইয়াছে।

শ্রীগীতায় শ্রীশ্রীভগবানের উক্তি—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" হে অর্জুন, আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিতেছি, আমার ভক্তের কখনো বিনাশ নাই। স্বামী প্রকাশানন্দজীর সম্বন্ধেও সেই কথা। তিনি মরেন নাই এবং মরিবেন না। যে মাটিকে তিনি প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিয়াছিলেন সেই সিদ্ধপীঠের মাটিতে গভীর প্রশান্তিতেই তিনি চির শয্যা গ্রহণ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরই তাঁহাকে স্নেহশীতল কোল বাড়াইয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পরমা শান্তিতে বিশ্রাম করুন! তাঁহার আত্মত্যাগ আমাদিগকে নূতন প্রেরণায় যেন উদ্বুদ্ধ করে!

স্বামী সদানন্দজী

সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেবের অন্যতম লীলাপার্ষদ স্বামী সদানন্দজী অন্বর্থনামা সন্ন্যাসী। নামে তিনি সদানন্দ, বাক্যে, কার্য্যে এবং চরিত্রেও সদানন্দ। অতি সরল, সহজ মানুষ, নিতান্ত অনাড়ম্বর জীবন, সদা প্রসন্নচিত্ত। বিপুল কর্ম্মোদ্যম ছিল, কিন্তু ছিল না কর্ম্মের অহঙ্কার। খুব উপস্থিত বুদ্ধি, আবার সদা হাস্যরসিক। এই মহাপুরুষ আজ আর আমাদের ভিতরে নেই। গত ১৭ই অক্টোবর, ১৯৮৪, বাং ৩০শে আশ্বিন, ১৩৯১, বুধবার বেলা আড়াইটায় সঙ্ঘের কলিকাতাস্থিত প্রধান কার্যালয়ে তিনি ইষ্টচরণে চিরবিশ্রাম লাভ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৩। পিতৃদত্ত নাম সুশীল। জন্মভূমি যশোহর জেলার অন্তর্গত ভেরচি গ্রাম। পিতা শ্যামাচরণ আশ এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। বাল্যকাল থেকেই সুশীল সংসারে অনাসক্ত। পাঠ্যদশাতেই সংসার থেকে পালাই পালাই ভাব। রাজেন্দ্র এবং সুশীল জ্ঞাতিসম্পর্কে নিকটতম আত্মীয়—খুড়ো-ভাইপো সম্বন্ধ।

পাশাপাশি বাড়ী। দুজনের একই ঘরে বসে পড়াশুনা হয়। খেলাধুলাও এক সঙ্গে। একই সুফলাকাঠি হাইস্কুলের ছাত্র। কিন্তু সব কিছুর ভিতরে দুজনেই যে এক মহাজীবনের জন্য গোপন প্রস্তুতি নিচ্ছেন, গৃহের অভিভাবকেরা ইঙ্গিতেও তা কখনো বুঝতে পারেন নি। একদা অতি প্রত্যূষে দুই তরুণ সকলের অজ্ঞাতে গৃহত্যাগী। সঙ্গে সামান্য মাত্র পুঁজি। রওনা হন নবদ্বীপ দর্শনান্তে হরিদ্বারের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে সন্ন্যাস নেবেন—হিমালয়ে তপস্যা করবেন, মুক্তি অর্জ্জন করবেন নিজেদের জন্য। কিন্তু, বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ। এঁরা তো শুধু ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য জগতে আসেন নি—লক্ষ কোটি মানুষের আত্মিক মঙ্গলের বেদনায় তিলে তিলে শরীরের শোণিত মোক্ষণের জন্যই

তো তাঁদের জগতে আসা। এক লোকবরেণ্য যুগপুরুষ প্রতীক্ষা করছেন তাঁর চিহ্নিত সন্তানগণের জন্য—অধীর আগ্রহে।

কাশীধামে গিয়েই দুই নিবের্দীর পুঁজি গেল ফুরিয়ে। সারাটি দিন অনাহারে। ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। সহসা দুর্জ্জয় বিবেক গর্জ্জে উঠে ধীমান্ শ্রীরাজেন্দ্রের মনের ভিতরে। লোকে বলে—কাশীধাম মা অন্নপূর্ণার স্থান, এখানে কেউ অভুক্ত থাকে না। এ প্রবাদ কি সত্য? পরীক্ষা চাই। দেখবো আজ স্থানমাহাত্ম্যের বাস্তবতা। বসে থাকবো এখানেই, দেখি আহার্য্য জুটে কি না।

পরীক্ষা সফল। ঠিক সন্ধ্যায় এক বৃদ্ধার উপস্থিতি। বল্লেন—"বাচ্ছা, খাওগে, খাওগে?" ব'লেই একটি আহার্য্যের পুঁটুলি দুই যুবাকে দিয়ে বৃদ্ধা কোথায় যে অন্তর্হিতা হলেন আর তাঁকে দেখা গেল না। কিন্তু আশ্চর্য্য! ঐ আহার্য্যে দু জনেরই হয় উদরপূর্ত্তি। বিস্ময়ে ও বিশ্বাসে তরুণদ্বয় অভিভূত। তারপর ঐশ বিধানেই বুঝি হরিদ্বার যাওয়া আর হয় না। ফিরে আসেন উভয়ে নিজেদের বাড়ীতেই। কিন্তু, তা বেশী দিনের জন্য নয়।

রাজেন্দ্র যখন পড়তেন দৌলতপুর কলেজে, তখন সেখানেই সন্ধান পান ব্রহ্মচারী বিনোদের। ১৯২১ সালে সুন্দরবন দুর্ভিক্ষ সেবাকার্য্যে ব্রহ্মচারীজী সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। তখন নারায়ণ, অমূল্য ও রাজেন্দ্র অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে কলেজ ছেড়ে সেবাশ্রমে যোগদান পূর্বক অন্যান্য বহু স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে ঐ সেবাব্রতে ঢেলে দিয়েছেন প্রাণমন। কিয়ৎকাল পরে সুশীলও এসে যোগদান করেন সেবাশ্রমে, শরণ গ্রহণ করেন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ ব্রহ্মচারী বিনোদের। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মচারী বিনোদ সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক স্বামী প্রণবানন্দ রূপে আত্ম প্রকাশিত। ঐ বৎসরই তিনি তাঁর সাত জন প্রধান উত্তর সাধককে সন্ন্যাসমন্ত্রে দেন মহাদীক্ষা। সর্বশ্রদ্ধেয় কুমুদ, নারায়ণ, অমূল্য, মধু, রাজেন্দ্র, নিকুঞ্জ, যতীন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক যথাক্রমে স্বামী

সচ্চিদানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী বেদানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ ও স্বামী নির্গুণানন্দ নামে পরিচিত হয়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। সুশীলের ব্রহ্মচর্য্য সংস্কার হয় ইংরাজী ১৯২৬ (বাং ১৩৩২) সালে এবং তিনি সন্ন্যাস লাভ করেন ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে (বাং ১৩৩৩) মাঘী পূর্ণিমায় বাজিতপুর মহাসিদ্ধ-পীঠে। তৃতীয় দলে যাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ইনি তাঁদেরই অন্যতম। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে আইনতঃ রেজেষ্ট্রী করা হয়। তখন থেকেই স্বামী সদানন্দজী সঙ্ঘের গভর্ণিং বডির অন্যতম সদস্য এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে নানা ভূমিকায় কার্য্য ক'রে গেছেন।

প্রায় প্রথম থেকেই তিনি সঙ্ঘের খুলনা (বেলফুলিয়া গ্রাম) সেবাশ্রমের একনিষ্ঠ কর্মীরূপে আপন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। বাস্তুনির্ম্মাণ কার্য্যে ভাল অভিজ্ঞতা ছিল। কৃষিকার্য্যেও ছিল প্রচুর অনুরাগ। ভৈরব নদের তীরে খুলনা সেবাশ্রমের বিশাল ভূখণ্ডকে ফলে, ফুলে, সব্জীতে তিনি ভরে তুলেছিলেন। তারই সঙ্গে সহরে ও গ্রামে গ্রামে যেয়ে মুষ্টি-ভিক্ষা আদায়, ট্রেনে ষ্টীমারে বক্স কালেক্শন্, রাত্রে হাসপাতালে গিয়ে বিনিদ্রভাবে রোগীর স্বেচ্ছাসেবা, আশ্রমের নানাবিধ ঘরোয়া কাজ—একাধারে সব কর্মেই তিনি নিরলস। ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা ও জপধ্যান চলেছে এই নিরবচ্ছিন্ন কর্মযজ্ঞেরই পাশাপাশি। আত্মো-ন্নতির জন্য কি ব্যাকুল পিপাসা! মন বড় চঞ্চল। ধ্যানে স্থির হয় না। বড় দুঃখ প্রাণে। আচার্য্যদেব আশ্বাস দিয়ে বলেন—'হবে, ভয় নেই। গুরুনির্দেশিত পথে সাধন করতে থাক, মনশ্চাঞ্চল্য ক্রমে প্রশমিত হবে। মন বশে এসে গেলে সাধন তো হয়েই গেল। মনকে জয় করার জন্য যে সংগ্রাম, তা-ই তো সাধনা। তা কি একদিনে হয়!'' উপদেশ, আশ্বাস ও আশীর্বাদ পেয়ে সাধক শান্ত হন, তৃপ্ত হন!

একদিন খুলনা আশ্রমের একটা বড় গাছ কেটে ফেলেছেন। প্রয়োজন ছিল না গাছটা কাটার। আচার্য্যদেব দেখেই বলেন—"করলি কি? গাছটা কেটে ফেললি! অনেক সিদ্ধ পুরুষ বৃক্ষরূপে অবস্থান করেন ভাগবত পুরুষের লীলা দর্শনের জন্য।" চমকিত হন স্বামী সদানন্দ। গাছের যে শুধু প্রাণ আছে তা-ই নয়, বৃক্ষে সিদ্ধ পুরুষদের অধিষ্ঠানও হয়। আজ আচার্য্যদেবের ভাগবত ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে নূতন চেতনা লাভ হয় তাঁর, প্রত্যয় হয় দৃঢ়তর।

এই প্রত্যয় নিয়েই তিনি একদা গেলেন আইসগাতি গ্রামে—ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সিংহের বাড়ী। এত কাছের লোক। কিন্তু একদিনও আশ্রমে আসেন না—এত বড় যুগপুরুষের দর্শনের ইচ্ছাও মনে জাগে না। কিন্তু, পুরুষসিংহ যোগেন্দ্রবাবু এক পিতা-মাতা ভিন্ন অন্য কারো পায়ে মাথা নত করতে প্রস্তুত নন। বহু সাধু-সন্ন্যাসী তিনি দেখেছেন। কারো প্রতি শ্রদ্ধা হয়নি। স্পষ্টই শুনিয়ে দেন। তবে হাঁ, এমন যদি কাউকে চোখে পড়ে যে, যাঁকে দেখলে মাথা আপনি নুইয়ে পড়ে, তা হ'লে তাঁর কাছে তিনি যেতে পারেন। স্বামী সদানন্দজী দৃঢ় কণ্ঠে বলেন—"হাঁ, তেমন একজন মহাপুরুষকে দর্শনের আমন্ত্রণই তো জানাতে এসেছি আপনাকে। চলুন, একবার দর্শন ক'রে পরীক্ষা করুন।"

নির্দিষ্ট দিনে তিনি আশ্রমে আসেন। পর্ণকুটীরে আপন মহিমায় বিরাজমান আচার্য্যদেবকে দর্শন ক'রেই বিস্ময়ে অভিভূত। এ যে স্বয়ংজ্যোতিঃ! এমন দিব্য জ্যোতির্ময় পুরুষ তো তিনি জীবনে দর্শন করেন নি। শ্রদ্ধায় শির নুইয়ে পড়ে শ্রীচরণে। বাইরে এসে আবেগোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেন—"সাক্ষাৎ শিব! সাক্ষাৎ শিব!" পরে মহাপুরুষের নিকট দীক্ষা ও আশীর্বাদ নিয়ে ধন্য হয় তাঁর জীবন।

খুলনা আশ্রমের ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়টি পরবর্তী কালে খুলনা

বিদ্যার্থিভবনে রূপান্তরিত হয়। যোগেন্দ্রবাবুর দানে 'দীননাথ দাতব্য ঔষধালয়' সাফল্যের সঙ্গে চলেছে। আশ্রমের ছিল আরো নানাবিধ জনহিতকর কার্য্য। দেশ বিভাগের পূর্ব পর্য্যন্ত স্বামী সদানন্দজীই ছিলেন এই আশ্রমের মুখ্য তত্ত্বাবধায়ক। দেশবিভাগের পর উদ্বাস্তুর স্রোত ভারতে আসতে থাকে। সেই সময় স্বামীজী ভারত সীমান্তে রাণাঘাটশিবিরে অবস্থানপূর্বক সংঘায়োজিত মানব সেবাব্রত উদ্‌যাপন করেন এবং শারীরিক কারণে ভারতেই থেকে যান। উচ্চ রক্তচাপ ছিল। প্রতিক্রিয়ায় মস্তিষ্কটাও দুবার কষ্ট দিয়েছে।

স্বামীজীর ব্যবহার ছিল খুবই মধুর। একটা শিশুকেও কোন দিন ধমক দিয়ে কথা বলতে শুনিনি। কণ্ঠটিও ছিল বড় মিষ্টি। ঐ কণ্ঠ দিয়েই ছাত্রাবস্থায় আবৃত্তি ক'রে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে (২১শে জুন) খুলনা ধর্মসভা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হিন্দুজনসভায় বক্তা স্বামী বেদানন্দজী উপস্থিত হতে না পারায় শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব স্বামী সদানন্দজী ও স্বামী নিখিলানন্দজীকে দিয়েই অনুষ্ঠান চালিয়ে নেন। স্বামী সদানন্দজী সঙ্ঘের একখানি মুদ্রিত প্রচারপত্র পাঠ করেন। স্বামীজীর পাঠ শুনে সভার সভাপতি শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন, এম এল এ, মন্তব্য করেছিলেন —"মানুষের কণ্ঠ এমন মিষ্ট হয় তা জানতাম না। আজ শুনলাম।"

দীর্ঘ দিবস শারীরিক অসুস্থতায় ভুগেও সদানন্দময় পুরুষের মুখের হাসি কখনো ম্লান হয় নি। কোন দিন বলেন নি কোন শারীরিক কষ্টের কথা। জিজ্ঞাসার উত্তরে বলতেন কুশলেই আছেন। এ অবস্থাতেও স্বভাবরসিক স্বামীজী অতীতের কত হাসির কথাই না শুনাতেন। ছাত্রাবস্থায় বৃদ্ধ সাজাহানের পাঠ গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে আবৃত্তি করে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। উচ্চ-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকও তাঁর নাম দিয়ে ফেলেছিলেন 'সাজাহান'। অনুরোধ করলেই ঐ পাঠটি পুনরাবৃত্তি করে শুনাতেন। রেল

ষ্টেশনে স্তূপীকৃত মালপত্র রক্ষার জন্য আচার্যদেব সকলকে কড়া পাহারা দেওয়ার আদেশ দিলে তিনি সব চেয়ে বড় কড়াইটার পাশে গিয়ে দণ্ড হাতে দাঁড়ালেন। পাকা অভিনেতার মত গম্ভীর কণ্ঠে গুরুভাইদের বল্লেন—"দেখ, আমি কড়া পাহারা দিচ্ছি।" কথাটা কানে গেলে স্বয়ং আচার্যদেবও না হেসে থাকতে পারেন নি। খুলনা আশ্রমের পাশেই এক স্বর্ণব্যবসায়ী সম্পন্ন গৃহস্থ। আবার কুক্কুট পালনের ব্যবসায়ের (Poultry) পরিকল্পনা করলে স্বামীজী কি কৌশলে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করেছিলেন তা খুব মজা করে শুনাতেন। স্বর্ণকার প্রতিবেশীকে বল্লেন স্বামীজী—"দাদা, আপনি আমাদের বন্ধুলোক। কেউ যদি আপনাদের নিন্দাবাদ করে তবে আমাদের প্রাণে বড় লাগে। ঐ রামপাখীগুলি ভোর না হ'তেই যখন ষড়জ স্বরে চীৎকার করে উঠবে 'দাদারা চো···র! দাদারা চো···র!' তখন কি রকম হবে বলুন তো?" স্বামীজীর এই কথার পর ঐ পরিকল্পনা বন্ধ হয়ে যায়।

বুড়ো মানুষ। চোখে ছানি। দেওয়াল ধরে ধরে হাঁটেন। বল্লাম—"স্বামীজী, দণ্ড নিলে হয় না!" উপস্থিতবুদ্ধি স্বামীজীর তাৎক্ষণিক উত্তর—'দণ্ড নেবো কোন্ অপরাধে?" হেসে বল্লাম—'আপনি সত্যই আমাকে বড় ঠকিয়ে দিলেন।' সরলপ্রাণ সাধু মহারাজ ভারী খুসী। পাশের ঘরের তরুণ সাধুদের বলেন—"স্বামী নির্ম্মলানন্দ পণ্ডিত বটে, কিন্তু এমন উত্তর দিয়েছি যে, সে একবারে চুপ।" ক'দিন পরেই কিন্তু পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান। সেদিন থেকে দণ্ড ধারণে বাধ্য হন। তখন বলি—স্বামীজী! আপনার সেদিনকার প্রশ্নের জবাব আজ দেবো। বার্দ্ধক্যই অপরাধ।" সেদিনও তিনি প্রাণ খুলে হেসেছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে আর একটি পতনই হলো তাঁর মৃত্যুর কারণ। এবার কিন্তু দৃষ্টিহীনতা-জনিত অসতর্ক পদস্খলন নয়, এবার সেরিব্র্যাল্ ষ্টোক। মৃত্যুর সপ্তাহকাল পূর্ব্বের ঘটনা। সেই যে পড়লেন আর উঠতে পারলেন না। বাক্‌রোধ হল।

অর্ধবাহ্য অবস্থা। কিন্তু, একেবারে যে অচেতন নয় তা বুঝা গেল তখন, যখন হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে কি যেন চাইছেন বারে বারে। জপের মালাটি চাইছেন কি? সেবাব্রতী সন্ন্যাসী জপের মালাটি হাতে তুলে দিতেই সেটি নিজেই পরলেন গলায়? আবার হাত বাড়ালেন। কি চাইছেন এবার। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমূর্তিখানি কি? হাতে তুলে দিতেই বুকে ধরে রাখলেন। বুঝা গেল জ্ঞান বর্ত্তমান আছে। কিন্তু নেই কেবল বাক্‌শক্তি। নিশ্চয়ই শুনেছেন অন্তিমের ডাক। তাই স্মরণ করছেন মুক্তিদাতা ইষ্ট শ্রীগুরুকে। জীবনে যাঁকে আরাধ্যরূপে বরণ করেছেন, মরণে তাঁকে ভুলবেন কেন?

স্বামী ধীরানন্দজী

আর একটি প্রদীপ নিভে গেল। সঙ্ঘের প্রবীণতমদের আর এক মহাত্মা অপ্রকট হলেন। ইনি শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী ধীরানন্দজী মহারাজ। মাদারীপুর মহকুমার নলমুড়ি গ্রামের সন্তান নন্দ লাল ভাওয়াল ইং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সংসার ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীশ্রীআচার্য্য-দেবের দিব্য সংস্পর্শে আসেন। ইং ১৯২৫ (বাং ১৩৩১) সালে হয় ব্রহ্মচর্য্য-সংস্কার। সন্ন্যাসের কাল ১৯২৭, বাং ১৩৩৩, মাঘী পূর্ণিমা। শ্রীমৎ প্রকাশানন্দজী, শ্রীমৎ সদানন্দজী, শ্রীমৎ পূর্ণা-নন্দজী, শ্রীমৎ মুক্তানন্দজী, শ্রীমৎ শংকরানন্দজী এই একই সালে সন্ন্যাসপ্রাপ্ত। ওঁদের তিরোধান হয়েছে বহুকাল। দীর্ঘজীবী ছিলেন শ্রীমৎ ধীরানন্দজী। আনুমানিক ৮৯ বৎসর বয়সে গত ২৩শে আশ্বিন, ১৩৯৬ (ইং ১০ই অক্টোবর, ১৯৮৯) বেলা ১-৪০ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কলিকাতা কেওড়াতলা শ্মশানে সঙ্ঘ-সন্ন্যাসী ও সেবকদের উপস্থিতিতে বিশেষ মর্য্যাদা সহকারে তদীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হয়। সঙ্ঘের

প্রধান কার্যালয়ে বহু সন্ন্যাসী ও ভক্তের সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয় প্রয়াত মহাত্মার স্মৃতিপূজা।

সন্ন্যাসীর গুরুপ্রদত্ত ধীরানন্দ নামটি সার্থক। সত্যই তিনি ছিলেন অন্বর্থনামা। যেমন ধীর, স্থির, তেমনি স্বল্পভাষী ও বহুজনসঙ্গে অনাসক্ত। অথচ তাঁর শারীরিক বল ছিল বিপুল এবং কর্ম্মে ছিল অনন্যা নিষ্ঠা ও একাগ্রতা। সংক্ষেপে এই তদীয় চরিত্রবৈশিষ্ট্য। সঙ্ঘের তৃতীয় দলে যে ছয়জন সন্ন্যাসব্রত বরণ করেন, তিনি তাঁদের শেষ অন্যতম। তিনি সঙ্ঘের পরিচালক সমিতির প্রবীণ সদস্য ছিলেন।

শ্রীমৎ যোগানন্দজীর সফল নেতৃত্বে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের সুন্দরবন দুর্ভিক্ষ সেবাকার্য্যে যাঁরা অক্লান্ত কর্ম্মে ব্রতী, তাঁদেরই অন্যতম এবং বর্ত্তমানে সঙ্ঘের সহ-সভাপতি শ্রীমৎ প্রজ্ঞানানন্দজী এই মহাত্মার স্মৃতিচারণ সম্বন্ধে যা বলেন—তা প্রণিধানযোগ্য। "১৯২১ সালে খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা মহকুমায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেই সময় আমি সাতক্ষীরা ও আশাশুনি অঞ্চলে সেবাকার্য্যে যাই। সেখানে বিভিন্ন কেন্দ্রে কিছুদিন ঘুরে আনুলিয়া সেবাকেন্দ্রে আসি। কিছুদিন পর এই কেন্দ্রেই উপস্থিত হয় এক বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ যুবা। পরিচয়ে জানি যুবার নাম নন্দলাল। এই তার সঙ্গে প্রথম দেখা।"

স্বামীজী বলতে থাকেন—"নন্দলালের খুব শারীরিক শক্তি। সেই সময় আশাশুনি মূল সেবাকেন্দ্র থেকে দুই মণ ওজনের চালের বস্তা আনুলিয়া পাঠানো হতো। সেই ভারী ওজনের চালের বস্তাগুলি সে একাই শূন্যে তুলে কুলির মাথায় চাপিয়ে দিত। আমি তার এইরূপ শারীরিক শক্তি দেখে বিস্মিত হই।" স্বামীজীও প্রসঙ্গক্রমে স্বামী ধীরানন্দজীর ধীর, স্থির, শান্ত স্বভাবের প্রশংসা করেন। সর্ব্বদাই তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী, কিন্তু কর্ম্মে অনলস। রিলিফের কার্য্যে ভারপ্রাপ্ত নেতার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। তিনি ভাল রান্নাও করতে পারতেন

এবং সেবাকেন্দ্রে প্রায়ই রান্না করে কর্ম্মীদের পরিবেশন পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত করতেন। এ কার্য্যে তাঁর কোন অনীহা ছিল না। নিরভিমানের ন্যায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ কার্য্যটিও সযত্নে সম্পাদন করতেন।

রিলিফের ডোল বিতরণ বন্ধ হয়ে গেলে নন্দলালকে পাঠানো হয় বুধহাটা কেন্দ্রে। সেখানে তখন সেবাকার্য্যোত্তর গঠনমূলক প্রকল্প চলছে। সতেরো খানা তাঁত বসানো হয়েছিল। ঐ তাঁত-গুলির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন উত্তরকালের স্বামী ধীরানন্দজী। আপন শান্ত স্বভাব, শুদ্ধ চরিত্র ও কর্ম্মদক্ষতার গুণে তিনি স্থানীয় সকল মানুষেরই প্রীতি ও ভালবাসা আকর্ষণ করেছিলেন। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ও এই নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মীর বিশেষ প্রশংসা করেন।

শুদ্ধ বৈরাগ্য নিয়েই তিনি সংসারত্যাগী। পূর্ব্বাশ্রমের আত্মীয়েরা বুধহাটা এসে শত অনুরোধ উপরোধ করেও তাঁকে ফিরিয়ে নিতে ব্যর্থ হন। অবশেষে এক বিশেষ কৌশলে সরল মানুষটিকে নৌকায় তুলে নিয়ে মাঝ নদীতে পাড়ি জমান। সাধু বুঝতে পারেন তাকে বাড়ী ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যই এই ষড়যন্ত্র। অমনি নৌকাতেই শুরু হয় ধস্তাধস্তি। বলশালী হয়েও যুবা অনেকের শক্তির কাছে পরাভূত। অবশেষে হাঙ্গর, কুমীর পরিবৃত খরস্রোতা লবণনদীতে নির্ভয়ে ঝাঁপ দেন এবং সাঁতার দিয়ে উপরে উঠেন। আত্মীয়েরা অগত্যা ফিরে যান। সন্ন্যাসী সর্ব্বদাই পূর্ব্বাশ্রমের সঙ্গে সম্বন্ধবর্জ্জিত। দীর্ঘকাল রোগশয্যায় ছিলেন। কোনো আত্মীয়কে কদাপি দেখিনি তাঁর শয্যা-পার্শ্বে। ভক্তদের সমাবেশও তাঁর গৃহে অনুপস্থিত ছিল। কারো বাড়ীতেই তিনি যেতেন না। এমন কি, শেষ বয়সে বিশ্রামের জন্যও সঙ্ঘের অন্য কোন আশ্রমে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। কলকাতা প্রধান কার্য্যালয়ের ত্রিতল গৃহে দু' একজন সেবককে নিয়ে নিজের ভাবে নিজে কাটিয়েছেন বছরের পর বছর।

আশাশুনিতে আট শত চরখায় সুতাকাটা হতো। সেই সুতা

যেতো বুধহাটার তাঁত শিল্পকেন্দ্রে। কাপড় বুনার সমস্ত তদারকির দায়িত্ব ছিল নন্দলালের উপর। তিনি ছয় সাত বৎসর কাল বুধহাটায় ছিলেন। ইতোমধ্যেই তাঁর সন্ন্যাস হয়ে যায় ইংরাজী ১৯২৭ সালে তা পূর্ব্বেই উক্ত হয়েছে।

বুধহাটা কেন্দ্র থেকে তিনি প্রেরিত হন সঙ্ঘের এক চারণদলে। সেখানেও তাঁর কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধীর স্থির মানুষটি কিছুকালের জন্য সঙ্ঘের এলাহাবাদ আশ্রমের কর্ম্মভারও গ্রহণ করেন শ্রীগুরুর আদেশ ও নির্দ্দেশে। অতঃপর তাঁর ডাক হয় সঙ্ঘের হিসাব বিভাগে। নিখুঁত নির্ভুল অঙ্ক কষার কার্য্যে ধীরানন্দজীর ন্যায় একজন স্থিরবুদ্ধি সাধুরই প্রয়োজন ছিল। শ্রীমৎ যোগানন্দজীর সহযোগী-রূপে এই বিভাগেও তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। বাং ১৩৪৯ সালে বিধ্বংসী ঝঞ্ঝার তাণ্ডবে লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা, সর্ব্ব-স্বান্ত, ফসলের ক্ষতিতে নিরন্ন। সঙ্ঘ থেকে মেদিনীপুরের সুতাহাটা, হোড়খালি, নন্দীগ্রাম, ২৪ পরগণার শিবকালী নগর এবং উড়িষ্যার নাম্পোতে সেবাকেন্দ্র খোলা হয়। স্বামী ধীরা-নন্দজী হোড়খালি কেন্দ্রে দেড় বৎসরাধিক কাল অবস্থান ক'রে বিপন্ন মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

সেবাব্রত দিয়েই আরম্ভ হয়েছিল তাঁর জীবন। এই সেবানিষ্ঠা অধ্যাত্মমুখী হয়ে শ্রীগুরুসেবার আকুতিতে সুন্দর হয়ে উঠে। আমরা দেখি ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গ সফর কালে নিদারুণ অসুস্থতা নিয়ে প্রাণারাম শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতা যখন কলকাতা প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক একান্ত শয্যাশায়ী, তখন সঙ্ঘের অন্যান্য প্রবীণ সাধুদের সঙ্গে স্বামী ধীরানন্দজী অনুক্ষণ শ্রীগুরুর শয্যাপার্শ্বে। নীরব নিষ্ঠায় অক্লান্ত ভাবে গুরুসেবায় প্রাণমন ঢেলে দিয়েছেন। অত বড় বিশালবপু শক্তিধর আচার্য্যদেবের শ্রীদেহ পাশ ফিরিয়ে দিবে কে? একমাত্র ধীরানন্দজীই সেইরূপ শক্তিমান সন্তান।

কিন্তু এই মানুষটিও ক্রমে বয়সের ধর্ম্মে বাতপীড়িত। ক্রমে

আরো অসুস্থ। তবে দীর্ঘ অবসর জীবনেও কর্ম্মশূন্য ছিলেন না। সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়ের দাতব্য চিকিৎসালয়টির কাজ দেখাশুনা করতেন। যতদিন উত্থানশক্তি ছিল ততদিন সান্ধ্য পূজারতিতে যোগদানে অবহেলা হয় নি। বহুমুখী প্রতিভার দাবিদার ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন কর্ম্মনিষ্ঠ এবং সাধুচরিত্র।

স্বামী নিখিলানন্দজী

"বাল্যকাল থেকেই স্বপ্ন ছিল—সংসারী হব না। দেশের, সমাজের, ধর্মের সেবা করবো, মস্ত শক্তিশালী হব। রামায়ণ, মহাভারত, কাব্যাদি থেকে বীরচরিত্র অধ্যয়ন করতাম, নিজেও নিয়মিত কুস্তি, ব্যায়াম, লাঠিখেলায় অভ্যস্ত ছিলাম এবং মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করে ব্রহ্মচর্য্য পালন ও শক্তি অর্জনের প্রেরণা অনুভব করতাম। কোনও শক্তিশালী ও বীর্য্যবান্ সাধু-সন্ন্যাসী ও মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার যদি হয় তবে তাঁর সান্নিধ্যে থেকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করবো—মনে মনে এই বাসনা ছিল উদগ্র"—

এই উক্তিগুলি যাঁর, তিনি আর ইহলোকে নেই। বাল্যের স্বপ্নকে জীবনের সাধনায় সফলতা দিয়ে গত ৪ঠা জুন, ১৯৮৬, বাংলা ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৩ তারিখে সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বলছি সংঘের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী নিখিলানন্দজীর কথা। তাঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা কিছু বক্তব্য, তা তাঁর নিজ উক্তিতেই প্রকাশ। তিনি সংসারী হন নি, দেশের, সমাজের, ধর্মের সেবা করেছেন। সন্ন্যাসী হয়েও বীর ছিলেন। ব্যায়ামপুষ্ট শালপ্রাংশু শরীরে ছিল অসীম শক্তি। সেই শক্তি নিয়োজিত হয়েছিল সঙ্ঘের উদ্দিষ্ট মানবকল্যাণ ব্রতে।

খুলনা জেলার অন্তর্গত নন্দনপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমিদারকুলে এই বীর সাধকের জন্ম। তিন মহল্লা প্রাসাদ, দুটি

কামান, ঝাড়-লণ্ঠনে সজ্জিত বিরাট বৈঠকখানা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরবারি স্বামীজীও দেখেছেন। কিন্তু তাঁর যখন জন্ম, তখন মজুমদার পরিবারের সে ঐশ্বর্য আর নেই। পড়তি অবস্থা। তিনি যখন মাতৃগর্ভে তখন মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে তদীয় পিতৃদেব সঞ্জীবকুমার মজুমদারের অকালবিয়োগ হয়। এটা মজুমদার পরিবারের আর এক বিপর্য্যয়। আত্মীয়-স্বজনেরা বংশরক্ষক একটি পুত্রসন্তানের কামনায় যখন আগ্রহব্যাকুল, তখন ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে বালবিধবা জননীর কোল আলোকিত ক'রে ভূমিষ্ঠ হয় এক নধরকান্তি দিব্য শিশু। বংশের সৃষ্টির ধারা রক্ষা হবে এই আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে নবজাতকের নামকরণ করা হয়—সৃষ্টিধর। কিন্তু কেউ কি ভেবেছিল, এই শিশু সাংসারিক সীমিত স্বার্থসাধনে জগতে আসে নি—সে এসেছে পরমেশ্বরের যে বিরাট সৃষ্টি তারই সেবায় আত্মোৎসর্গের জন্য। এই শিশু এক যুগন্ধর মহাপুরুষের চিহ্নিত পার্ষদ।

গ্রাম্য মাইনর স্কুলের পাঠ শেষ করে সৃষ্টিধর ভর্ত্তি হয় খুলনা জেলা স্কুলে। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠায় তার পূর্বসূরীদের দান আছে। স্বনামধন্য আইনতত্ত্ববিৎ ডঃ দুর্গাদাস বসু এই স্কুলের ছাত্র এবং তিনি সৃষ্টিধরের কিছু নীচু ক্লাসে পড়তেন। জেলা স্কুল থেকে পাশ করে সৃষ্টিধর কলকাতা চলে আসে স্যানিটারী ইন্সপেক্টরশিপ্ পড়তে। হিতার্থী স্বজনদের পরামর্শ—পাশ করলেই চাকুরী। কিন্তু এ চাকুরীও তার জন্য নয়। তার জন্য বিধাতা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন আরো মহত্তর চাকুরী। সে চাকুরীর হাতে খড়িও হয়ে যায় পাঠ্যদশাতেই।

১৯২২ খৃষ্টাব্দ থেকেই সৃষ্টিধর সঙ্ঘের খুলনা বেলফুলিয়া সেবাশ্রমের সঙ্গে যুক্ত। নন্দনপুর থেকে বেলফুলিয়া গ্রামটি অধিক দূর নয়। সুতরাং, যোগাযোগে কোন অসুবিধা ছিল না। সৃষ্টিধর প্রায়ই আশ্রমে আসে। আশ্রমের অনেক কাজে অংশগ্রহণ করে। গ্রামান্তর থেকে বাঁশ কেটে বহন করে আনে আশ্রমের ঘর তৈরীর

জন্য, আশ্রম-বিদ্যার্থীদের সঙ্গে রবিবার সহরে বেরোয় মুষ্টিভিক্ষা আদায়ে, আশ্রমের জঙ্গল কেটে সাফ করে দেয় নূতন দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিল্ডিং তৈরীর জন্য, আশ্রমাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী কুমুদ (পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ) মহারাজের সঙ্গে গ্রামান্তরে যায় প্রচার ও অর্থসংগ্রহে। আজোগোড়া গ্রামে গিয়ে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণের গালি খায়। আশ্রমে কোন জাত বিচার নেই। হিন্দুধর্ম গেল রসাতলে। "তুমি কেন হে বাপু, এদের সঙ্গে। তুমি না উচ্চ-বংশের সন্তান ?"—কেউ দিল না দু'মুঠো মধ্যাহ্নের অন্ন। দু' পয়সায় আটটি দয়া কলা (বিচে কলা) গলাধঃকরণ ক'রে দুটি প্রাণীর ক্ষুন্নিবৃত্তি। আশ্রম-জীবনে কত সংগ্রাম, কত কঠোরতা, কিরূপ ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা প্রয়োজন, তার স্বাদ সৃষ্টিধর পায় সেই ছাত্রজীবনেই। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলে এই ভাবে পাশাপাশি অধ্যয়ন ও সঙ্ঘসেবা। অতঃপর কলকাতা এসে কয়েক মাস মেসে থাকার কষ্টকর অভিজ্ঞতার পর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল, রবিবার সৃষ্টিধর বইপত্র ও বিছানাদি সহ চলে আসে সঙ্ঘের কলকাতা কার্য্যালয়ে। সংঘের কার্য্যালয় তখন ১৬২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে—ভাড়াটিয়া বাড়ীতে। বেলা তখন নয়টা। আচার্য্যদেব জনৈক আশ্রমসেবককে আদেশ দেন—"সৃষ্টিকে পান্তো ভাত খেতে দে।" পান্তোই ছিল তৎকালে আশ্রমের প্রাতরাশ। ঐ সালের জুলাই মাসে আশ্রম উঠে আসে ২৪।৩, মীর্জাপুর ষ্ট্রীটে—ভাড়া ১২৫ টাকা।

সৃষ্টিধর আচার্য্যদেবের প্রথম দর্শন করে খুলনা গান্ধী ময়দানে অনুষ্ঠিত এক ধর্মসভায়। প্রথম দর্শনেই অভিভূত। স্বামীজীর নিজ ভাষায়—"এই আমার প্রথম দর্শন। কি বিশালবপু! কি জ্যোতিঃপুঞ্জকলেবর! কি সুগোল, সুঠাম অঙ্গলাবণ্য! ঠিক যেন আমার কল্পনার দেবতা!" অতঃপর রাসপূর্ণিমা উৎসবোপলক্ষ্যে আচার্য্যের সাক্ষাৎ উপদেশ লাভ। একটি জপের মন্ত্রও দেন মহাপুরুষ। এক্ষণে কলকাতায় শ্রীগুরুর অতি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে

আসার সুযোগ লাভ। ছেলেটি অতি অনুগত, বাধ্য। আদেশমাত্র কর্ত্তব্যকর্ম্মে ঝাঁপিয়ে পড়ে বীর হনুমানের মত। আচার্য্যদেব বলেন—"সৃষ্টিকে আমি নিশ্চিন্তে আদেশ করতে পারি।" আচার্য্যদেব যুবাকে স্বহস্তে শিখিয়ে দেন কি ভাবে রবিবারের সঙ্ঘসেবক সম্মিলনীর জন্য হালুয়া ও খিচুড়ি প্রসাদ রান্না করতে হয়। তিনি তাকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবাসগুলিতে পাঠান তাদিগকে আচার্য্যের দিব্য সান্নিধ্যে এনে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ ও সাধনগ্রহণে আমন্ত্রণ জানাতে। আত্মহিতে অচেতন কিছু ছাত্র কেবল প্রত্যাখ্যান করে তা-ই নয়, বহু ক্ষেত্রে সাধু-সন্ন্যাসীদেরও নিন্দামন্দে মুখর হয়, এমন কি তেড়ে মারতে পর্য্যন্ত আসে। এক ধরনের জগাই-মাধাই। কিন্তু সম্ভ্রান্তবংশের শক্তিমান্ সন্তান সৃষ্টিধর ধৈর্য্যে অবিচলিত। তাদিগকে সাধ্যমত বোঝাতে চেষ্টা করে। এই সংগ্রামের জীবন তার ভালই লাগে। জয় হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। দলে দলে ছাত্ররা আসে—আচার্য্যের পূত সান্নিধ্যে। তখন তার কী আনন্দ!

আচার্য্যদেব একদা আদেশ করেন—"দুআনার কোমর নিয়ে আয়।" 'কোমর' কি? সৃষ্টিধর বিস্মিত! যখন জানানো হয় যে, ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার গ্রামের লোকেরা কুমরোকে বলে কোমর, তখন সৃষ্টিধরের কি হাসি! মহাপুরুষও হাসেন। এই সৃষ্টিধর এককালে কলকাতা আশ্রমের বাজার সরকার। দ্বিপ্রহর উত্তরণের পর বাজারের পরিত্যক্ত ও শুষ্ক তরি-তরকারী সস্তা দামে কিনে মাথায় বহন করে এনে আচার্য্যের সান্নিধ্যে উপস্থাপিত করা হয়। একদিন দত্ত মহাশয় (নিশিকান্ত দত্ত) তো রেগেই অস্থির। কতকগুলি শুক্নো, বুড়ো ঝিঙ্গে কিনে এনেছে বাজার থেকে। এ কি রান্না করা যায়? না, খাওয়া যায়? সঙ্ঘের প্রাথমিক জীবনে ঐগুলিই কিন্তু ছিল আশ্রমিকদের উপাদেয় খাদ্য! ডাল আর তরকারী দুটো একসঙ্গে বড় কেউ দেখে নি তখন। ডাল তো ছিল 'জলবৎ তরলম্'।

হাঁ, সৃষ্টিধর ছেলেটা কেবল কর্ম্মী নয়, সৎও বটে। স্যানিটারি কলেজে পড়তে যাওয়ার সময় আচার্য্যদেব তার হাতে কিছু 'সঙ্ঘবাণী' ও 'ব্রহ্মচর্য্যম্' প্রচার-পত্র দিয়ে দিতেন—মানুষদের ভিতরে বিতরণের জন্য। ওগুলির কোন মূল্য ধরা নেই। কিন্তু সৃষ্টিধর দুটি পয়সা ক'রে সঙ্ঘের জন্য সাহায্য চেয়ে নেয় প্রতিটি কাগজের জন্য। সব পয়সা এনে দেয় আচার্য্যচরণে। হিসাব-বহির্ভূত এ পয়সা সে ইচ্ছে করলে নাও দিতে পারে। আচার্য্যদেব অতি মাত্র প্রসন্ন—যুবকের এই সঙ্ঘহিতৈষণা ও সততায়। একদিন বড় একখানি খাতা তুলে দেন সৃষ্টিধরের হাতে। বলেন—"এতে যে সব নাম-ঠিকানা আছে তাঁদের বাড়ী তুমি যাবে, মাসিক চাঁদা নিয়ে আসবে।" নূতন দায়িত্ব পেয়ে সৃষ্টিধর খুশী। শ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দজী ঐ সব চাঁদা আদায় করতেন। তিনি এখন চারণদলে। তাই অনাদায়ী হয়ে পড়ে আছে অনেক টাকা।

চাঁদার হার কিন্তু অধিক নয়। অধিকাংশই দু'আনা, চার আনা, আট আনা। সাহিত্যাচার্য ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ নরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, চক্ষুচিকিৎসক ডঃ জে, এন, মৈত্র, এক্সাইজ কমিশনার রায় বাহাদুর তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিরা দিতেন মাসিক এক টাকা ; শ্রীকুমুদ বিহারী সেন (ব্যারিষ্টার শ্রীভোলানাথ সেনের পিতা) এবং শ্রীউপেন ঘোষের ন্যায় কিছু কিছু বদান্য ব্যক্তি ছিলেন যাঁদের নিকট থেকে মাসিক পাঁচ টাকা আদায় হতো। তখনকার দিনে এই টাকার মূল্যমান কিন্তু অনেক। বিদ্যার্থী সৃষ্টিধর প্রথম দিন ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের বাড়ীতে গিয়ে বৈঠকখানায় মাদুরে উপবিষ্ট সাদাসিধে মানুষটিকে দেখে ধারণাই করতে পারে নি, ইনি কে। গলায় পৈতা দেখে মনে করেছে—এ হয়তো বাড়ীর রান্নার ঠাকুর। "দীনেশ বাবু আছেন" প্রশ্নের উত্তরে মানুষটি বলেন—'আমিই দীনেশ বাবু। তুমি নূতন, তাই জান না। আমি রায় বাহাদুর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন।" আশ্রমে এলে আচার্য্যদেব বলেন—"মস্ত বড় বিদ্বান্ লোক। ওভাবে নাম ধরে

বলা তোমার ঠিক হয়নি। বলা উচিত ছিল—রায় বাহাদুর আছেন ?"

Sanitary Inspectorship এবং Hygiene পাশ করার পর চাকুরী হাতের মুঠোয়। কিন্তু না, চাকুরী সে করবে না। শ্রীগুরু-করুণায় বিষয়ের মোহ তিরোহিত। বিধবা জননীর বাৎসল্যও আর তাকে মুগ্ধ করে না। কিন্তু খুলনা আশ্রমের পাশের গ্রামের ছেলে। অগ্রজা ভগ্নী বিবাহিতা। সে-ই মায়ের একমাত্র বুকের ধন। সে যদি সংসারত্যাগী হয়, তবে আশ্রম সম্বন্ধে স্থানীয় মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না কি? লোকে বল্‌বে—সাধুরা ছেলেটাকে ফুস্‌লিয়েছে। আচার্য্যদেব বলেন—"যাও, বাড়ী যাও। মায়ের অনুমতি নিয়ে এসো।" কিন্তু জগতে এমন মদালসা মা ক'জন আছেন যিনি হাসিমুখে সন্তানকে সন্ন্যাসে পাঠাতে পারেন? মা জ্ঞানদাসুন্দরী তো কেঁদেই অস্থির। তাঁর মস্তকে যেন অকস্মাৎ সাতখানা আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। জড়িয়ে ধরেন জননী সন্তানকে। জ্ঞানদাকে কে আজ দিবে জ্ঞান? কে দিবে প্রবোধ? "আমি যদি আজই মরি, মাথা কুটে রক্তাক্ত হলেও আমাকে আর ফিরে পাবে কি? বাবাকে কি ফিরে পেয়েছ? বাধা দিওনা, মা! পায়ে ধরি! হাসি মুখে আশীর্ব্বাদ কর, যেন ধর্ম্মজীবনে সফল হই!"—মাকে সান্ত্বনা দিয়ে সৃষ্টিধর সোজা চলে আসে কলকাতা আশ্রমে—শ্রীশ্রীআচার্য্যের সন্নিধানে। আজ সৃষ্টিধর সর্ব্বমোহবন্ধনমুক্ত।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের বৌদ্ধ পূর্ণিমায় মাদারীপুর আশ্রমে সৃষ্টিধরের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য-সংস্কার লাভ। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঘী পূর্ণিমায় বাজিতপুর শ্রীশ্রীপ্রণবমঠে সন্ন্যাসাশ্রমের নূতন নাম হয়—স্বামী নিখিলানন্দ। তুচ্ছ সংসারবন্ধন অতিক্রম-পূর্ব্বক সৃষ্টিধর আজ নিখিল সৃষ্টির। ক্ষুদ্র জমিদার বংশের নন্দন আজ মহারাজ—নিখিলানন্দ মহারাজ। নন্দনপুরের পারিজাত ক্রমে ফুটে উঠতে থাকে—নূতন বর্ণে, নূতন সৌরভে, শ্রীগুরুর কৃপার

অরুণালোক-প্রসাদে, উত্থান-পতনের দ্বন্দ্বকে পৌরুষে জয়পূর্ব্বক। ১৯২২ খৃষ্টাব্দ থেকে যদি হিসাব ধরা হয় তবে সুদীর্ঘ ৬৪ বৎসর তিনি অনলস ভাবে সঙ্ঘের সেবাব্রত উদ্‌যাপন করেছেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল আশি ছুঁই ছুঁই।

পঞ্চম দলে যাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণকারী, স্বামীজী তাঁদের অন্যতম। কিন্তু অন্যান্য সহতীর্থের ন্যায় তাঁকে বাইরে যেতে হয় নি। শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব তাঁকে নিজের সান্নিধ্যেই রাখেন। মাসিক চাঁদা আদায় ছাড়াও কলকাতার চারণদলে নেতৃত্ব দেন প্রয়োজন বোধে। আচার্য্যদেব যেখানেই যান সেখানেই এই বলিষ্ঠ সাহসী, কর্ম্মঠ ও আজ্ঞাবহ সন্ন্যাসীর অনুগমন অপরিহার্য্য। বড় বড় মোটগুলি মাথায় বইছেন, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রমসাধ্য কাজগুলি উতরিয়ে দিচ্ছেন, আর নজর রাখছেন শ্রীশ্রীআচার্য্যের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও নিরাপত্তার উপর। বাজিতপুর উৎসবের মহানসের রান্নার নায়ক তিনি। 'কাণ্ডারী' তরণীর পিছনে বাঁধা ছিপ্ নৌকায় অন্ততঃ দু'শ লোকের রান্না হচ্ছে। কত অসুবিধা। এ কাজ করতে পারেন একজনই—তিনি স্বামী নিখিলানন্দ। হিন্দুসংগঠন কার্য্যের ব্যাপক প্রসারে শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব যখন নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, ঢাকা, যশোহর, খুলনা, রাজসাহী, রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি দুর্গত জেলাগুলিতে সফররত, তখন নিখিলানন্দজীর ন্যায় বীর সন্তান শস্ত্রধারীরূপে তাঁর দিব্য শরীরের সংরক্ষক। শিবসাগর সিংহের ন্যায় পালোয়ান স্বামীজীর সহকারী।

আমরা জানি—স্বামী নিখিলানন্দজী বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যসম্পৎ নিয়েই ভূমিষ্ঠ হন। বাল্যকাল থেকেই ব্যায়ামে অনুরাগী। যখন ছাত্র, তখন নিজ হাতে তৈরী দুটো মুগুর ঘুরাতেন, বড় একখণ্ড পাথর নিয়ে ভারোত্তোলনের কাজ করতেন, ডন-বৈঠক চলতো সমানে। সন্ন্যাস-জীবনেও শরীরচর্চা পরিত্যক্ত হয় নি। আচার্য্যদেব স্বয়ং উৎসাহদাতা। কলকাতা প্রধান কার্য্যালয়ে একটি আখড়া গড়ে

তুলেন স্বামীজী। বহু বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী যুবক ও কুস্তিগির এই আখড়ার নিয়মিত সদস্য। শিবসাগর সিং এবং রামবিলাসের ন্যায় পালোয়ানের সঙ্গে নিয়মিত কুস্তি লড়েন স্বামীজী। অচিরে 'পালোয়ান স্বামীজী' রূপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। লাঠি, ছোরা, তরবারির খেলা এবং যুযুৎসু প্রভৃতিতে সুদক্ষ স্বামীজী অনেক ছেলের শিক্ষাগুরু। তিনি যেখানেই যেতেন, দু'এক দিনের জন্যে হলেও, সেখানেই সর্ব্বাগ্রে মাটি খুঁড়ে তৈরী হতো কুস্তির জায়গাটি। সাধারণ নিরামিষ আহার্য্য গ্রহণ করে অমন পেশীবহুল শরীর গঠন কি সম্ভব? হাঁ, সম্ভব, যদি ব্রহ্মচর্য্য থাকে স্থির। যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের এই তো মহতী শিক্ষা।

অনেকের ধারণা—কুস্তি লড়িয়ে পালোয়ান যারা, তাদের শরীরটাই হয় পীবর, কিন্তু মেধার পুষ্টি হয় না। অধিক কি, শরীরে কুস্তির ঘুষি খেতে খেতে মাথাটাও হয়ে যায় ভোঁতা। কিন্তু না, একথা ঠিক নয়। ঘুষি খেতে খেতে সন্ন্যাসীর কান দুটো খুবড়ে গিয়েছিল, কিন্তু মাথা ভোঁতা হয় নি। অপরিসীম অধ্যয়নানুরাগ ছিল তাঁর। পুরাণো বই এর দোকান থেকে বহু দুষ্প্রাপ্য শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করেন। প্রচুর পড়াশোনায় অভ্যস্ত ছিলেন —বেদ-বেদান্তাদি নানা শাস্ত্র। স্মৃতিশক্তিও প্রখর। প্রচুর মুখস্থ করতে পারেন। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য গোটা পাণীনীয় ব্যাকরণ মুখস্থ হলো—হিন্দী শিখেন, উর্দ্দু শিখেন, বাংলা ও ইংরাজী তো আছেই। অধ্যয়ন করেন হোমিও চিকিৎসাবিজ্ঞানও। স্যানিটারী ইন্সপেক্টরশিপ্ পাশ করা মানুষটি হয়ে যান সার্টি-ফিকেটধারী পুরোদস্তুর ডাক্তার। নূতন অভিধা হয়—'ডাক্তার স্বামীজী'। মানুষের সেবায় নিয়োজিত হয় এই চিকিৎসাবিদ্যা। দুর্দান্ত অধ্যবসায়ী সন্ন্যাসী যখন যা ধরেন, তা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হন না।

বাগ্মী এবং সংগঠকরূপেও স্বামীজীর কৃতিত্ব স্মরণীয়। বীরধর্ম্মী এই সন্ন্যাসী বেদ-বেদান্ত-তন্ত্র-পুরাণাদি থেকে অজস্র

উদ্ধৃতি ও উপাখ্যান তুলে ধরে হিন্দুধর্ম্মে শক্তিবাদের বিষয় যখন ব্যাখ্যা করেন তখন শ্রোতৃমণ্ডলী সেই ওজস্বিনী ভাষণে ধর্ম্মীয় সাধনে নূতন আলোক পায়। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আত্মিক শক্তি চাই জাতির ধমনীতে ধমনীতে—আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের এই বাণীকে দেশময় বিকীর্ণ করেছিলেন যাঁরা স্বামী নিখিলানন্দজী তাঁদের অন্যতম। সঙ্ঘের সংগঠন আন্দোলনেরও তিনি একজন কৃতী নায়ক। অনেকগুলি হিন্দু-মিলন-মন্দির তাঁর সংগঠন-প্রতিভার সাক্ষ্য দিবে। যুক্তিতর্কের দ্বারা সঙ্ঘের ভাবকে প্রতিষ্ঠা দিতে তিনি কদাচ পশ্চাদপদ হন নি কোথাও। তার্কিককে তর্ক দিয়েই বুঝিয়েছেন—সঙ্ঘ কি চায়, সঙ্ঘের আদর্শ ও লক্ষ্য কি।

দৈনন্দিন জীবনে তিনি খুবই সরল, সহজ ও অনাড়ম্বর। মাসিক চাঁদা আদায় ক'রে আশ্রমে ফিরতে কখনো কখনো দেড়টা দুটো বেজে যায়। একদিন ভাত নেই। আচার্য্যদেব বলেন—"কেন, ডাল আছে না? পেট ভরে ডাল খেলেই তো ক্ষুধার শান্তি হয়।" অত বড় দেহী পালোয়ান মানুষটি অমন পরিশ্রমের পর বৈশ্বানর ক্ষুধার কালে শুধু ডাল খেয়েই কাটিয়ে দেন। চিত্তে তিল মাত্রও অপ্রসন্নতার চিহ্ন নেই। অল্পে পরিতুষ্ট। যে পান্তো কেউ খেতে চায় না, সেই পান্তো ভোজনে তাঁর তৃপ্তি অধিক। মাসিক চাঁদা আদায়ে শ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দজীর উত্তরসূরী সন্ন্যাসী সকালে উদরপূর্ত্তি পান্তো খেয়ে চার আনা, আট আনা, এক টাকা আদায়ের জন্য মীর্জাপুর থেকে যান—শিবপুর, শ্যামবাজার, কালীঘাট, ভবানীপুর, বালীগঞ্জে—প্রায়শঃ পায়ে হেঁটে। সঙ্ঘের সেই কৃচ্ছ্রের যুগের ইতিহাস ভাবতেও বিস্ময় লাগে!

আমরা দেখেছি, ছাত্রাবস্থায় ১৯২২ খৃষ্টাব্দ থেকেই স্বামী নিখিলানন্দজী (সৃষ্টিধর) সঙ্ঘের খুলনা আশ্রমের সঙ্গে কর্ম্মসূত্রে ও সাধনসূত্রে জড়িত এবং তাঁর তাৎকালিক ঘনিষ্ঠতা পূজ্যপাদ বড় স্বামীজীর সঙ্গে (তৎকালে ব্রহ্মচারী কুমুদ এবং উত্তরকালে শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ)। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রী-

আচার্যদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের পর পূজ্য বড় স্বামীজী সঙ্ঘের দ্বিতীয় সভাপতি পদে অভিষিক্ত। তখন দেখি—আরো নিবিড় ও অকপট ঘনিষ্ঠতা এবং নিঃশর্ত্ত আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে স্বামীজী সর্ব্বদা, সর্ব্বকার্য্যে সংঘের দ্বিতীয় সভাপতিজীকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করেন—তিনি তাঁর বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য পার্শ্বচর, জ্যেষ্ঠগুরুভ্রাতার আদেশ পালনে শিষ্যাপেক্ষাও তৎপর।

প্রচণ্ড শক্তিধর এই মানুষটি ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভোগেন দীর্ঘকাল। জীবনের কোন আশাই ছিল না। শরীর অস্থিকঙ্কালসার। যিনি বড় বড় পালোয়ানকে কুস্তিতে লড়ান, তাঁকে আজ পাশ ফিরিয়ে দিতে হয়—নিজস্ব শক্তি নেই। দৈহিক শক্তি কিরূপ অকিঞ্চিৎকর, জীবন-যৌবন কত ক্ষণভঙ্গুর, তা সাধক নিজ দৃষ্টান্ত থেকেই উপলব্ধি করেন। যমে-মানুষের সেই লড়াই-এর আমরা প্রত্যক্ষদর্শী। অবশেষে মানুষেরই জয় হয়। তাঁর আরো কাজ আছে। শ্রীগুরুর ইচ্ছাতেই সন্ন্যাসীর নব কায়কল্প। ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলনসই স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ-কর্ম্ম করছিলেন। ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। গৃহবন্দী অবস্থায় কয়েক বৎসর প্রারব্ধভোগ। এ অবস্থাতেও জ্ঞানানুশীলনে কিন্তু বিরতি ছিল না।

৪ঠা জুন সকালে নিজেই শৌচাগারে যান। অভ্যাস মত প্রাতরাশের পর বারান্দায় অনেকক্ষণ বসেন। দ্বিপ্রহরে রোগীর ভাবান্তর। ডাক্তার আসেন, ওষুধ দেন। অবস্থার উন্নতি লক্ষিত হয়। সন্ধ্যারাতে পুনরায় অবনতি। তখন মন্দিরে ভজন ও আরতির আনন্দ চলছে। আরতির শেষে রাত ৮টায় শ্রীগুরুচরণামৃত এনে রোগীকে দেওয়া হয়। সেবন করেন। তারপরই সাধকের নয়ন নিমীলন—ধ্যানমুদ্রা। সেই ধ্যান আর ভাঙ্গে না। তখন রাত ৮-২০ মিনিট।

স্বামী ত্রিলোচনানন্দজী

সেই নীল রঙের কোট পরা ছেলেটিই শেষে হলো গৈরিক রঙের সঙ্ঘ-সন্ন্যাসী।

সে ইং ১৯২৬ সালের কথা। বরিশাল জেলার কলসগ্রামের ছেলে ধীরেন্দ্র ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় এসেছে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য। সাধু হবার কোন মানসিকতা কদাপি তাঁর ভিতর উঁকি-ঝুঁকি দিত কিনা, সে ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। তবে নিশ্চয়ই তা জানতেন তাঁর আপন অন্তর্যামী পুরুষ। নইলে নীল রঙ্‌টা গৈরিক হয় কি প্রকারে?

সেদিন বৈকালে ধীরেন্দ্র তার বন্ধুদের নিয়ে মোটর রিজার্ভ ক'রে দলবেঁধে চলেছে গড়ের মাঠের দিকে—ফুটবল খেলা দেখতে। বিধির কি বিধান! গাড়ীটা হঠাৎ বিকল হয়ে পড়ে মীর্জাপুর ষ্ট্রীটে এসে। নিকটেই ২৪।৩ নং বাড়ীতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়। ত্রিতল বাড়ী। উপরের কোঠায় অবস্থান করেন সঙ্ঘের প্রাণপুরুষ আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। তিনি সহস্র সহস্র বালক, কিশোর, যুবককে, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রকে দর্শন, উপদেশ, দীক্ষা ও শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক তাদের নৈতিক জীবনের ভিত্তি গড়ে দিচ্ছেন। অবিশ্রান্ত চলেছে এই মহদ্‌ব্রত।

আশ্রমের দ্বারে দণ্ডায়মান স্বামী নিখিলানন্দজী। যুবক দলকে বললেন—'আপনাদের গাড়ী সারাতে তো সময় লাগবে। ততক্ষণ আসুন না আশ্রমে, মহাপুরুষের দর্শন ও আশীর্ব্বাদ নিয়ে যান।' যাদের মাথায় খেলা দেখার ঝোঁক, সাধু দর্শনে তাদের রুচি হবে কেন? কেউ রাজী, কেউ নিমরাজী। কিন্তু স্বামীজী ছাড়বেন না। অগত্যা কলরবে আশ্রম মাতিয়ে তুলে যুবার দল সাধুদর্শনে ত্রিতলে। কোন প্রকারে দর্শন ও প্রণাম সেরে তেমনি হৈ চৈ করতে করতে তারা নীচে নেমে আসে। আপন ভগবদ্ভাবে

অধিষ্ঠিত সর্ব্বদর্শী মহাপুরুষ কিন্তু এরই ভিতর চিনে নিয়েছেন স্বীয় চিহ্নিত উত্তর সাধককে। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর (হৃদয় মহারাজ) উপর আদেশ হয়, নীল রঙের কোট পরা ছেলেটির হাতে বিনা মূল্যে একখানি 'ব্রহ্মচর্য্যম্' বই দিতে এবং তাকে পুনরায় অবশ্য আশ্রমে আসতে।

ধীরেন্দ্র হতবাক্। এত ছেলে থাকতে শুধু তার প্রতি মহাপুরুষের এই অনুগ্রহ কেন? তাকে পুনরায় আশ্রমে আসতে আদেশ কেন? এই চিন্তার আলোড়ন অন্তরে নিয়েই সে খেলার মাঠে যায়, খেলাও দেখে। তারপর নিজ জীবনে কি রহস্যময় খেলা অপেক্ষা করছে তা দেখতে মাঠ থেকে ফিরার পথেই সরাসরি আশ্রমে। এবার একাকী।

যুবাকে সস্নেহে কাছে টেনে মহাপুরুষ বলেন—

"তোমার সংস্কার খুব ভাল। তোমার ভিতর অনেক গুণ আছে, যা লক্ষ ছেলের ভিতর খুঁজলে পাওয়া যায় না। তুমি ঠিক সময়েই আমার কাছে এসেছ। যাঁর ছেলে তাঁর কাছেই এসেছ। তোমার সঙ্গে এই আমার প্রথম দেখা নয়। তুমি নিজের ইচ্ছায় এখানে আস নি। ভগবান্ ঠিক সময় বুঝে তোমাকে এখানে এনেছেন।"

মুগ্ধ যুবক। বাঁধা পড়ে যায় যুগপুরুষের প্রেম, করুণা ও বাৎসল্যের নিবিড় নিগড়ে। তার জীবনে এই সম্বন্ধ অভাবনীয়। নিয়মিত আসা-যাওয়া হতে থাকে। কিন্তু ইতোমধ্যে এক বাধা। ধীরেন্দ্রের পিতা বিহারী লাল সেনের ইচ্ছা, ছেলে ঢাকা মেডিকেল স্কুলে গিয়ে ডাক্তারী পড়ুক। পিতার আদেশ রক্ষায় ছাড়তে হলো কলকাতা, যেতে হলো ঢাকা। প্রায় এক বৎসর পড়াও হয় ডাক্তারী। কিন্তু ভাল লাগে না। আচার্য্যদেবের ভাগবত আকর্ষণই আবার যুবাকে টেনে নিয়ে আসে কলকাতায় সঙ্ঘের মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের ছাত্রাবাসে। আশ্রয় পেয়ে ধীরেন্দ্র এবার ভর্ত্তি হয় যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। তিন বৎসর পড়া হয়। কিন্তু আসল পাঠ

দিতে থাকেন শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব—ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্যের পাঠ, সন্ন্যাস-জীবনের পাঠ, মৃত্যুচিন্তার ভিতর দিয়ে বিবেক-বৈরাগ্য লাভের পাঠ, আত্মনিষ্ঠা ও মানব কল্যাণব্রতের পাঠ। কলেজের তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা শেষ হতেই আচার্য্যদেব বলেন—"এই শিবরাত্রি দিনেই (১৯২৯) তোমার ব্রহ্মচর্য্য-সংস্কার হবে।" হয়েও গেল। নীল কোট পরা ছেলে ধীরেন্দ্র পরিধান করে গৈরিক বসন। অতঃপর ১৯৩১ (বাং ১৩৩৭) সালের মাঘী পূর্ণিমায় পুণ্যধাম বাজিতপুরে সন্ন্যাস লাভ। ধীরেন্দ্র পরিচিত হন স্বামী ত্রিলোচনানন্দ নামে। আজ তিনি নেই। ব্রহ্মচর্য্য-সংস্কারের কাল ধ'রে দীর্ঘ ষাট বৎসর অক্লান্ত ভাবে সঙ্ঘের সেবা ক'রে গত ২৮শে নভেম্বর (১২ই অগ্রহায়ণ), মঙ্গলবার, রাত্র ১০-১৫ মিনিটে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে পুণ্য প্রয়াগধামে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বহুদিন তিনি হাঁপানি রোগে ভুগছিলেন। স্বামীজীর জন্ম বাং ১৩১৩ সনের ১লা ভাদ্র। অতএব, মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি ৮৪ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন।

স্বামীজীর জীবন পর্য্যালোচনায় দেখা যায়—একদা শ্রীগুরুর কল্যাণকর তিরস্কারবাণীতে সন্তানের প্রাণে বড় দুঃখ বড় অভিমান। কিন্তু দুঃখ জানাবে কার কাছে? কাঁদতে কাঁদতে সন্তান পিতার স্নেহবক্ষেই পড়ে লুটিয়ে। করুণাময় পিতা আর কি স্থির থাকতে পারেন? দুই বাহু বাড়িয়ে বুকের ভিতরে আরো চেপে ধরেন অভিমানহত সন্তানকে, আশ্বাস ও সান্ত্বনাবাক্য বর্ষিত হয়। তার পর আসে শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ—"তুই যেখানে যাবি, সেখানেই বিজয়ী হবি, যে কাজে হাত দিবি, সে কাজই সফল হবে।" অপরূপ! অপরূপ! পরম দুর্লভ এই আশীর্ব্বাদ!*

শিষ্যের জীবনে শ্রীগুরুর এই অহেতুক প্রসাদ সফল হয়েছিল।

---

* শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ—শতরূপে, শত মুখে পুস্তকের ১ম খণ্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা ও ৩য় খণ্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠায় শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের সহিত স্বামীজীর জীবন সম্পর্কের আরো তথ্য জ্ঞাতব্য।

ধীমান্ এই সন্ন্যাসী যেখানে গেছেন, যে কাজে হাত দিয়েছেন, আপন যোগ্যতা, সুপ্রযুক্ত কৌশল ও বাক্‌বিন্যাসের দক্ষতায় সেখানে সে কার্যেই হয়েছেন বিজয়ী। প্রথমে শ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দজীর চারণদলের সেবকরূপে সুদূর করাচি পর্য্যন্ত পরিক্রমা করেন। পরে ঐ চারণদলের নেতৃত্ব অর্পিত হয় তাঁরই উপর। এই সূত্রে তিনি সারা উত্তর ভারতে সঙ্ঘের চারণদল সহ দীর্ঘকাল কার্য্য করেন। নাগপুর, রায়পুর, জব্বলপুর, বিলাসপুর, গণ্ডিয়া, ইয়ৎমল, চান্দা, ভাণ্ডারী, বিহারের প্রধান প্রধান সহর, আসাম ও উড়িষ্যার নানা প্রসিদ্ধ স্থান, শিলং, দার্জ্জিলিং, রংপুর, দিনাজপুর, কুচবিহার—কোথায় না গেছেন? চা-বাগানগুলি থেকে সঙ্ঘের কার্য্যে অর্থাদায়ের চেষ্টা তাঁরই প্রথম কৃতিত্ব। চা-বাগানের মালিকদের নিকট ইংরাজীতে লিখিত আবেদন পাঠিয়ে বিশেষ দান আদায় করতেন। দেশীয় রাজাদের কাছেও তিনি পৌঁছে যেতেন—নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে। সেখানেও তিনি সফল। এমন কি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকেও তিনি ভিক্ষা আদায় না ক'রে নিরস্ত হন নি। রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে শান্তিনিকেতন গড়ছেন। তাঁর নিজেরই অর্থের প্রয়োজন। তিনি সেবাশ্রমকে কি দিবেন? তাই ভিক্ষা চাইলে বলেন—"কাকের মাংস কি কাকে খায়?" প্রত্যুৎপন্নমতি সন্ন্যাসীর তাৎক্ষণিক উত্তর—"দাঁড় কাকে খায়।" কবি হেসে আকুল। পুত্রবধূকে ডেকে বলেন—"শুনছ, সাধু কি বলে? কাকের মাংস কাকে খায় না। কিন্তু দাঁড় কাকে নাকি খায়। কি আছে তোমার থলিতে, দাও সাধুকে।"

লোকব্যবহারে স্বামীজী ছিলেন সদা মুক্তপ্রাণ। সদাহাস্যময় এই মহাত্মার রসিকস্বভাব যে কোন মানুষকে অতি সহজে তাঁর কাছে টেনে আনতো। জীবনযাত্রা ছিল অতি সরল ও অনাড়ম্বর, কার্য্য ছিল অতি নিখুঁত, আর ছিল তাঁর আশ্চর্য্য ত্যাগ। পূজ্য বড় স্বামীজীর তিরোধানের পর প্রবীণতার ক্রমে সঙ্ঘের

প্রধান সম্পাদকের পদটি তাঁরই প্রাপ্য। কিন্তু স্বেচ্ছায় তিনি এই পদ ত্যাগ করেন। পাছে কারো মনে অন্য কোন প্রশ্ন জাগে, এজন্য প্রধান সম্পাদক নির্বাচনের প্রস্তাবটি তিনি অন্যের হাত থেকে টেনে নিয়ে নিজেই উত্থাপন করেন এবং তাঁরই নিকটতম অনুজ সংঘভ্রাতার অশেষ গুণের উল্লেখপূর্ব্বক তাঁকে এই পদ গ্রহণের অনুরোধ করেন। তিনি স্বয়ং থেকে যান যুগ্ম-সম্পাদক। সঙ্ঘের প্রবীণ ও নবীন সকল সাধুই সে দিন তাঁর এই আত্ম-ত্যাগে অতিমাত্র মুগ্ধ। পদের চেয়েও ত্যাগ অনেক উচ্চে, তা তিনি স্বীয় আচরণে দেখিয়ে দেন—সঙ্ঘে এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়।

১৯৫৮ সালে চারণদল থেকে অবসর নিয়ে স্বামী ত্রিলোচনানন্দজী তিন বৎসর ছিলেন সঙ্ঘের পুরী আশ্রমের অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিয়ে। অতঃপর তাঁর উপর সঙ্ঘের প্রয়াগ আশ্রমের ভার অর্পিত হয়। গত ২৮ বৎসর তিনি এই আশ্রমের দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন। তাঁর কার্য্যকালে প্রয়াগ সেবা-শ্রমের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটে। সবই স্বামীজীর নিজ উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধানে হয়েছে। অনলস এই কর্ম্মযোগী অসুস্থতার কালেও কদাপি বিশ্রাম চাননি। তিনি জানেন—সন্ন্যাসীর বিশ্রাম একদিনেই হয়। তাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি সঙ্ঘের সেবা করে গেছেন অকপট নিষ্ঠায়। এই মহাপ্রাণ মহাত্মার উদ্দেশ্যে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি!

সঙ্ঘের কলিকাতা ও প্রয়াগ আশ্রমে যুগপৎ স্বামীজীর স্মৃতিচারণ উৎসবে অগণিত ভক্তের সমাবেশ ঘটে। প্রয়াগে সাধুভাণ্ডারাও হয়।

স্বামী আত্মরূপানন্দজী

সঙ্ঘের আর একজন ত্যাগী সন্তান ইষ্ট শ্রীগুরু-চরণে নিত্য আশ্রয় লাভ করিলেন। আর একটি কর্ম্মময় ও সাধনময় জীবনের পূর্ণাহুতি হইল। গত ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৮২ (বাং ১৭ই আশ্বিন, ১৩৮৯) সোমবার সকালে কলিকাতার রামরিকদাস হরলালকা হাসপাতালে আরাধ্যের আশীর্বাদীয় পুষ্প শিরে ধারণ করিয়া স্বামী আত্মরূপানন্দজী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। গত ২৬শে সেপ্টেম্বর ষ্ট্রোক হইলে অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহাকে মালদহের নার্সিং হোমে ভর্ত্তি করা হয়। কিন্তু জ্ঞান আর ফিরিয়া আসে না। অবশেষে স্বামীজীকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিয়া গত ২রা অক্টোবর উক্ত হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। একুনে ৯ দিন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন। চিকিৎসকদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। মৃত্যুকালে স্বামীজীর বয়স হইয়াছিল ৭৭ বৎসর। প্রায় এক বৎসর পূর্বে প্রথম ষ্ট্রোকে তাঁহার একাঙ্গ অবশ হইয়া যায়। কিন্তু সে যাত্রা তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল।

ইং ১৯২৪ সন। সেই বৎসরই শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব প্রয়াগকুম্ভে স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং মাঘী পূর্ণিমায় সঙ্ঘের প্রথম স্তরের সাতজন সংসারত্যাগী সন্তান সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হন। শ্রাবণের ভরা বর্ষায় এক ব্রাহ্মণের সন্তান বাজিতপুর প্রণবমঠে উপস্থিত। তারিখটা ছিল ১৯শে শ্রাবণ, শনিবার।

যুবার বয়স ঊনিশের মত। সংসারে তাঁহার বিরাগ। যুগ-প্রবর্তক মহাযোগীর শরণাগত হইয়া যুবা চায় অধ্যাত্মজীবন যাপন করিতে, আর্ত্ত মানবতার সেবা করিতে। যুবার নাম হরিচরণ, উলপুর (ফরিদপুর) গ্রামের জগদানন্দ চক্রবর্ত্তীর তনয়। সংসারী জগদানন্দ পুত্রকে জাগতিক জীবনের যে পাঠ পড়াইতেন তাহা তাহার মনঃপূত নয়, তাই লোকোত্তর পুরুষ প্রণবানন্দের আশ্রয় গ্রহণ। ইং ১৯২৬ সনের মাঘী পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীপ্রণবমঠে হরিচরণের

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য সংস্কার হইয়া গেল। ছেলেটি ভালই। বিনীত, কর্মঠ, বৈরাগ্যবান্, আনুগত্যপরায়ণ। প্রসন্ন শ্রীগুরু ইং ১৯৩১ সনে (বাংলা ১৩৩৭) মাঘী পূর্ণিমায় তাহাকে দিলেন সন্ন্যাস দীক্ষা। সঙ্ঘের ষষ্ঠ দলে যাঁহারা সন্ন্যাসপ্রাপ্ত, স্বামী আত্মরূপানন্দজী তাঁহাদের অন্যতম।

প্রথম জীবনে স্বামীজী এক চারণদলের সহকারীরূপে অতিবাহিত করেন। উক্ত চারণদলের অধিনায়ক ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজ। এই চারণদলের সহিত তিনি বাংলা, বিহার প্রভৃতি প্রদেশের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত যান। ইং ১৯৩৮-৩৯ সনে কলিকাতার এক চারণদলের নেতৃত্ব পদেও কিছুদিন তাঁহাকে দেখা গিয়াছে। এই সময় এক কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের তাণ্ডব বাংলার হিন্দুর জীবনকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেব পল্লীতে পল্লীতে হিন্দু মিলন-মন্দির ও রক্ষিদল গঠন করিয়া বিপন্নদের ভিতরে সংগঠন ও আত্মরক্ষার বীর্য্য সঞ্চারে চেষ্টিত। সঙ্ঘের অন্যান্য বহু কৃতী সন্ন্যাসীর সহিত স্বামী আত্মরূপানন্দজীও পূর্ব বাংলার নানা অঞ্চলে সংগঠন কার্য্যের দায়িত্বে ব্রতী হন। মালদহের বারঘরিয়া গ্রামে ৬৯ জন হিন্দুনারীর ধর্ষণ ও ধর্মান্তরের শোকাবহ ঘটনাটি তিনিই সংগ্রহ করিয়া আনিয়া সঙ্ঘের গোচরীভূত করেন। ঐ সংবাদ দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হইলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। নারায়ণগঞ্জের হাজরা ক্লাবকে কেন্দ্র করিয়া ঢাকা জেলার পল্লীতে পল্লীতে তিনি সংগঠন কার্য্যোপলক্ষ্যে পরিক্রমণ করেন। রায়পুর থানার দাঙ্গাবিধ্বস্ত হিন্দুদের পার্শ্বে সাহায্য বিতরণে ও সাহস সঞ্চারে তাঁহার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সঙ্ঘ এবং সঙ্ঘনেতার আদেশে অতিশয় দুরূহ কার্য্য সাধনেও তিনি অকুতোভয়।

অতঃপর আর্ত মানবতার সেবাব্রতে স্বামীজীর আন্তরিকতা ও অনলস শ্রম আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইং ১৯৪২ সনের অক্টোবরে

মেদিনীপুরের উপর দিয়া প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা বহিয়া যায়। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল, তমলুক, কাঁথি প্রভৃতি থানার বহু অঞ্চল ভূমিস্যাৎ এবং বহু প্রাণহানি ঘটে। ২৪-পরগণা এবং ওড়িশার কোন কোন অঞ্চলও দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত। সঙ্ঘ হইতে মেদিনীপুর, ২৪-পরগণা ও ওড়িশার বেশ কয়েকটি বিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবাকেন্দ্র খোলা হয়। একটি কেন্দ্র ছিল মেদিনীপুরের দুর্গাচকে ১০নং ইউনিয়নে। স্বামী আত্মরূপানন্দজী এই কেন্দ্রটির ভার লইলেন। অনূ্যন ১৭টি গ্রামের নিরন্ন মানুষকে ২ শত মণের অধিক চাউল প্রতি সপ্তাহে বিতরণ করা হইত। কাপড়, কম্বল, পোষাক, বিছানা, বেতের ধামা, দুধ, ঔষধপথ্য প্রভৃতিও প্রভূত পরিমাণে বিতরণ করা হয়। বন্যায় কলুষিত পুষ্করিণীগুলির সংস্কার করা হয়। ইং ১৯৪৭ সনের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত এই সকল কার্য্য চলিয়াছিল। স্বামীজী তাঁহার কর্তব্য পালনে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁহার চেষ্টায় দুর্গাচকে একটি হিন্দু মিলন-মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার পর হোড়খালি আশ্রমের ও তৎপরে পুরী শাখার পরিচালনায় তিনি কিছুদিন নিয়োজিত ছিলেন। অতঃপর মালদহে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। স্বামী আত্মরূপানন্দজীর চেষ্টাতেই মালদহ-শহরের অপর পাড়ে মহানন্দার তীরে সাহাপুর গ্রামে একখণ্ড জমি সংগৃহীত হয় এবং তথায় সুন্দর আশ্রম গড়িয়া উঠে। প্রতি বৎসর বাসন্তী পূজার উৎসবে সহস্র সহস্র মানুষের সমাগম হইয়া থাকে। এই আশ্রম হইতে পল্লী অঞ্চলেও সেবা ও সংগঠন কার্য্যের সম্প্রসারণ হয়। ইং ১৯৭২ সালে স্বামীজী সঙ্ঘের পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য মনোনীত হন।

সাধুর জীবন সংগ্রামময়। সংগ্রামই সাধনা। এই সংগ্রামে সাময়িক পরাজয়কে পর্য্যুদস্ত করিয়া আবার সাধককে চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। এই সাধনসংগ্রামে আত্মবীর্য্যের প্রসাদ অবশ্যই চাই, আর চাই শ্রীগুরুকৃপা। স্বামীজী এমনি এক

সংগ্রামী সাধক। গাহিতে জানিতেন। সুন্দর কণ্ঠ ছিল। সারা দিবসের কর্ম্মাবসানে ইষ্টের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন হইত ভজন-সঙ্গীতে, পূজায়, আরতিতে, ধ্যানজপে। সরল ও অনাড়ম্বর জীবনচর্য্যার ভিতর দিয়া সারাটি জীবন কাটাইয়াছেন। তাঁহার তিরোধানে সঙ্ঘ একজন কৃতী সন্তানকে হারাইল।

কলিকাতা প্রধান কার্য্যালয়ে ও মালদহ আশ্রমে স্বামীজীর প্রয়াণে স্মৃতিতর্পণ করা হয়।

স্বামী ত্র্যম্বকানন্দজী

সঙ্ঘের এক পাগল সাধক চলিয়া গেল। অপ্রাকৃত পাগল। শ্রীগুরুর মহাপ্রেমে আত্মহারা, মাতোয়ারা ভাবপাগল। আরাধ্য শ্রীগুরুর লীলাকথা কহিতে পাগল, শুনিতে পাগল। শ্রীগুরুর নাম ও শ্রীগুরুর আরতি-রসে প্রেমাবিষ্ট হইয়া নাচিতে পাগল, নাচাইতে পাগল। তদীয় আদিষ্ট ও উদ্দিষ্ট ব্রতসাধনে যে কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নির্দ্বিধায় জীবন দিতে পাগল। সাধকের সকল ভাবোন্মাদনাই শ্রীগুরুকেন্দ্রিক, ইষ্টকেন্দ্রিক। আরাধ্যের মহাভাবে এমন পাগল সাজিতে কাহার প্রাণে না সাধ জাগে?

সন্ন্যাসের নাম—স্বামী ত্র্যম্বকানন্দ। বয়স হইয়াছিল ৮১। শেষ জীবনে থাকিতেন সঙ্ঘের হরিদ্বার আশ্রমে। হাড়-কাঁপানো শীতের কয়টা দিন কাটাইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন কলিকাতা। সুস্থ মানুষ। বার্দ্ধক্য ব্যতীত তেমন উপসর্গ নাই। প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে ধ্যান, ভজন, উপাসনা করেন। গত ৫ই জানুয়ারী তারিখেও যথারীতি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়াছেন, প্রাতর্বন্দনা সারিয়াছেন, অভ্যাসমত ডাইরি বুকের এক পাতা ভরিয়া 'হরিঃ ওঁ শান্তিঃ—শ্রীগুরুকৃপা হি কেবলম্' লিখিয়াছেন, তাহার পর ৬টায় গিয়াছেন প্রয়োজনের তাগিদে পুনঃ শৌচাগারে

সেখানেই মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যান। শয্যায় আনিয়া শোয়ানো হয়। বলেন ঠাকুরের নাম লেখা খাতাটি মাথায় ঠেকাইতে। তাহা করা হয়। অল্পক্ষণের ভিতরেই রুদ্ধবাক্ এবং সংজ্ঞাহীন। কলিকাতা ন্যাশনল্ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। Cerebral Thrombosis। চিকিৎসা চলে। কিন্তু আর ফিরিলেন না; তিন দিবস অচৈতন্য অবস্থায় থাকিয়া গত ৭ই জানুয়ারী, ১৯৮৪, বাংলা ২২শে পৌষ, ১৩৯০ সালে রাত্র ২-৩৫ ঘটিকায় প্রয়াণ করিলেন নিত্য চৈতন্যলোকে—শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্মে।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে রাজশাহী কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক ছাত্র শ্রীউপেন্দ্রকুমার। পিতা গিরীশচন্দ্র সাহা সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। পৈতৃক পল্লী—আলোকপাড়া, থানা—বেগমগঞ্জ, জেলা—নোয়াখালি। উপেন্দ্রকুমার সঙ্ঘের স্থানীয় বিদ্যার্থিভবনেই থাকিতেন। ইং ১৯৩০ সালে তিনি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে সর্বত্যাগী সেবকরূপে যোগদান করেন। ইং ১৯৩১ সালে কাশীধামে মহানবমী তিথিতে তাঁহার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য সংস্কার লাভ। ঐ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দেই মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে বাজিতপুর ধামে সন্ন্যাস-প্রাপ্তি। আলোক-পাড়ার আলোক উপেন্দ্র হইলেন স্বামী ত্র্যম্বকানন্দ। ভোলা পাগ্লার নামেই দয়াময় শ্রীগুরু তাঁহার অধ্যাত্ম নামকরণ করিয়াছিলেন। রাজশাহী ছাত্রাবাসে অবস্থানকালে সাধনজীবনে কখনো সারারাত্রি শ্মশানে বসিয়া কাটান, কখনো পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসিয়া ধ্যান-ভজন, কখনো মৃতের খর্পর হস্তে আরতির রুদ্রতালে তাণ্ডব নৃত্য, আর দরাজ গলা চড়াইয়া ভুবন কাঁপানো গান—"জয়, জয়, জয়, গুরুজী কি জয়!" সারাটি জীবনই তাঁহার এই ভাব। কখনো দেখিয়াছি সারা অঙ্গে ভস্মবিভূতি মাখিয়া ব্যাঘ্রাম্বর পরিয়া ত্রিশূল হস্তে শিব সাজিয়াই বসেন। কিন্তু সম্মুখে শ্রীগুরুর পূজার আসনখানি থাকে মনের মত করিয়া সাজানো। আর ঐ আসনের সম্মুখেই সাঙ্গোপাঙ্গো লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া শ্রীগুরুকীর্তন, নর্তন-কুদন, আর শ্রীগুরুর

আরতি-পূজায় নিঃশর্ত আত্ম-নিবেদন। নিজেকে হারাইয়া ফেলেন শ্রীগুরুর মহাভাবে অমৃতসত্তায়। অনির্বচনীয় আনন্দ পরিবেশে। আপনি ডুবিয়া যান, ভক্তজনকেও ডুবাইয়া দেন। এই পাগল তাই শত শত ভক্তের একান্ত প্রিয়জন। সকলের আদরণীয়, সকলের বরণীয়। আর তিনিও বড় প্রেমিক পুরুষ। মানুষকে এমন করিয়া ভালবাসিতে পারে কয় জনে? প্রীতির আবেগে যেন গলিয়া যান, ঢলিয়া পড়েন। পঞ্চম বর্ষীয় শিশুকে সম্বোধন করেন— 'আপনি'। আবার পঞ্চাশ বৎসরের ঊর্দ্ধ্বের বয়োবৃদ্ধকেও—'তুই'। নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমের এই চিত্তহারিণী মধুরিমা মানুষ মাত্রকেই মুগ্ধ না করিয়া পারে না। গুরুভ্রাতাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই প্রেমবিহ্বলতা। সহতীর্থ হইলে গলা জড়াইয়া ধরেন, নিবিড় আবেশে বুকে টানিয়া লন, কনিষ্ঠ হইলে মস্তক আঘ্রাণ করেন, জ্যেষ্ঠ হইলে পা দুখানি মাথায় তুলিয়া লন, আর প্রাণ উজাড় করিয়া কহেন প্রাণের কথা; শ্রীগুরুর প্রসঙ্গক্রমে কখনো বা ভাবাবেগে কাঁদিয়াই ফেলেন।

একবার এক ভক্তিলিপি পাঠান শ্রীগুরুর শ্রীচরণে। নিবেদনের নীচে একই হস্তের তিনটি স্বাক্ষর—'তিন বোকানন্দ', 'তিন বকানন্দ', 'তিন বাঁকানন্দ'। নূতন নামাবলী। হাসির কথা বটে। এত যে গম্ভীরমূর্তি আচার্যদেব, তিনিও না হাসিয়া থাকিতে পারেন নাই। নিকটস্থ সন্তানদিগকে চিঠি দেখাইয়া বলেন—"দেখ, ত্র্যম্বকানন্দের কাণ্ড! মাথাটা কি গেল?" মুখে যাহাই বলুন অন্তরে কিন্তু প্রসন্নতার স্বতঃস্ফূর্তি। অন্তর্যামী ঠিকই বুঝিয়াছেন—পাগলের কি ভাব, কি তাহার নামাবলীর আসল ভাষ্য। হাসি নয়, প্রাণের সাত্ত্বিকী আর্তি।—ঠাকুর, এত আদর করিয়া নাম রাখিলেন, কিন্তু নামের যোগ্য হইতে পারিলাম কৈ? তোমাকে এত কাছে পাইয়াও স্বরূপে চিনিলাম না, চিরদিনের তরে বোকাই থাকিয়া গেলাম। তোমার প্রসঙ্গে এত মধু, কিন্তু অবোধ রসনা শুধু বাজে কথা বকে। আর এই দুষ্ট মনে কত সংশয়, কত

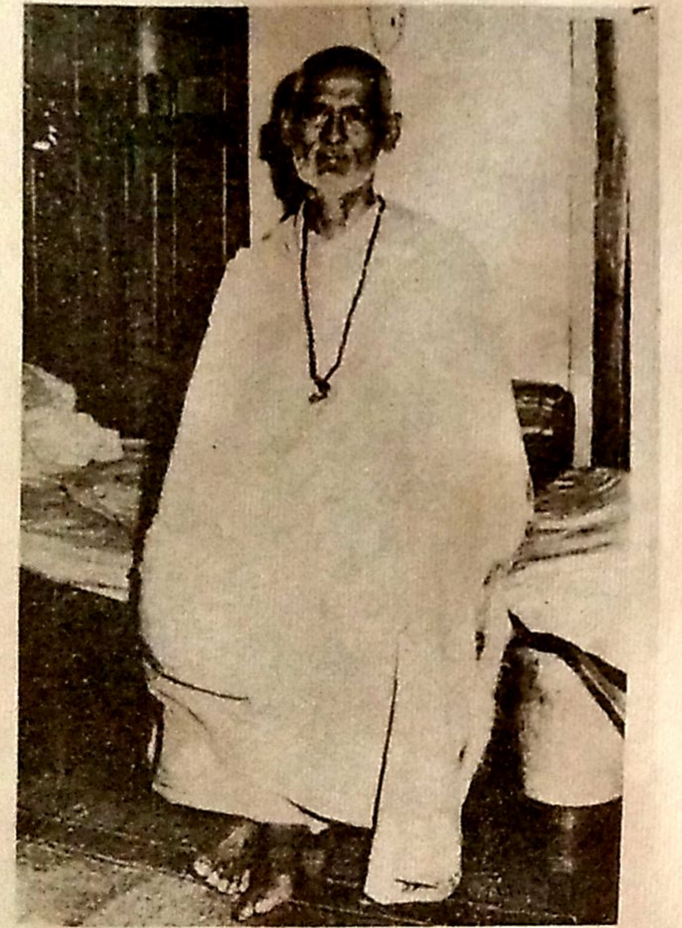
সন্দেহ, কেবলই সে বাঁকা পথ ধরিয়া চলিতে চায়। ত্রিমুখী আবল্যে ত্র্যম্বকের তিনটি নয়নই অন্ধ। হে কৃপাময় শ্রীগুরো! এই অজ্ঞানান্ধ ত্রিনয়ন তুমি বিনে আর কে উন্মীলন করিবে?

এই মরমী সঙ্ঘসাধককে আমরা ভুলিব না। তাঁহার জীবনা-লেখ্যের পাতায় পাতায় এমন কত ঘটনার রঙিন্ স্মৃতিই আঁকা রহিয়াছে, যাহা স্মরণে মননে আসিলে চিত্ত এমন এক চেতনার ভূমিতে চলিয়া যায় যেখানে আছে শ্রীগুরুভক্তি ও শ্রীগুরুগত-প্রাণতার অমৃতস্পর্শ। স্বামীজীকে শির নোয়াইয়া প্রণাম করি আর তদুদ্দেশ্যে নিবেদন করি অন্তরের অফুরন্ত শ্রদ্ধার অর্ঘ্য। তাঁহার তিরোধানে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নয়। .যুগভগবান্ আচার্য্যদেব তদীয় মহাভাব ও মহাশক্তির অমোঘ স্পর্শ দিয়া এক একটি আধারকে এক এক ভাবে গড়িয়াছেন। তাই একের সঙ্গে অন্যের হুবহু তুলনা হয় না। আপন বৈশিষ্ট্যে সকলেই সুন্দর। কেহ স্বামীজীকে ভুল বুঝিয়া অন্যরূপ আচরণ করিলে শ্রীশ্রীআচার্য্যের আশ্বাসবাণী বর্ষিত হয়—"তোরা আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। চোখ, কান, নাক, মুখ। চোখ কানের মর্ম কী বুঝে? কান চোখের মর্ম কী বুঝে? হাত, পা, নাক, মুখ প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র উপযোগিতা আছে। তোদের সকলকে নিয়াই আমি। সকল ভাব আমারই অভিপ্রেত।" ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ভক্তের পূজার স্বীকৃতি এমনি করিয়াই দিয়াছেন।

এই ভাবুক সাধকের কর্মজীবনও ছিল অনবদ্য। সমগ্র জীবন তিনি নানা ভূমিকায় কার্য্য করিয়াছেন। কর্ত্তব্য পালনে কোন শৈথিল্য, অনীহা, অমনোযোগ, অবাধ্যতা কেহ দেখেন নাই। রাজশাহী ছাত্রাবাসে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি স্থানান্তরিত হন সঙ্ঘের এক বিশিষ্ট চারণদলে। বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাটের বহু স্থানে কিছুকাল অতিবাহিত হয়। অন্য এক চারণদলের সহিত দক্ষিণ ভারতেও পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি এক সময় নিজেও এক চারণদল গড়িয়া বঙ্গদেশের নানা স্থানে

প্রচার ও অর্থসংগ্রহ কার্য্যে রত ছিলেন। ইং ১৯৪৮ সালে সঙ্ঘপ্রেরিত সাংস্কৃতিক মিশনের অন্যতম সদস্যরূপে তিনি পূর্ব আফ্রিকার নানা স্থানে পরিক্রমণ করেন। ১৯৪২ সালের ঘূর্ণি-বাত্যা ও বন্যায় ওড়িশার নাম্পোতে সেবাকেন্দ্র স্থাপিত হইলে স্বামী ত্র্যম্বকানন্দজী উহার ভারপ্রাপ্ত হন এবং দুঃস্থ নরনারীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। বাং ১৩৪৮ (ইং ১৯৪১) সালে নোয়াখালির জ্যৈষ্ঠের ঝড় ও বন্যায় স্বামীজীই ছিলেন দুর্গত হিন্দু-মুসলমান সর্বশ্রেণীর মানুষের পাশে সঙ্ঘের পক্ষ হইতে নিরলস সেবাব্রতীর ভূমিকায়। দালালবাজারে ছিল প্রধান সেবাকেন্দ্র। সঙ্ঘের পুরী তীর্থাশ্রমের অধ্যক্ষরূপে স্বামীজীর কয়েক বৎসরের অক্লান্ত সেবা আজিও স্মরণে পড়ে। শেষ জীবনে তিনি হরিদ্বার তীর্থাশ্রমের প্রবীণ তত্ত্বাবধায়করূপে সহকর্ম্মিগণকে পরামর্শ ও সহায়তা দান করিতেন।

স্বামীজীর সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহ ও কৃতিত্ব দেখা গিয়াছে হিন্দু-সংগঠন কার্য্যের বিপদসংকুল ক্ষেত্রসমূহে। এই কার্য্যে তিনি যে অসম সাহসিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। স্বামীজীর চরিত্রে ভক্তির সহিত শক্তির অপূর্ব মণিকাঞ্চন যোগ ঘটিয়াছিল। তখন বঙ্গভূমিতে মুসলিম লীগের প্রচণ্ড দৌরাত্ম্য। হিন্দুর ধন, মান, প্রাণ, ধর্ম, স্বার্থ ও অধিকার বিশেষ ভাবে বিপন্ন। হিন্দুর এই জাতীয় সংকটের দিনে সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেব সারা বাংলায়—বিশেষতঃ পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে হিন্দু মিলন-মন্দির ও রক্ষিদল গঠন আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়া হিন্দুদের ভিতরে সংহতি ও আত্মরক্ষার সামর্থ্য জাগাইয়া তুলিতেছেন; দুর্বল, ভীরু, পলায়নপর হিন্দুদের মধ্যে সাহস, বীর্য্য, শক্তির চেতনা সঞ্চার করিতেছেন। রাজশাহী জেলার ভার পড়িয়াছে তত্রত্য বিদ্যার্থিভবনের তাৎকালিক অধ্যক্ষ স্বামী কৃষ্ণানন্দজীর উপর। তাঁহার প্রধান সহকর্মী ত্র্যম্বকানন্দজী। উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় চিঠামারী, ট্যাংরামারী, চরহরিপুর,



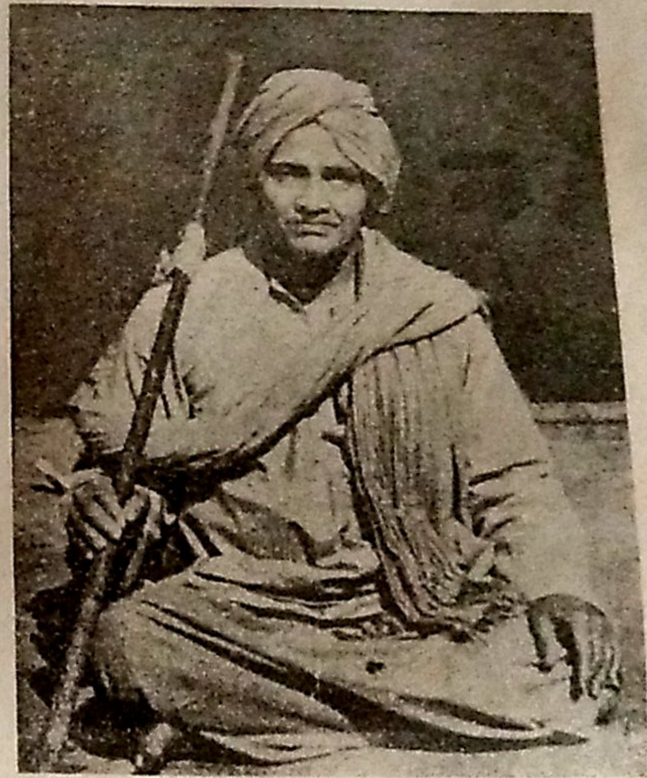
শ্রীমৎ স্বামী বীরেশানন্দজী মহারাজ



শ্রীমৎ স্বামী ত্রিদশানন্দজী মহারাজ



শ্রীমৎ স্বামী সুরেশ্বরানন্দজী মহারাজ



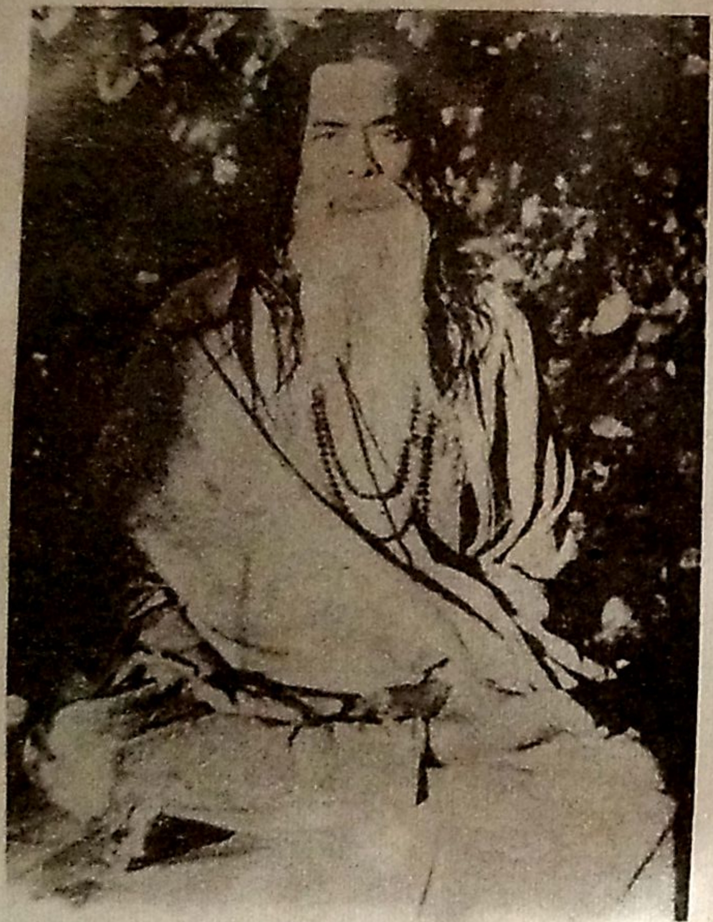
শ্রীমৎ স্বামী অনন্তানন্দজী মহারাজ



শ্রীমৎ স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজী মহারাজ



শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্বরূপানন্দজী মহারাজ


শ্রীমৎ স্বামী সর্ব্বানন্দজী মহারাজ


শ্রীমৎ স্বামী ত্র্যম্বকানন্দজী মহারাজ

নবাবগঞ্জ, গুরুদাসপুর, খোদ্দর্গোবিন্দপুর, ওয়ালিয়া প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য পল্লীতে হিন্দু মিলন-মন্দির ও রক্ষিদলের শাখা স্থাপিত হইয়াছে। সর্বত্র বৈদিক যজ্ঞ, রক্ষিদলের ক্রীড়ানুষ্ঠান, ধর্মীয় সভা প্রভৃতির মাধ্যমে সহস্র সহস্র হিন্দু সংগঠিত হইতেছে। জিওলমারী, ইদলপুর, পাথরঘাটা, মহানাল, দমদমা, দিঘীরপাড়, খেতুর প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য সাঁওতাল পল্লীতে এই সংগঠনের ঢেউ বহাইয়া সহস্র সহস্র উপজাতীয়কে হিন্দুত্বের চেতনা দিয়া তাহাদিগকে মিশনারীদের উপদ্রব হইতে রক্ষা করা হইতেছে এবং বিশাল হিন্দু সমাজের মূল প্রবাহের সহিত তাহাদিগকে যুক্ত করিয়া নিয়া হিন্দুর আত্মরক্ষার শক্তি বৃদ্ধি করা হইতেছে। সঙ্ঘায়োজিত যাবতীয় অনুষ্ঠানে শত শত উপজাতীয় একত্রিত হয় —তীর, ধনুক, টাঙ্গি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া এবং মাদল, নাগারা, কাঁস, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বহন করিয়া। এই প্রমথ সৈনিকগণকে পাইয়া ত্র্যম্বকের আনন্দের পরিসীমা নাই। তিনিও হস্তে তুলিয়া লয়েন মহিষবলির এক ওজনদার মহাখড়্গ। জটাধর শিব সাজেন। বলিষ্ঠ বাহুতে ঐ মহাখড়্গ অক্লেশে আন্দোলিত করিয়া যেন ভূতনাথ বীরদর্পে প্রলয়নৃত্য করেন, আলীঢ়পদে অরাতিনাশের ভঙ্গি প্রদর্শিত হয়, যজ্ঞভূমিতে প্রোথিত কদলীবৃক্ষগুলিকে খড়্গাঘাতে ভূপাতিত করিয়া দেখানো হয় এই ভাবেই যুগে যুগে রুদ্রের দৈত্যদানব-সংহারলীলা প্রকটিত হইয়াছে। সঙ্ঘের এই সংগঠন ও শক্তিসাধনার বাস্তব মহড়ায় দুর্গত, দুর্বল, ভীত, সন্ত্রস্ত হিন্দুর ভিতরে অভয়, আশ্বাস, সাহস ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিতেছিল এবং সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তদের অবাধ দুষ্ক্রিয়াও কিছুটা প্রতিহত হইয়াছিল। খড়্গপাণি এই মহাত্মাকে ভক্তেরা আর এক নূতন খেতাব দিয়াছিলেন—"খড়্গ বাবা।" শ্রীশ্রীআচার্যদেব যেখানেই যাইতেন সেখানেই স্বামী ত্র্যম্বকানন্দজী খড়্গ হস্তে তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক—যেন রুদ্রসুন্দর শঙ্করের পার্শ্বে রুদ্রের জটাজালসম্ভূত বীরভদ্র। খড়্গ ত্রিশূল লইয়া শ্রীগুরুর নামে

এমন উলঙ্গ প্রাণে আর কেহ নাচিবেন কি? গাহিবেন কি? আমরা তো সব ভদ্র মানুষ!

এই সময়ে স্বামী ত্র্যম্বকানন্দজীর অন্তশ্চেতনায় বীর্য্যসাধনার যেন এক তুরীয় অনুপ্রেরণার সঞ্চার। বঙ্গ ও উড়িষ্যার একাংশে ধ্বংসকাণ্ড ঘটাইয়া ১৯৪২ সালে যে প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা বহিয়াছিল সেই তাণ্ডবের কিঞ্চিৎ স্তিমিত প্রবাহ রাজশাহীকেও নিস্তার দেয় নাই। ঐ ঝঞ্ঝার সঙ্গে যেন পঞ্জা লড়িবার স্পর্দ্ধায় খ্যাপা বাবা পথে নামিলেন খড়্গহস্তে। ঝঞ্ঝা বহিতেছে প্রলয়ে, আর, খ্যাপারও যেন প্রলয়-উন্মাদনা। জাপানী বোমার আতঙ্কে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহা তখন রাজশাহীতে সাময়িক আশ্রিত। রাজশাহী কলেজের বিজ্ঞানভবনে কিছু কাজ সারিয়া তিনি আশ্রমের নিকটবর্তী পথ দিয়া স্বীয় আবাসে ফিরিতেছিলেন। সহসা এই খড়্গীয় দৃশ্যের সম্মুখীন হইয়াই ডঃ সাহা হকচকিত ও ভীতিবিহ্বল। বিজ্ঞানীপ্রবরকে সমাদরে আশ্রমে আনিয়া আপ্যায়ন করা হয়।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্ঘনেতা শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব শেষ বারের জন্য রাজশাহী সফরে আসেন। সশস্ত্র যুবা রক্ষিসেনার সঙ্গে শত শত সাঁওতাল তীরধনুক হস্তে উপস্থিত। পঁচিশ জন বলিষ্ঠ সাঁওতালকে রক্তবস্ত্র ও রক্ততিলক পরাইয়া দুর্দ্ধর্ষ কাপালিক বেশে সাজানো হইয়াছে। তাহারা প্রত্যেকে খড়্গধারী—কণ্ঠে ভীম আরাব। ইহারা সকলেই শোভাযাত্রার অংশীদার এবং শ্রীশ্রীআচার্য্যের দেহরক্ষী। এই সংগঠন স্বামী ত্র্যম্বকানন্দজীর। তিনি নিজেও খড়্গহস্তে সকলের অগ্রে অগ্রে। রাজশাহীতে হিন্দুদের এই বিপুল সমারোহ—এই শক্তি সংগঠনের উদ্দীপনা ইতঃপূর্বে আর কেহ কখনো দেখেন নাই। রাজশাহী কলেজের তদানীন্তন দর্শনাধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীউমেশ-চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই দৃশ্য দেখিয়া আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী কৃষ্ণানন্দজীকে বলেন—"স্বামীজী! আপনারা বড় Militant হয়ে যাচ্ছেন।" স্বামীজীর উত্তর—"হাঁ, Militarisation through religion."

স্বামীজীর এই যে বীরধর্মসম্প্রীতি, ইহা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, ইহা তদীয় সহজাত সংস্কার। যখন তিনি সোনাইমুড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন "তিন বীর শিশু" কবিতার আবৃত্তি ও অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী তিন জনের ভিতরে তিনি একজন। সন্তোষ মারিল বাঘ, ধীরেন সিংহ এবং উপেন্দ্র (স্বামী ত্র্যম্বকানন্দ) মারিল হাতী।

এখন আসে যদি হাতী,
কসে লাগাবো তিন লাথি,
তাতেও যদি না মরে
(একেবারে) ফেলবো তারে মেরে।

কিন্তু কবিতার উপসংহারে ভীরুতার চূড়ান্ত প্রকাশ। এক বকের 'হাঁ' দেখিয়া তিন বীর শিশুর সভয়ে পলায়ন। স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভার সভাপতি জেলাশাসক মোমিন সাহেব বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—"বাঙ্গালী ছেলেরা বীর বটে! তাহারা বাঘ মারিল, সিংহ মারিল, হাতী মারিল, কিন্তু বকের মুখব্যাদান দেখিয়া পলাইয়া গেল। আমি বলি, তাহারা যেন বীরত্বেই স্থির থাকে, পলায়নপর না হয়।" উত্তরকালে এই উপদেশ উপেন্দ্র মানিয়াছেন সন্ন্যাসীরূপে ধর্মপ্রচার ও জাতি-সংগঠনের ক্ষেত্রে, আর সন্তোষ (রায়) মানিয়াছেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৃটিশের বহু নির্য্যাতন সহিয়া। স্বামীজীর এই সহজাত বীর্য্যধর্মানুরাগের সহিত গুরুশক্তি ও গুরুর অনুপ্রেরণা যুক্ত হইয়া তাঁহাকে নূতন মানুষ করে। এক পুণ্যা মাঘী পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব সন্তানকে কাছে ডাকিয়া লইয়া বিশেষ আশীর্বাদ দান করেন, বলেন —"আয়, তোকে আজ নূতন দীক্ষা দিব।" এই দীক্ষা তো আর কিছুই নয়—মহাশক্তির সঞ্চার। গুরুশক্তির স্ফুলিঙ্গ পাইয়া স্বামী ত্র্যম্বকানন্দজী মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছিলেন। সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেব এইরূপ আরো বহু বহু অগ্নিকুমারের জন্মদাতা, ইনি তন্মধ্যে অন্যতম। শ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দজী, শ্রীমৎ বেদানন্দজী, শ্রীমৎ

পূর্ণানন্দজী, শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দজী, শ্রীমৎ বিরজানন্দজী—অনেকেই তখন বাংলার হিন্দুসংগঠনকার্য্যে অক্লান্তশ্রমী। স্বামী ত্র্যম্বকানন্দজীকেও আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। রাজশাহী জেলার সঙ্গে পাবনা জেলাতেও তাঁহাকে কর্ম্মতৎপর দেখি। মীরপুর, রতনগঞ্জ, রূপগঞ্জ, মাসুন্দিয়া, মহিষাকোলা, রাণীনগর, সাখিনীরূপপুর, খাঁপুরা, পদ্মবিলা, সোনাতলা, বরৈতলা, সাঁথিয়া, শ্যামাগোপীনাথপুর, রাজনারায়ণপুর, গৌরীগ্রাম, বাঘুলপুর, সাগরকান্দী, পাঁচুরিয়া, কাবারী, খোলা, হাটুরিয়া, পাইখন্দ প্রভৃতি পাবনা জেলার অসংখ্য পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি বিপন্ন হিন্দুদের ভিতর কাজ করেন এবং সর্ব্বত্র মিলন মন্দিরের শাখা স্থাপিত হয়।

ইহার পর স্বামীজীকে আমরা দেখিতে পাই নোয়াখালি জেলার সর্বাপেক্ষা উপদ্রুত অঞ্চলে। শ্রীমৎ পূর্ণানন্দজী এই জেলায় পূর্ব্ব হইতেই দক্ষতার সহিত কার্য্যরত ছিলেন। ত্র্যম্বকানন্দজী যোগ দেওয়ায় শক্তি বৃদ্ধি হয়। করিমপুর, শ্রীপদ্দি, চন্দ্রগঞ্জ, হাজিপাড়া, দেওপাড়া, দালালবাজার, দক্ষিণ নাজিরপুর, নন্দীগ্রাম, সাগরদী, নরোত্তমপুর, কেরোয়া, বামনী, বাঙ্গাখা প্রভৃতি পল্লীতে মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় স্বামী ত্র্যম্বকানন্দজীর প্রচেষ্টায়। যেখানেই হিন্দুদের কোনও বিপদের সূচনা সেইখানেই রক্ষিদল সহ তিনি ছুটিয়া যান। সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতিকারীরা এই সাধুটিকে বড়ই অন্তরায় বলিয়া মনে করিল। একদিন ধরিয়া ফেলিল তাঁহার নৌকাখানি। জলের নৌকা টানিয়া তুলিল ডাঙ্গায়। কিন্তু গুরুশক্তিতে উদ্দীপ্ত বীর সন্ন্যাসী মৃত্যু আসন্ন জানিয়াও অকুতোভয়। মৃত্যুভয় কিসের? গুরুর আদিষ্ট ব্রত উদ্‌যাপন করিতে যাইয়া যদি মৃত্যুবরণ করিতে হয় তবে যে মৃত্যু শ্লাঘ্য। আর রক্ষার প্রয়োজন হইলে শ্রীগুরুই রক্ষা করিবেন। ভক্ত সন্তানের দৃঢ় প্রত্যয়—গুরুশক্তিই তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে এবং করিবে। হইলও তাহাই। এক অভাবনীয় উপায়ে সে যাত্রা তাঁহার

জীবন বাঁচিল। একনেতৃস্থানীয় বৃদ্ধ মুসলমান সহসা আসিয়া মারমুখো জনতাকে থামাইলেন—"ওরে ওকে তোরা মাইরো না। হেই বছর তুফান আর জলের সময় এই হাদুই আঁওগোরে খাওয়াইয়া বাঁচাইছে।"

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নোয়াখালির কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সুপরিকল্পিত এই নৈরাজ্যে সহস্র সহস্র হিন্দু নিহত, অত্যাচারিত বা ধর্ম্মান্তরিত। অগণিত সাধ্বী নারী লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা, অপহৃতা বা বলপূর্বক বিবাহিতা। হিন্দুদের ঘরবাড়ী লুণ্ঠিত, বিধ্বস্ত, অগ্নিদগ্ধ। সেই দুর্য্যোগের দুর্দিনে স্বামী ত্র্যম্বকানন্দজী করপাড়ার জমিদার শ্রীরাজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ীতে। প্রথম আক্রমণ হয় উক্ত জমিদার বাড়ীতেই। সারাদিনের প্রতিরোধে এই মৃত্যুশঙ্কা-হীন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীই বিপন্নের পাশে। অবশেষে প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া পড়ে। চলিতে থাকে অবাধ হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারীনিগ্রহ। অন্ততঃ দশ সহস্র সাম্প্রদায়িক গুণ্ডার গগনভেদী চীৎকার—"হাদুর মাথা চাই।" কিন্তু এ যাত্রাও বাঁচিলেন দৈবানুগ্রহেই। লক্ষ্মী পূর্ণিমার নির্ম্মল শারদ আকাশে কোথা হইতে সহসা আসিল দুর্য্যোগবাহী ঘনকৃষ্ণ মেঘ। প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত। দুর্বৃত্তেরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সেই সুযোগে কৌপীন মাত্র সম্বল করিয়া রণক্লান্ত সন্ন্যাসী ধানখেতের ভিতর দিয়া সারারাত্রি সাঁতরাইয়া রামগঞ্জ থানায় আশ্রিত। কোন প্রকারে কলিকাতা আসিয়া এই দুঃসংবাদ সংবাদপত্রের বিবৃতিতে প্রথম প্রকাশ করেন। তৎকালে এই ঘটনার বেদনার্ত্ত প্রতিক্রিয়া সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং পরিস্থিতির উন্নতির জন্য স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীজী নোয়াখালি ছুটিয়া গিয়াছিলেন।

স্বামীজীর চরিত্রের সারল্য, প্রেম, উদারতা, সেবার পরিচয় পূর্বেই আমরা পাইয়াছি। আরো অনেক কথা মনে পড়িতেছে। পুরুষ মাত্রই ছিল তাঁহার 'বাবা', আর নারীমাত্রই 'মা'। সুমিষ্ট ভাষণে, সেবার উপকরণে, আন্তরিকতার রসসিঞ্চনে অনায়াসেই তিনি মানুষকে

একান্ত আপনার করিয়া লইতেন। জীবনে কাহারও সহিত বিরোধ হইল না, এতটুকু কুটিলতা, জটিলতা অন্তরে স্থান পাইল না, লোকব্যবহারে যেন একজন লোকদুর্ল্লভ পুরুষ। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ কর্ম্মেও সমান নিষ্ঠা। যখন যে আশ্রমে থাকিয়াছেন, তখন সম্মার্জ্জনী লইয়া সমস্ত প্রাঙ্গণকে স্বহস্তে জঞ্জালমুক্ত করিয়াছেন—ঝাড়ুদার আসার পূর্ব্বেই রাত্রি তিনটায় ঝাড়ুদেওয়ায় কার্য্য শেষ। ভাল রান্ধিতে জানিতেন। সঙ্ঘভ্রাতৃগণকে সম্মুখে বসাইয়া স্বহস্তে ভোজন করাইতে তাঁহার কতই না প্রীতি। একবার এই প্রবন্ধের লেখক স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য দেড় মাস কাল পুরীতে স্বামীজীর পবিত্র সঙ্গ লাভ করে। সে কি যত্ন ও স্নেহ পরিচর্য্যা! যেন মাতৃবাৎসল্যকেও হার মানাইয়া দেয়। একদা বাজার হইতে স্বহস্তে একখানি খদ্দরের উত্তরীয় কিনিয়া আনিলেন। স্বহস্তে সেটিকে কাচিয়া স্বহস্তেই গৈরিক-রঞ্জিত করিলেন, স্বহস্তেই রৌদ্রে শুকাইয়া নিলেন। কাহার জন্য এই আয়োজন, কিছুই জানি না। অতঃপর শুক্‌না চাদর খানি যখন সহসা স্বহস্তে আমার ঊর্দ্ধাঙ্গে জড়াইয়া দিয়া হাসিতে লাগিলেন তখন আমি তো অবাক্ বিস্ময়ে অভিভূত। এ কী করিতেছেন, স্বামীজী! বলিলেন—"বা, তোমার যে চাদর নেই!" শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় নয়নে অশ্রু বহিল। লুটাইয়া পড়িলাম ভ্রাতৃ-বৎসল মহাপ্রাণ গুরুভ্রাতার শ্রীপদপ্রান্তে।

স্বামীজীর ব্যক্তিগত জীবন ছিল খুবই অনাড়ম্বর। সন্ন্যাসীর পক্ষে বিলাস ও ব্যসন তো ন্যক্কারজনক। সঙ্ঘের উদ্দিষ্ট কর্ম্মে দুই হস্তে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। ভিক্ষার কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন শ্রীগুরুচরণে। সঙ্ঘের কার্য্যে একটা মোটা অঙ্ক উৎসর্গ করিতে পারিলে তিনি বড়ই তৃপ্তি অনুভব করিতেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে পূর্ব্ববঙ্গ সফরকালে শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব এই গুরুভক্ত সাধকের জন্মভূমি আলোকপাড়ায় সপার্ষদ শুভ পদার্পণ করিয়া তাঁহার আত্মীয়বর্গকে কৃতার্থ

করিয়াছিলেন। ঐ সালের ডিসেম্বর মাসে আচার্য্যদেব যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত, তখন অন্যান্য জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে স্বামী ত্র্যম্বাকানন্দজীও শ্রীগুরুর সেবাশুশ্রূষায় মনপ্রাণ ঢালিয়া রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়াছেন।

৮ই জানুয়ারী আচার্য্যের লীলাশরীরের মহাপরিনির্ব্বাণ। ৯ই জানুয়ারী শ্রীদেহ বাজিতপুর মঠে লইয়া যাইবার জন্য যাত্রার উদ্যোগ। কিন্তু শিয়ালদহ ষ্টেশনের বড় সাহেব কোন স্পেশাল বগি দিতে চাহিলেন না শবদেহ বহনের জন্য। কারণ, সেদিন এক মুসলিম পরব এবং তখন বাংলায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বড় প্রবল। এই ব্যর্থতায় সকলে যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, তখন স্বামী ত্র্যম্বকানন্দজীর মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর এক অত্যাশ্চর্য্য সমাধানের বার্তা আনিয়া দিলেন। সঙ্ঘভক্ত শ্রীরাসবিহারী দেকে সঙ্গে নিয়া স্বামীজী উপস্থিত হইলেন ইণ্ডিয়ান্ ষ্টীম নেভিগেশন্ কোম্পানীর বড় সাহেবের দপ্তরে। সাধুজীর সারল্য ও ভাবাবেগে সাহেব মুগ্ধ। শুনিলেন সব কথা, পড়িলেন সংবাদপত্রের সংবাদ। কথা দিলেন—শবযাত্রার সামূহিক ব্যবস্থা তিনিই করিবেন। বলিলেন—"এরূপ যোগিরাজ আমাদের দেশে জন্মিলে আমরা কাঁচের হিমঘরে তাঁহার দেহ সংরক্ষিত করিতাম।" ফোন হাতে তুলিয়া লইলেন। ডাকিলেন—শিয়ালদ ষ্টেশনের বড় শ্বেতাঙ্গ সাহেবকে। একখানি বগি রিজার্ভেশনের অনুরোধ জানাইলেন, সব খরচ তিনি দিবেন। ষ্টীমার তো তাঁহারই হাতে। খুলনায় বার্ত্তা পাঠাইলেন সিন্ধিয়াঘাটগামী জাহাজের একাংশ ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া ফুলের মালায় সাজাইয়া রাখিতে এবং ধূপের দ্বারা সুগন্ধিত করিতে। শবদেহ কি ভাবে কাঠের কফিনে তুলিয়া বরফাবৃত করিতে হইবে তাহাও তিনি স্বামীজীকে সবিস্তারে বলিয়া দিলেন। যে কার্য্য অত্যন্ত দুরূহ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহা আশাতীত ভাবে অতি সহজ হইয়া গেল। এক্ষেত্রেও যেন গুরুশক্তিরই জয়।

আজ স্বামী ত্র্যম্বকানন্দজী আমাদের মধ্যে স্থূল শরীরে আর নাই। তাঁহার তিরোধানের ঘটনাটিও যেন বিস্ময়কর। মনে হয়, যেন সমস্ত ব্যাপারটি কাহারো দ্বারা সাজানো। শ্রীগুরুর অলক্ষ্য ইঙ্গিতেই তিনি যেন হরিদ্বার হইতে ঠিক সময়েই কলিকাতায় জ্যেষ্ঠ গুরু-ভ্রাতাদের সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন। সম্মুখে গঙ্গাসাগর মেলার সেবাকার্য্য। এই উপলক্ষ্যে সঙ্ঘের অন্যান্য শাখা হইতেও বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও সেবক আসিয়া জুটিয়াছেন। সকলের প্রীতি ও অভিনন্দন কুড়াইয়া পূর্ণ মর্য্যাদায় তিনি বিদায় লইবেন—ইহা যেন তাহারই সূচনা। নিজের অবচেতন মনেও এই বিদায়ের সংকেত পাইতেছিলেন। মাত্র কয়দিন পূর্বে এক সেবককে বলিলেন,—"ষ্টেশনে টিকিট করতে গেছে রে! রিজার্ভেশন্ পাওয়া যাচ্ছে না। রিজার্ভেশন্ পেলেই চলে যাব।" হাঁ, রিজার্ভেশন্ তাঁহার জন্য ঠিক করাই ছিল। আর যেন আচম্বিতেই ভোঁ বাজিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার প্রিয় সন্তানকে অতি সন্তর্পণে, অতি স্বচ্ছন্দে, অতি কোমল কর বাড়াইয়া আপন শান্তিময় স্নেহ-অঙ্কে তুলিয়া লইলেন। সাধক নিজে ভুগিলেন না, অন্য কাহাকেও ভোগাইলেন না।

জীবন এবং মৃত্যু দিয়া স্বামী ত্র্যম্বকানন্দজী আমাদিগকে যে মহতী শিক্ষা দিয়া গেলেন তাহা অনবদ্য এবং নিত্য মনন ও অনুধ্যানের বিষয়।

স্বামী সর্ব্বানন্দজী

'মৌনী বাবা' আজ চির মৌনী। আর তিনি কথা বলবেন না। ইষ্ট শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদ নিয়ে দীর্ঘ বারোটি বৎসর তিনি নিষ্ঠা ও কঠোরতার সঙ্গে মৌনব্রত পালন করেছেন। এ জন্যই তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল 'মৌনী বাবা'রূপে। অশীতিপর এই মহাত্মা গত ইং ৩০।৬।৮৭, বাং ১৫।৩।৯৪ তারিখে মঙ্গলবার প্রাতঃ

৯-৫ মিনিটে কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে দুরারোগ্য কর্কটরোগে ইষ্টচরণে চিরবিশ্রান্তি লাভ করেন। ইনি আমাদের শ্রদ্ধেয় স্বামী সর্ব্বানন্দজী।

যুগাচার্য্য সঙ্ঘনেতার সাক্ষাৎ লীলাপার্ষদগণের পরিনির্ব্বাণ-কাহিনী ঘন ঘন লিখতে হচ্ছে। তদীয় সর্ব্বত্যাগী চিহ্নিত সন্তানগণের সকলেরই বয়স হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অভীষ্ট ব্রত সম্পাদন পূর্ব্বক যথা সময়েই তাঁরা বিদায় গ্রহণ করছেন, আর রেখে যাচ্ছেন যোগ্য উত্তর সাধকগণকে। সুতরাং, নৈরাশ্যের কিছু নেই।

ষষ্ঠ দলে যাঁরা সন্ন্যাস লাভ করেন, স্বামীজী তাঁদেরই অন্যতম। আজ থেকে ষাট্ বৎসর পূর্ব্বে ইনি সংঘে যোগদান করেন। সন্ন্যাস লাভ হয় ১৯৩১, বাং ১৩৩৭ সনের মাঘী পূর্ণিমায় পুণ্যধাম বাজিতপুরে। পূর্ব্বাশ্রমের নাম নগেন্দ্র। পিতা প্রসন্ন কুমার ভদ্র ছিলেন ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গা থানার আবদুলাবাদ গ্রামের অধিবাসী। নগেন্দ্র বাল্যাবধি সংসারে অনাসক্ত। এ অবস্থায় পিতা-মাতা সচরাচর যা করেন, নগেন্দ্রের ক্ষেত্রেও তা-ই করা হয়। ছেলেকে সংসারে বাঁধবার জন্য প্রসন্ন কুমার হিন্দুর ঘরের দশম সংস্কারের শুভ কৃত্যটিও সম্পাদনের আয়োজন করেন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে নগেন্দ্রকে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ করা হয়। কিন্তু পরমার্থ সাধনে জন্ম যাঁর, তাঁকে কি কামিনী-কাঞ্চন মোহগ্রস্ত করতে পারে? এক গভীর নিশীথে স্বভাববিরাগী গৃহনিষ্ক্রান্ত। রমণীয় সোনার শিকল ছিঁড়েন নগেন্দ্র। এ বড় কঠিন কাজ। যৌবনের লালসাতৃপ্তির উপকরণ হাতের মুঠোয়। কিন্তু, অনায়াসে সে লালসা জয় করেন বীরেন্দ্র সাধক—নির্ব্বেদের সহজাত প্রসাদে। এই খানেই তিনি অসাধারণ। ভারতের মাটিতেই এরূপ হয়। এই ঐতিহ্যের পথ রচনা করেছেন যুগে যুগে ভারতের সাধকেরা। শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ও মহাপুরুষ মহারাজ এই ঐতিহ্যের আরো দুটি উদাহরণ। এই ঐতিহ্যের সূত্র ধ'রেই আমরা সাক্ষাৎ

পাই প্রাতঃস্মরণীয়া গোপা, বিষ্ণুপ্রিয়া, সারদা দেবীদের ন্যায় চিরব্রহ্মচারিণী—নিত্য সন্ন্যাসিনীদিগকেও।

যে ভোগাসক্তি অক্লেশে ত্যাগ করে নগেন্দ্র সন্ন্যাসব্রত বরণ করেন, সে আসক্তি আর তাঁকে পিছনে টানতে পারে নি। সন্ন্যাসধর্ম্মের মর্য্যাদা দৃপ্ত পৌরুষে পালনপূর্ব্বক বিজয়ী বীরের ন্যায়ই সাধক আজ শ্রীগুরুচরণে লীন। সঙ্ঘ-জীবনের প্রথম কয়েকটি বৎসর তিনি অতিবাহিত করেন স্বামী শঙ্করানন্দজীর পরিচালিত একটি চারণদলে। এখানে দেখি তাঁর অকপট সেবামূর্ত্তি। শ্রমক্লান্ত, স্বেদসিক্ত চারণসন্ন্যাসী ও কর্ম্মীদিগকে স্বহস্তে রন্ধন ও পরিবেশনপূর্ব্বক ভোজন করানোর দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন এবং এমন নিষ্ঠার সঙ্গে তা সম্পাদন করেন যে, প্রসন্ন শ্রীগুরু একদা বলেন—"নগেন তো শঙ্করানন্দের পার্টির মা।"

অতঃপর একদা আরম্ভ হয় স্বামীজীর তপস্যার জীবন। তিনি বরণ করেন দ্বাদশ বৎসরীয় মৌনব্রত। এ অবস্থায় তদ্‌গতচিত্ত হয়ে তিনি শ্রীগুরুর সেবা-পরিচর্য্যার সাধনে ব্রতী হন। বিশেষতঃ আচার্য্যদেবের ভোগরন্ধন ও তৎসান্নিধ্যে ভোগ-নিবেদনের কর্ম্মটি তাঁর উপর অর্পিত হয়। প্রয়োজনবোধে আচার্য্যদেব অতঃপর স্বামীজীকে প্রেরণ করেন সংঘের গয়াকেন্দ্রে। শ্রীমন্দিরের পূজারতি, যাত্রীদের সাধারণ পরিচর্য্যা এবং আশ্রমের অন্যান্য কর্ত্তব্যে মৌনব্রতী সাধু ছিলেন অনলস। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য পূজার ফুলের যোগান দিতে তিনি গয়াতে গড়ে তোলেন একটি সুন্দর বাগিচা। নিপুণ শিল্পীর ন্যায় নানা রঙের নানা জাতের ফুলের গাছের বাগিচাটিকে অপরূপতায় ভরে তোলা হয়। শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব গয়াতে এসে কখনো কখনো উক্ত পুষ্পোদ্যানের মখমল-কোমল তৃণশয্যায় শ্রীতনু এলিয়ে দিতেন—বিশ্রামার্থ। আর সেই সুযোগে সর্ব্বানন্দজী হৃষ্টান্তঃকরণে একরাশ ফুল তুলে অঞ্জলি দিতেন শ্রীগুরুচরণে। শ্রীশ্রীঠাকুরও প্রসন্ন আশীর্ব্বাদে ধন্য করতেন ভক্ত সন্তানকে।

আচার্য্যোত্তর কালে ব্রতকাল পূর্ণ হলে সাধকের মৌনভঙ্গ হয়। তৎকালে সংঘকর্তৃপক্ষ তাঁকে কুরুক্ষেত্র আশ্রমের অধ্যক্ষপদে নিয়োগপূর্ব্বক তথায় প্রেরণ করেন। সঙ্ঘানুগত সাধক নির্দ্ধিধায় সে কর্ত্তব্যভার মাথায় নেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করেন। অতঃপর গয়া আশ্রমেই পুনঃপ্রত্যাবর্তন। জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত সেখানেই তিনি ছিলেন। তাঁর মত প্রবীণ মহারাজের উপস্থিতি গয়া আশ্রমের গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি করেছে। বিশেষ অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য স্বামীজীকে কলিকাতা নিয়ে আসা হয় এবং ভর্ত্তি করা হয় ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে। সেখানেই তাঁর জীবনদীপ নির্ব্বাপিত।

গত ১৭ই আষাঢ় (১৩৯৪) কলিকাতা প্রধান কার্য্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্মৃতিবাসরে স্বামীজীর জীবন-প্রসঙ্গে ভাষণ দান করেন সঙ্ঘের সহ-সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজ এবং সহ-সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী মহারাজ।

স্বামী আত্মস্বরূপানন্দজী

ইং ১৯৩১। সঙ্ঘের রাজসাহী বিদ্যার্থি-ভবনের একদল কলেজের ছাত্র সিদ্ধপীঠ বাজিতপুরের পথে—আসন্ন ৺মাঘী পূর্ণিমা উৎসবোপলক্ষ্যে। ট্রেনপথে গোয়ালন্দ, সেখান থেকে ষ্টীমারে চরমুগুরিয়া, তারপর নৌকায় কুনিয়াঘাট এবং সর্ব্বশেষে অর্দ্ধ মাইল পদব্রজে বাজিতপুর ধাম।

এই ছাত্রদলের ভিতরে আছেন এমন একজন, যিনি বিজ্ঞানের স্নাতক। অধুনা নির্ব্বেদপ্রাপ্ত। সংসারে আর ফিরে যাবেন না —আত্মীয়-স্বজনগণকে পরিষ্কার ব'লে দিয়েছেন। কিন্তু তথাপি এ-বৎসর সংস্কারলাভের অনুমতি মিলে নি—সঙ্ঘাচার্য্যের সান্নিধ্যে। কেন ? আরো পরীক্ষা কি অবশিষ্ট আছে ?

ভাল ছাত্র। ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

ইংরাজীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী। স্নাতক পরীক্ষায়ও সুন্দর সাফল্য। স্নাতকের সার্টিফিকেটখানি তখনো বয়ে বেড়াচ্ছেন আপন ঝুলিতে। ঐ সার্টিফিকেটটাই আসক্তি না কি? ঐটাই উপাধি? আসক্তি ও উপাধি বর্ত্তমানে সন্ন্যাসের অধিকার কোথায়?

ঝুলি থেকে বিরাগী সার্টিফিকেটটি বা'র করেন নিঃশব্দে। অতি সহজেই সেটি নখতাড়নে খান্ খান্ হয়ে যায়। অতঃপর সেই টুক্‌রোগুলি পদ্মার জলে অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জিত। ষ্টীমারের গতিবেগে পদ্মার জল দু'ভাগ হয়ে যেন মুখব্যাদান ক'রেই ছিল। দুরন্তা নদী মুহূর্ত্তে টুক্‌রোগুলি গ্রাস ক'রে নেয়। ঐ জঞ্জাল চুকিয়ে দিয়ে আসক্তিমুক্ত তরুণ একবুক মুক্ত বাতাস ভিতরে টেনে নিয়ে সজোরে তা বাইরে ছেড়ে দেন। ভিতরটা সাফ্ হয়ে যায়। চিত্ত ভরে উঠে মুক্তির আনন্দে।

ঐ বৎসরই কলিকাতা প্রধান কার্য্যালয়ে শিব-রাত্রির মহাতিথিতে তরুণের ব্রহ্মচর্য্য-সংস্কার লাভ। পর বৎসর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে মাঘী পূর্ণিমায় বাজিতপুর ধামে সন্ন্যাসদীক্ষা। সন্ন্যাসের নাম হয় স্বামী আত্মস্বরূপানন্দ। সপ্তম দলে যে সকল ভাগ্যবান্ সাধক যুগাচার্য্যের চিহ্নিত সন্তানরূপে ত্যাগব্রত গ্রহণ করেন, ইনি তন্মধ্যে অন্যতম। সুদীর্ঘ ঊনষাট্ বৎসরব্যাপী অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে সংঘাদিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন ক'রে তিনি শ্রীগুরুচরণে চিরবিশ্রান্ত। তিনি ছিলেন সংঘের পরিচালক সমিতির অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য। তাঁর ত্যাগ-বৈরাগ্য ও গুরুভক্তি, তাঁর কর্ম্মনৈপুণ্য ও পুণ্য সাধনজীবনের কথা আজ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ ও মনন করি।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে শুভা অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের উত্তালতার ভিতরে মৈমনসিংহ জেলার আনাইতারা গ্রামে এক ধর্ম্মনিষ্ঠ পরিবারে স্বামীজীর জন্ম। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যার্থীরূপে তিনি সংঘের রাজসাহী ছাত্রাবাসে যখন প্রথম যোগদান করেন, তখন তাঁর বয়ঃক্রম বাইশ বৎসর।

৮১ বৎসর বয়সে গত ১৪ই অক্টোবর, ১৯৮৬ (বাং ২৭শে আশ্বিন, ১৩৯৩) তারিখে Surat New Civil Hospital-এ সন্ধ্যা ৭টায় দুরারোগ্য মেনিন্‌জাইটিস্‌ রোগে কয়েক দিন অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় থাকার পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মহাপ্রয়াণে সমগ্র সুরাট সহর শোকে মুহ্যমান হয়।

সঙ্ঘের সুরাট আশ্রম থেকে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, ১৫ই শ্মশানযাত্রায় সহরের আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে স্বামীজীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হয়। রাজপথের উভয় পার্শ্বে অশ্রুসিক্ত জনতার আকুল প্রতীক্ষা। ব্যবসায়িগণ দোকান ফেলে ফুলচন্দনের মালা নিয়ে ছুটে আসে তাদের প্রিয় মোটা (বড়) স্বামীজীকে শেষ দর্শন করতে। ব্যাঙ্ক ও অফিসের কর্ম্মীরা এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও বাদ পড়ে নাই। হিন্দু মিলন-মন্দিরের ব্যায়ামবীরেরা নিজেরাই ট্রাফিকের কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। গোপীপুরার পুরাণো আশ্রম থেকে শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীদেহ নিয়ে যাওয়া হয় কাতারগ্রাম আশ্রমে। সেখান থেকে তাপ্তী নদীর কুলে প্রাচীন পুণ্যতীর্থ অশ্বিনীকুমারে। এখানেই সম্পন্ন হয় স্বামীজীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

স্বামীজীর পূর্ব্বাশ্রমের সম্বন্ধে কিছু প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন তাঁরই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নৃতত্ত্ববিদ্‌ ডঃ মহাদেব প্রসাদ বসু। তিনি বলেন—অক্ষয় তৃতীয়ায় জন্ম নিবন্ধন পরিবারে তাঁর আদরের নাম ছিল অক্ষয়। শিবভক্ত পিতা নাম রাখেন শিবপ্রসাদ।

পিতা হেমচন্দ্র ছিলেন কৃতী শিক্ষাব্রতী। পিতাও ছিলেন পরম ধার্মিক, আদর্শনিষ্ঠ, কঠোর নিয়মতান্ত্রিক এবং গৃহী হয়েও বৈরাগ্যপ্রবণ। বিবাহের পর তিনি সংসার ত্যাগপূর্ব্বক হরিদ্বার আশ্রমে শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরিজীর নিকট দীক্ষিত হন এবং সন্ন্যাস প্রার্থনা করেন। কিন্তু নববিবাহিত তরুণ হেমচন্দ্র সন্ন্যাসের অনুমতি পান না—শ্রীগুরুর নির্দ্দেশে পুনঃ ফিরে আসেন সংসারাশ্রমে। কিন্তু তাঁর রক্তে ছিল যে সন্ন্যাস, তা তদীয় পুত্রগণের ভিতরে সংক্রমিত হয়। শিবপ্রসাদের ন্যায় তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা

সুশীল কুমারও সংসারত্যাগী হন এবং ঢাকাস্থ ভোলানন্দগিরি আশ্রমে গৈরিকপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারীরূপে জীবন যাপন করেন। কিন্তু সন্ন্যাসের পূর্ব্বেই তাঁর দেহান্ত হয়। ভগ্নী স্বর্গতা কালীতারা ছিলেন আমাদের সঙ্ঘাশ্রিতা শিষ্যা।

মহিষমুড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় ইংরাজীতে বিশেষ কৃতিত্বসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হবার পর উচ্চ শিক্ষালাভে কিছু সমস্যা উপস্থিত হয়। প্রথম সমস্যা—নিকটে কোন কলেজ নেই; দ্বিতীয় সমস্যা—শিবপ্রসাদ বাল্যাবধি নিরামিষাশী। এমন হোষ্টেল কোথায় পাওয়া যাবে যেখানকার ম্যানু সম্পূর্ণ আমিষবর্জ্জিত? অনুসন্ধানে যখন জানা যায়, রাজসাহীতে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে, আর সেখানে আছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের একটি বিদ্যার্থি-ভবন, যেখানকার আহার সম্পূর্ণ নিরামিষ, তখন সুদূর মৈমনসিংহ থেকে শিবপ্রসাদ ছুটে যান রাজসাহীতে উচ্চবিদ্যালাভের উচ্চাশায়। আশ্রমিক পরিবেশে বিদ্যার্থীর মন ভরে যায়।

কিন্তু, শিবপ্রসাদ তখনো সঙ্ঘের সম্পূর্ণ পরিচয় জানেন না, চিনেন না সঙ্ঘের প্রাণপুরুষকেও। ক্রমে পরিচয় ঘটে। পাবনা জেলায় সঙ্ঘের জনসেবা কর্ম্ম দর্শনে শিবপ্রসাদ মুগ্ধ। অতঃপর একদা রাজসাহী বিদ্যার্থি-ভবনে শ্রীশ্রীসঙ্ঘাচার্য্যের শুভ দর্শনও মিলে। মহাপুরুষ আশীর্ব্বাদ দেন, উপদেশ দেন, বলেন—"তোর সঙ্গে আমার জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ।" সেই দিন থেকে শিবপ্রসাদের সম্মুখে খুলে যায় এক নূতন দিব্য জীবনের উজ্জ্বল দিগন্ত—সে সন্ন্যাসী হবে।

শিবপ্রসাদের এই ভাবান্তরের সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র ছুটে আসেন তাঁর পিতা ও খুল্লতাত। রাজসাহী কলেজ থেকে ট্রান্স্ফার্ সার্টিফিকেট্ নিয়ে ছেলেকে ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হয় রংপুর কারমাইকেল কলেজে। কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ। সেখানে শিবপ্রসাদ কঠিন কালাজ্বরে আক্রান্ত। বাড়ীতে এনে চিকিৎসা

করা হয়। সুস্থ হয়ে আবার তিনি ফিরে যান রাজসাহী কলেজেই। আবার সেই আশ্রম হোষ্টেল। সেই যাওয়াই তাঁর শেষ যাওয়া। আর তিনি ঘরে ফিরে আসেন নি।

ডঃ বসু স্বামীজীর বাল্যজীবন সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে জানা যায়, শৈশব থেকেই তিনি ধীর, স্থির, শান্ত, শিষ্ট, চরিত্রবান, ধর্ম্মপ্রবণ ও আদর্শনিষ্ঠ। পিতা হেমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানেই এই মহাত্মার জীবন গড়ে উঠেছিল। নিয়মিত ব্যায়াম, জপ, পূজা, এমন কি, রন্ধনকর্ম্মে পর্যন্ত তিনি পুত্রকে উৎসাহিত ও অভ্যস্ত করাতেন। স্বামীজীর স্নেহময়ী খুল্লতাতীর উক্তি—"চাঁদেরও কলঙ্ক আছে, কিন্তু আমার অক্ষয়ে (শিবপ্রসাদ) নেই।" আরো আশ্চর্য্য, নিকট প্রতিবেশী শ্রীবিপিন সরকার একদা বলেন—"আমার চার ছেলের মৃত্যুর বিনিময়েও অক্ষয় বেঁচে থাকুক!"

এই দূরদর্শী মর্ম্মজ্ঞ প্রতিবেশী কি উপলব্ধি করেছিলেন—অক্ষয়ে আছে ভবিষ্যৎ অক্ষয় কীর্ত্তির উজ্জ্বল সম্ভাবনা? নচেৎ নিজের সর্ব্বনাশের বিনিময়েও তিনি অক্ষয়ের দীর্ঘ জীবন কামনা করবেন কেন?

আপন চরিত্রগুণে পূর্ব্বাশ্রমের পরিবেশে তিনি প্রতিবেশীদের মন কিরূপ জয় করেছিলেন তার পরিচয় মিলে আর এক দিন। উত্তরকালে যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে দেশ-বিভাগের পূর্ব্বে পূজনীয় সঙ্ঘসভাপতিজীর অনুমতি ক্রমে স্বামীজীর পিতা-ঠাকুর সামান্য দু'টি দিনের জন্য তাঁকে মাতৃভূমিতে নিয়ে গেলে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের অগণিত হিন্দু-মুসলমানের ভিড় হয় তাঁর দর্শন মানসে। পথে লোক না ধরায় গাছে উঠেও বহু মানুষ সন্ন্যাসীকে দর্শন করে। আনাইতারা গ্রামের বসু পরিবার ছিল একটি স্থানীয় তালুকের অধীশ্বর। স্বামীজীর মাতৃকুলও ছিল সিংরাগী গ্রামের জমিদার। শিবপ্রসাদ সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক এই উভয়কুলকে ধন্য করেছেন, পবিত্র করেছেন।

আবাল্য চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ এই সাধুপুরুষ সন্ন্যাসজীবনেও সাফল্যমণ্ডিত, তা বলাই বাহুল্য। বাক্যে, কার্য্যে, আচরণে তিনি ছিলেন একজন খাঁটি সাধু, সত্যকারের ত্যাগী ও বৈরাগ্যবান্, পরম গুরুভক্ত। প্রথম আশ্রমজীবনে তিনি সঙ্ঘের এক চারণদলের অন্যতম সদস্য। সুদূর ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর এবং ভারতের গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাবাদি প্রদেশের নগরে নগরে ছুটেছেন চারণদলের সঙ্গে সঙ্ঘের ভাবাদর্শের প্রচারব্রতে। সমস্ত কণ্টককে বরণ করেছেন হাসিমুখে। একবার মহারাষ্ট্রের পুণা অঞ্চলে প্রচারে গিয়ে কঠিন উদরাময় রোগে আক্রান্ত হন। শরীর জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার হয়ে যখন বাজিতপুর ধামে আসেন, তখন আচার্য্যদেব বলেন—"ও কিছু না, ওষুধের দরকার নেই। আশ্রমের প্রসাদ খেলেই ভাল হয়ে যাবে।" হলোও তাই। ইং ৮।১০।৮৬ তারিখে হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়া পর্যন্ত জীবনে তাঁর আর কোন বড় অসুখ হয় নি। কোন দিন হোমিওপ্যাথি ব্যতীত অন্য ঔষধ গ্রহণ করেন নি।

ইং ১৯৪১ সালে শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের পর স্বামী আত্মস্বরূপানন্দজী কিছুকাল সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়ে কর্ত্তব্যরত। সেই সময় সুরাট থেকে শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী এক চিঠিতে জানতে চান, তথায় নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা হলে তিনি তার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত কি না। গুজরাটের মানুষ চায়—বঙ্গদেশের ন্যায় গুজরাট প্রদেশের সহরে এবং গ্রামেও হিন্দু মিলন-মন্দির ও রক্ষিদল গঠিত হোক। কারণ, সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা তখন সারা ভারতব্যাপী। গুজরাটও তার ব্যতিক্রম নয়। স্বামীজী উত্তর দেন—সঙ্ঘের আদেশে তিনি পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যেতে প্রস্তুত। সঙ্ঘানুগত কর্ম্মবীরের জন্য এই নূতন কর্ম্মক্ষেত্র প্রতীক্ষা করছিল। যথাসময়ে তিনি নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ছেচল্লিশটি বৎসর এই সুরাটের মাটিতেই তিনি কাটিয়েছেন, সেবা করেছেন এ দেশের মানুষদের, আর অন্তিম শয্যাও রচনা করলেন সুরাটের মাটিতেই। স্বামীজীর কর্ম্মমুখর

জীবনের এই দীর্ঘ ইতিহাস বড় সুন্দর। আপন নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, কৃতিত্ব ও তপস্যায় কিরূপে তিনি সুরাট আশ্রমটিকে ক্রমপর্য্যায়ে সমুন্নত ক'রে গড়ে তুলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন তদীয় ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা। স্বামী অম্বরীশানন্দ, স্বামী তৃপ্তানন্দ, ব্রহ্মচারী আশিস্ ও সেবক বিজন তন্মধ্যে অন্যতম। স্বামী কৈবল্যানন্দও কয়েক বৎসর স্বামীজীর সান্নিধ্যে অতিবাহিত করে। সকলের লিখিত বক্তব্য থেকে সার সংগ্রহপূর্ব্বক এবং তৎসহ আপন অভিজ্ঞতা সংযুক্ত ক'রে স্বামীজীর মহাজীবনের এই স্বর্ণযুগের উপর কিছু নিবেদন রাখবো।

সুরাট আশ্রমটি প্রথম স্থাপিত হয় এ্যানিবেসাণ্ট্ রোডে গোপীপুরায়—১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে। ফিরিঙ্গি বেনিয়াদের একটি পরিত্যক্ত সপ্রাঙ্গণ দ্বিতল গুদাম ঘর ভাড়া নেওয়া হয়। পুরাতন, পরিত্যক্ত এই ভূতুড়ে বাড়ীতে মানুষ আসতো না। কিন্তু সেই অবহেলিত, পরিত্যক্ত বাড়ীটি নূতন প্রাণচেতনায় মুখরিত হয়ে উঠে, যখন এখানে স্থাপিত হয় "গুজরাট হিন্দু মিলন-মন্দির।" সঙ্ঘভ্রাতা স্বামী ত্রিদশানন্দজীকে নিয়ে স্বামীজী এইখানে কার্য্য আরম্ভ করেন। প্রথমেই স্থাপিত হয় এক ব্যায়ামের সুসংগঠিত আখড়া, যেখানে লাঠি, ছোরা ও তরবারি চালনার কৌশলও শিক্ষা দেওয়া হতে থাকে। অহিংসবাদী মহাত্মা গান্ধীজীর দেশের যুবাদের নূতন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা হয়। তখন এই ভূতুড়ে বাড়ীটিই পরিণত হয় তরুণ বিদ্যার্থী ও যুবাদের নিত্যতীর্থে। সেই আখড়া আজিও বিদ্যমান, আজিও সেই আখড়ার সদস্য সংখ্যা অন্যূন তেরো শ। ভেবে দেখুন, সেই ১৯৪১ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত কত সহস্র সহস্র যুবা বাহুতে শক্তি, মনে বল, চেতনায় হিন্দুত্বের বীর্য্য নিয়ে এই আখড়া থেকে বেরিয়েছে। সুরাট সহরে গণপতি বিসর্জ্জন-শোভাযাত্রা যখন রাজপথে বাধাপ্রাপ্ত, তখন সঙ্ঘসন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে এই আখড়ার বীর যুবারাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় জয়ী হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে গণপতি উৎসব বিশেষ লোকপ্রিয়। ব্যাপকতায় এই উৎসব বাঙ্গালীর দুর্গাপূজাকেও যেন হার মানায়। চৌদ্দ দিনব্যাপী চলে এই পূজা ও উৎসব। পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে গণপতির পূজায়োজন। কিন্তু এদের ভিতরে ছিল না কোন গণচেতনা। সঙ্ঘের গুজরাট হিন্দু-মিলন-মন্দির সেই সংগঠন ও গণচেতনা এনে দেয়। রাজপথ থেকে সরে যায় বাধাদানকারী দুষ্কৃতেরা। সঙ্ঘের গণপতিমূর্ত্তি লাভ করে 'মোটু গণপতি' (প্রধান গণপতি) আখ্যা। এই গণপতিপ্রতিমা বিসর্জ্জন শোভাযাত্রার সর্ব্ব-পশ্চাতে থাকতেন সন্ন্যাসী ও রক্ষিদল-পরিবৃত মোটা (বড়) স্বামীজী যাঁর দর্শন ও চরণধূলির জন্য এ বৎসরও হাজার হাজার মানুষের ভিড় জমেছিল। বৎসর বৎসর সে ভিড়ও নিয়ন্ত্রণ করতে হতো অনেক সময় পুলিশকে। সেই মোটা স্বামীজীকে আর লক্ষ লক্ষ মানুষের শোভাযাত্রার পশ্চাতে দেখা যাবে না।

গণেশ চতুর্দ্দশীতে চৌদ্দ দিনব্যাপী এই উৎসবের সঙ্গে ধর্ম্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি বিষয়ের চর্চা ও প্রতিযোগিতার সংযোজনা—স্বামী আত্মস্বরূপানন্দজীর সৃষ্টি-ধর্ম্মী প্রতিভার বিশিষ্ট নিদর্শন। আজ যাঁরা গুজরাটের খ্যাত-নামা ব্যক্তি, অনুসন্ধানে জানা যাবে, তাঁরা অনেকেই ছাত্র-জীবনে সঙ্ঘায়োজিত গণপতি উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কোন আঙ্গিকে অংশগ্রহণকারী। গুজরাটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ও ঔপন্যাসিক, 'গুজরাট মিত্র' দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীভগবতী কুমার শর্ম্মা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছেন—পাগড়ীধারী দীর্ঘকায় সেই সৌম্যমূর্ত্তিকে দেখলে আমাদের স্বামী বিবেকানন্দের কথা স্মরণ হতো। সহরের রাস্তায় চলতে স্বতঃপ্রণোদিত শিশুর দলকে ঘর থেকে ছুটে এসে স্বামীজীকে প্রণাম করতে দেখা দীর্ঘদিন থেকে যেন আমাদের স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। এমন তেজস্বী অথচ শান্তসৌম্য মূর্ত্তি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। বাক্‌সংযম যেন তাঁর

স্বভাবেই পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কাউকে উপদেশ দেওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। কথা কম, কাজ বেশী—এই ছিল তাঁর জীবন্ত উপদেশ।”

‘গুজরাট মিত্র’ পত্রিকার শ্রদ্ধেয় সম্পাদক সঠিক ভাবেই স্বামীজীর চরিত্র চিত্রণ করেছেন। এই নীরব এবং নিষ্কাম কর্ম্মযোগী জীবনে কথা বলেছেন খুবই কম, কিন্তু দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসরে আলোচ্য কেন্দ্রে কাজ করেছেন প্রচুর। এ্যানিবেসান্ট রোডের পুরাতন বাটীতেই আরম্ভ করেন একটি হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, প্রবর্ত্তিত হয় বার্ষিকী বাসন্তীপূজা, সহরকে কেন্দ্র করে পল্লী অঞ্চলে গঠিত হতে থাকে মিলন-মন্দিরের শাখা, হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রচার-কার্য্য হতে থাকে স্বামীজীর নেতৃত্বে। শ্রীমৎ অদ্বৈতানন্জী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁর উপদেশ, পরামর্শ, সাহচর্য্য ও বাক্‌বৈদগ্ধ্য স্বামীজীকে পর্য্যাপ্ত শক্তি যুগিয়েছে। কিন্তু অদ্বৈতানন্দজীর তিরোধানে সমস্ত দায়িত্ব এসে বর্ত্তায় স্বামী আত্মস্বরূপানন্দজীর একার স্কন্ধে। তিনি তা সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপন ক'রে গেছেন।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে সুরাট কেন্দ্র থেকে “হিন্দু মিলন-মন্দির” নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হয়—শ্রীমৎ স্বামী বেদানন্দজীর উপদেশে। শ্রীমৎ বেদানন্দজীই প্রথম সম্পাদক এবং তাঁর তিরোধানে সম্পাদক পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রীমৎ অদ্বৈতানন্দজী। কিন্তু প্রথমাবধি পত্রিকার সমস্ত কাজই করতে হতো স্বামী আত্মস্বরূপানন্দজীকে। কঠোর পরিশ্রমে তিনি দুরূহ গুজরাটী ভাষা আয়ত্ত করেন। নিজেও লিখতেন এবং বিদগ্ধ বাঙ্গালী লেখকদের রচনা অনুবাদ ক'রে হিন্দু মিলন-মন্দিরে প্রকাশ করতেন। প্রণবের ভাল ভাল রচনাগুলিও গুজরাটী ভাষায় অনূদিত হতো উক্ত গুজরাটী পত্রিকার জন্য। গুজরাটের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লেখক, কবি, দার্শনিক, পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, সমাজসেবা-ব্রতী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের রচনায় সমৃদ্ধ এই পত্রিকার খ্যাতি সুদূর

আফ্রিকার গুজরাটী মহলে পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এই সাফল্যের পশ্চাতে ছিল স্বামী আত্মস্বরূপানন্দজীর অনলস নিষ্ঠা ও তপস্যা। ইং ১৯৭৭ সালে শ্রীমৎ অদ্বৈতানন্দজীর তিরোধানের পর স্বামী আত্মস্বরূপানন্দজীকেই গুজরাটী মাসিকের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করতে হয়।

সারা দিন নানা কর্ম্মের তাড়না ও মানুষের আনাগোনা। তাই গভীর রাত্রি কালটি তিনি বেছে নিয়েছিলেন পত্রিকার কাজের জন্য। চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে কুড়ি ঘণ্টাই কাজ, বড় জোর চার ঘণ্টা বিশ্রাম। আত্মপ্রচার-বিমুখ নিষ্কাম সন্ন্যাসী নিজের নামে কোন দিন কোন রচনা প্রকাশ করেন নি—'দীপঙ্কর', 'শুভঙ্কর' 'রসেন্দুশেখর' এই সব ছদ্ম নামে সুন্দর সুন্দর মননশীল রচনা লিখতেন ও প্রকাশ করতেন। গুজরাটী ভাষায় স্বামীজীর পরিচ্ছন্ন জ্ঞান সে দেশের পণ্ডিত সমাজকেও মুগ্ধ করেছিল। সঙ্ঘের অধিকাংশ পুস্তকাবলীর গুজরাটী অনুবাদ হয়েছে স্বামীজীর অক্লান্ত শ্রমে। শ্রীমৎ অদ্বৈতানন্দজীর লিখিত গুজরাটী বইগুলির প্রকাশকও হলেন স্বামী আত্মস্বরূপানন্দজী। বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরাজী, গুজরাটী—পাঁচটি ভাষার উপরই স্বামীজীর পর্য্যাপ্ত দখল ছিল। বেদ, উপনিষৎ, গীতাদি শাস্ত্রে ছিল বিশেষ ব্যুৎপত্তি। হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের উপরও ছিল অগাধ জ্ঞান। এত জ্ঞানে জ্ঞানী এবং এত গুণে গুণী মানুষটি কিন্তু সহজে কাউকে ধরা দিতেন না। নির্লিপ্ততার কি অপরূপ দৃষ্টান্ত!

এই মানুষটির আবার কি গভীর ইষ্টনিষ্ঠা! এই ইষ্টনিষ্ঠায় তিনি অন্তলীন। গান-বাজনাও কিছু জানতেন। কিন্তু লোক-সমক্ষে কখনো নয়। আরতির পূর্ব্বে ভাবময় অবস্থায় তিনি যখন শ্রীমন্দিরে বসে ভজন করতেন, তখন সত্যই তিনি আধ্যাত্মিক জগতের অতি গভীরে ডুবে যেতেন। উৎসব-পার্ব্বণে আশ্রমিকগণকে সঙ্গে নিয়ে তিনি স্বয়ং মনোমুগ্ধকর ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের আসন

সাজাতেন। অন্য সেবকদের সঙ্গে স্বয়ং অংশ গ্রহণ করতেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগরন্ধনে। সর্ব্বকর্ম্মে সকলের সহযোগী। কোনই অভিমান নেই। জন্ম-বিরাগী পুরুষ আহার-বিহারেও একান্তই সাদাসিধে। এই বৃদ্ধ বয়সেও সকলের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে একই প্রকার আহার্য্য গ্রহণ। চৌকীতে কোন দিন শুতেন না। নিজের বিছানা প্রায়শঃ নিজেই পেতে নিতেন, তুলতেনও নিজেই। কারো সেবাগ্রহণের প্রতীক্ষায় থাকতেন না। তদীয় সদাগম্ভীর ব্যক্তিত্বের সম্মুখে কেউ সহসা অপ্রয়োজনীয় বাক্য উচ্চারণে সাহসী নয়। কিন্তু, এই গাম্ভীর্য্যের ভিতরে বাস করতো এক নবনীত-কোমল স্নেহপ্রবণ প্রাণ। অপার স্নেহযত্ন ছিল সকল সহযোগী ও আশ্রম-সেবকগণের প্রতি। ছিল অকৃত্রিম গুরুভ্রাতৃ-বাৎসল্য। কিন্তু, আদর্শবিচ্যুতিকে প্রশ্রয় দেন নি কখনো। সেখানে ছিল কঠোর শাসন।

ইং ১৯৬১ সাল। স্বামীজীর সংকল্প—ভাড়াটিয়া সেজে কতকাল থাকা যায়, এবার কোন স্থায়ী জমিখণ্ডের উপর সঙ্ঘের শাখাশ্রমকে সুপ্রতিষ্ঠ করতে হবে এবং প্রাচীন গুরুকুলের আদর্শে স্থাপন করতে হবে বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস। সঙ্ঘ-কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি ক্রমে কাতারগ্রামে কুড়ি বিঘার মত এক বিশাল ভূমিখণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়। জমির মূল্য তাৎকালিক বাহান্ন হাজার টাকা। অত টাকা হাতে নেই। কিন্তু শ্রীগুরুর ইচ্ছায় এক অভাবনীয় উপায়ে টাকার যোগাড় হয়ে যায়। গণদেবীর বিশিষ্ট ভক্ত শ্রীবংশী-লাল কানসারা নিঃসন্তান। ধনুষ্টঙ্কার রোগে আকস্মিক মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সহধর্ম্মিণী হীরাবেনকে নির্দ্দেশ দিয়ে যান, যেন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কারখানা বিক্রয়ের সমস্ত অর্থ স্বামীজীর হাতে তুলে দেওয়া হয়—সঙ্ঘের কার্য্যে, গুরুজীর কার্য্যে। বংশী-লালের ধর্ম্মপত্নী পতিদেবের এই শেষ ইচ্ছা পূরণ করেন। প্রস্তাবিত জমি ক্রয় করা হয়।

কিন্তু পরিকল্পিত কার্য্যগুলি সম্পাদন করতে হলে প্রয়োজন

আরো লক্ষ লক্ষ টাকার। কঠোর সঙ্কল্পী ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়নিষ্ঠ স্বামীজী শ্রীগুরুমহিমা অন্তরে স্মরণপূর্ব্বক কার্য্যে অবতীর্ণ হন। নিত্য নৈমিত্তিক চল্‌তি কাজগুলির সঙ্গে নূতন পরিকল্পনার জন্য অর্থসংগ্রহ নিঃসন্দেহে এক বাড়তি বোঝা। এ বোঝা বহনেও স্বামীজীকে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা, চেষ্টা ও শ্রম স্বীকার করতে হয়। ফলে ধীরে ধীরে পরিকল্পিত কার্য্যগুলি বাস্তব রূপ নিতে থাকে। আজ কাতারগ্রামে সঙ্ঘের বিরাট সুদৃশ্য আশ্রমভবন গড়ে উঠেছে। সমস্ত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে—এই আশ্রমভবন ও তার বিভিন্নমুখী কর্ম্মযজ্ঞ। আশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে সুরাটের উপকণ্ঠ-স্থিত এই কাতারগ্রামের গোটা অঞ্চলটিরই গুরুত্ব বেড়ে যায়। আজ তথায় গড়ে উঠেছে নূতন সহর।

কাতারগ্রামে ইং ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় গুরুকুল কুমার বিদ্যালয় (Boys' High School) এবং ১৯৭০ সালে জন্মলাভ করে গুরুকুল কন্যা বিদ্যালয় (Girls' High School). রাজসাহী বিদ্যার্থিভবনের অনুভাবে এখানেও গড়ে উঠে গুরুকুল ছাত্রাবাস। ১৯৮০ সালে শ্রীগুরুমন্দিরের উদ্বোধন উৎসব হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীশিবমন্দির ও শ্রীবিষ্ণুমন্দির। নির্ব্বিঘ্নে, শান্ত পরিবেশে সাধন-ভজনের জন্য নির্ম্মিত হয় ধ্যান-মন্দির। সাধু-নিবাস, লাইব্রেরী, হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রকল্প এই আশ্রমের কলেবর বৃদ্ধি করেছে। স্বামী অম্বরীশানন্দের প্রতি-বেদনে প্রকাশ, শেষ জীবনে স্বামীজীর দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা সত্ত্বেও তিনি নিজের প্রতি কোনই দৃষ্টি দিতেন না। কখনো কখনো বল্‌তেন—"শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্ত মোক্ষণে শেষ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের কাজ ক'রে যাব।" সে প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করেছেন।

পূজার পূর্ব্বে একদিন (৩রা অক্টোবর) মাথা ঘুরে বাথরুমে পড়ে যান। আবার উঠে দাঁড়ান। মনে করেন—ও কিছু নয়। নিজেই হোমিও ওষুধ খেয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু, না,, শরীরটা যেন কেমন! ভেবেচিন্তে কাশীর দুর্গোৎসবে যাওয়া স্থগিত রাখেন। অধিকাংশ আশ্রম-ব্রহ্মচারী ও আশ্রম-সন্ন্যাসীদের ৪ঠা অক্টোবর কাশীধামে পাঠিয়ে দিয়ে অল্প সংখ্যক সেবক ও ব্রহ্মচারী নিয়ে নিজে থেকে যান কাতারগ্রাম আশ্রমেই। তৎপূর্ব্বে কাশীধামে পূজ্য বড় স্বামীজীকে পত্র লিখে জানিয়ে দেন নিজের শারীরিক অসুবিধার বিষয় এবং আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন তাঁর শ্রীচরণসান্নিধ্যে। পূজ্য বড় স্বামীজী যথাসময়ে আশীর্ব্বাদলিপি পাঠিয়েও দেন। গুরুপ্রতিম জ্যেষ্ঠ সংঘভ্রাতার সেই আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ ক'রেই মহাসাধক কর্ম্মশেষে অভীষ্ট সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করলেন।

স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজী

ভারত বিভক্ত হয়ে হয় পাকিস্থান, পাকিস্থান খণ্ডিত হয়ে সৃষ্টি হয় বাংলা দেশের। এই দুই রাষ্ট্র-বিপ্লবের ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝার ভিতরে থেকেও যে কয়জন অসম সাহসী সংঘসন্ন্যাসী বাজিতপুর, মাদারীপুর, খুলনা প্রভৃতি স্থানে শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের আসন রক্ষা ক'রে চলেছিলেন তাঁদের শেষ মানুষটিও আজ আর নেই। খুলনা বেলফুলিয়া আশ্রমের পুণ্য ভূমিতে গত ২২শে ফাল্গুন (ইং ৭।৩।৯০), ১৩৯৬ তারিখে বেলা দশটায় শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের অন্যতম সাক্ষাৎ লীলাসহচর শ্রীমৎ স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজী ৮৫ বৎসর বয়সে শ্রীগুরুপদে চির বিশ্রাম লাভ করলেন। বার্দ্ধক্য-জনিত ব্যাধিতে তিনি প্রায় শয্যাশায়ী ছিলেন।

ভৈরব নদের এক পাড়ে খুলনা শহর, অন্য পাড়ে বেলফুলিয়া গ্রাম। ১৯২১ সালে এই গ্রামেই এক বিরাট ভূখণ্ডের উপর গড়ে উঠে সংঘের খুলনা সেবাশ্রম। এই আশ্রম শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের লীলাক্ষেত্র। এখানে সংঘের ঊর্দ্ধ্বতন সংঘসাধকগণ একদা লোক-কল্যাণকর কর্ম্মের সহিত ধ্যান, জপ, ভজনাদির নিষ্ঠায় অধ্যাত্ম-

সাধনে নিরত ছিলেন। তাই শ্রীমৎ বেদানন্দজী এই আশ্রমকে বলতেন সঙ্ঘের ধাত্রীগৃহ। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের আদেশে স্বামী জ্যোতির্ম্মানন্দজী এই আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত হন। সেই থেকে দীর্ঘ ৫২ বৎসর স্বামীজী এই আশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক অকপট চিত্তে শ্রীগুরুর আদেশ পালন করেছেন।

এই সময়ের ভিতর ২৪ বৎসর গেছে পাকিস্থানের রাজ্য। অতঃপর স্বাধীন বাংলাদেশে কেটেছে ১৯ বৎসর। জ্যোতির্ম্মানন্দজী সমস্ত পরিস্থিতির সহিত নিজেকে মানিয়ে নিয়ে পূর্ণ মর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। আপন সরল স্বভাব ও মিষ্ট ব্যবহারে তিনি ছিলেন স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র। আশ্রমের কাজে যেখানেই গেছেন কেউ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। এই প্রবীণ সন্ন্যাসীর লোকপ্রিয়তা এমনি যে, তাঁর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে আশ্রমভূমি লোকসমাগমে উপ্‌চে পড়ে। বাংলা দেশ থেকে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ—"লোক আসছে—দলে দলে। হিন্দু-মুসলমান সবাই। সবারই হাতে ফুল, কারো হাতে মালা। অশ্রুসিক্ত নয়নে সবাই জানায় শ্রদ্ধা।"

দেশবিভাগের পর অনেক অসুবিধা, অনেক অর্থকৃচ্ছ্র গেছে। খুব বুদ্ধি ও হিসাব ক'রে তিনি আশ্রম চালিয়ে নিয়েছেন। বাংলার মুক্তিযুদ্ধের সময় খান সেনাদের দ্বারা আশ্রমের ক্ষয়ক্ষতি কিছু হয়। সেই ক্ষতি পূরণ ক'রে তিনি আরো বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করতে সমর্থ হন। পঁচিশ ত্রিশটি কলেজের ছাত্রের উপযোগী একটি পাকা ছাত্রাবাস তৈরী হয়। সেটি চলছে। শ্রীগুরুমন্দির ও শ্রীদুর্গামন্দিরটি পাকা করেন। শ্রীশিবমন্দিরের সংস্কার সাধিত হয়। শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের স্মৃতিবিজড়িত বটবৃক্ষ ও পঞ্চবটীর বেদীদ্বয় নূতন ক'রে গঠন করেন। আশ্রমের শ্রীশিবরাত্রি ও শ্রীদুর্গাপূজার অনুষ্ঠান বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠে স্বামীজীর অক্লান্ত চেষ্টায়। একটি হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় চলছে। ত্রিসন্ধ্যা উপাসনায় আশ্রমিকগণের সহিত বিদ্যার্থীরাও

অংশ গ্রহণ করে। সুগায়ক স্বামীজী নিজেই ভজন-সঙ্গীতের পুরোধা। সঙ্গীতানুরাগ তাঁর আবাল্য সংস্কার।

স্বামীজীর পূর্ব্বাশ্রম ছিল মৈমনসিং জেলার নেত্রকোণা থানার সতরশ্রী গ্রামে। সন্ন্যাসপূর্ব্ব নাম জ্ঞানেন্দ্র। পিতা—রামকুমার মিত্র। বাল্যাবধি তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ। যেখানেই হরি-সংকীর্ত্তনাদি ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান হতো সেখানেই তিনি উপস্থিত হতেন সকলের আগে, আর ফিরতেন সকলের শেষে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব মৈমনসিং সহরে শুভ পদার্পণ করেন। এখানেই ভাবী শ্রীগুরুর সহিত তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার। আচার্য্যদেব স্বীয় চিহ্নিত সন্তানকে আশীর্ব্বাদ দানপূর্ব্বক বলেন—"তুই আমার সঙ্গে কলকাতায় দেখা করিস—এখন যা।" এই বৎসরই জ্ঞানেন্দ্র সংসার ত্যাগপূর্ব্বক সঙ্ঘে যোগদান করেন। ১৯৩১ সনের বৈশাখী পূর্ণিমায় সঙ্ঘের মাদারীপুর আশ্রমে হয় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য সংস্কার। পরবর্ত্তী বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় বাজিতপুর ধামে সন্ন্যাস লাভ। সঙ্ঘের সপ্তম দলে যাঁরা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী, ইনি তাঁদের অন্যতম।

স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজীর কর্ম্মজীবন শুরু হয় সঙ্ঘের চারণদলে। প্রথমে শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজীর পরিচালিত চারণ-দলে ছিলেন। অতঃপর স্বামী শঙ্করানন্দজী ও স্বামী ওঁকারানন্দজীর চারণদলে কিছুকাল কাজ করেন। শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দজীর চারণদলে থেকে একাধিক বার সমগ্র আসামে পরিক্রমণ হয়। স্বামী বিরজানন্দজীর চারণদলে গুজরাট প্রদেশে এবং শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর চারণদলের সঙ্গে সুদূর করাচি পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। কিছুকাল সঙ্ঘের প্রয়াগ সেবাশ্রমের ভার নিয়েও কাজ করেছেন। সর্ব্বশেষে তাঁর স্থিতি লাভ হয় খুলনা সেবাশ্রমে। তিনি বাংলাদেশে শ্রীশ্রীপ্রণবমঠের সভাপতির পদে বৃত ছিলেন।

'শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ—শতরূপে শতমুখে' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে

"শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন ও কৃপালাভ" শীর্ষক প্রবন্ধে স্বামীজী স্বয়ং তাঁর সঙ্ঘ-জীবনের কথা লিখে গেছেন। শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব কি ভাবে সঙ্ঘ-সন্তানের ভুলত্রুটি সংশোধন করে দিয়ে তাকে আপন ভাবে গড়ে নিচ্ছেন তাঁর পরিচয় উক্ত রচনার ভিতরে পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব নবাগত সন্তানকে কাছে টেনে একদা বলেছিলেন —"তুই তো আমার লোক।" স্বামীজীর স্বলিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়—একটি বৎসর শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব তাঁকে নিজ সান্নিধ্যে রেখে বিশেষ কৃপা করেছিলেন। এই সময় মাঝে মাঝে ডেকে আচার্য্যদেব সন্তানকে ধ্যান-জপের উপদেশ দিতেন। বলতেন— "বেশী সময় ধ্যান জপ করবি, তা হলে খুব তাড়াতাড়ি অবস্থার পরিবর্ত্তন হবে। চিন্তার কোন কারণ নেই। সংযম রক্ষা করে চল্লে মানুষ কি না করতে পারে?" স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব ১৯৩৩ সালে মধুপুর যান। অন্যান্য প্রবীণ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজীও এই সময় মাসাধিক কাল শ্রীগুরুসান্নিধ্য লাভের সুযোগ লাভ করেন। এখানেও শিষ্যের প্রতি শ্রীগুরুর হিতকর উপদেশ বর্ষিত। বলেন—"প্রতিদিন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে জপ করবি। এ সব কথা সব সময় মনে রাখবি। তুই আমার লোক। মনে থাকবে তো?"

হাঁ, মনে ছিল। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত তিনি খুলনা আশ্রমের মাটি আঁকড়ে ধরেছিলেন শ্রীগুরুর আদেশ শিরোধার্য্য-পূর্ব্বক। রাষ্ট্রবিপ্লবের উত্তাল ঝঞ্ঝা, নানাবিধ বিঘ্ন ও অসুবিধা কোন কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। নিজের ঘরের ছাদ ফুটো হয়ে বর্ষার জলে ভিজে যাচ্ছে। চুণসুড়কি খসে পড়ছে। শ্রীগুরুমন্দিরের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর ঘরে রাজমিস্ত্রীর কর্ণিক ছোয়ানো চলবে না। শ্রাবণের বর্ষণে অসুস্থ ও বৃদ্ধ মানুষটির কি অপরিসীম কষ্ট! কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। অসুস্থ শরীর নিয়েও মানুষের দুয়ারে দুয়ারে নিজেও গেছেন ভিক্ষা সংগ্রহে। টিনের ছাউনী গুরুমন্দিরটিকে পাকা করা গুরুভক্ত সন্ন্যাসীর

শেষ জীবনের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন তিনি সফল ক'রে গেছেন। তিনি যে তাঁরই লোক—শ্রীগুরুর জন্ম-জন্মান্তরের চিহ্নিত সন্তান।

স্বামী অনন্তানন্দজী

তিনি নিজের কথা রেখেছেন। শ্রীগুরুর চরণে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা রক্ষা করেছেন। আজ তিনি আর স্থূল শরীরে নেই।

সঙ্ঘনেতা শ্রীশ্রীআচার্য্যের অন্যতম সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য স্বামী অনন্তানন্দজী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে যোগদান করেন। তখন তিনি ১৮ বৎসর বয়স্ক যুবা। গৌরবর্ণ, শান্ত-স্বভাব, স্বল্পভাষী, মিষ্ট ব্যবহার। কিন্তু প্রতিবন্ধী। জন্মাবধি দক্ষিণ চরণখানি শীর্ণতায় পঙ্গু। তা নিয়েই চলেন মাইলের পর মাইল। ফরিদপুর জেলার পদ্মবিলা গ্রামের ঠাকুর বংশের ছেলে। বিখ্যাত মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হরিচাঁদ ঠাকুরের কনিষ্ঠ সহোদর স্বরূপচাঁদ ঠাকুর। স্বরূপচাঁদের পুত্র দেবনাথ ঠাকুর। দেবনাথের পুত্র হীরালাল ঠাকুর সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেবের শ্রীপাদ-পদ্মে আপনাকে সমর্পণে প্রয়াসী। সে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সঙ্ঘজীবন যাপনে আগ্রহী। সে এসেছিল বাজিতপুর ধামে মাঘী পূর্ণিমা মহোৎসব উপলক্ষ্যে। উৎসবান্তে আচার্য্যচরণে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন যুবা কতদিন আশ্রমে থাকতে চায়। উত্তরে হীরালাল বলে—Whole life, অর্থাৎ, সারা জীবন। সেই ১৯৩০ থেকে ১৯৮৮ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৫৮ বৎসর একটানা সঙ্ঘজীবন যাপনপূর্ব্বক গত ৩রা এপ্রিল ('৮৮), রবিবার (২০শে চৈত্র, ১৩৯৪) বেলা ১-৪৫ মিনিটে কুরুক্ষেত্রের সিভিল হস্‌পিটাল্‌-এ এই সঙ্ঘসাধকের জীবনাবসান হয়—শ্রীগুরু-চরণে তিনি নিত্য বিশ্রাম লাভ করেন।

যে সকল নির্ব্বেদপ্রাপ্ত মহাপ্রাণ নবম দলে আচার্য্যচরণে আশ্রিত ও সন্ন্যাসপ্রাপ্ত, স্বামী অনন্তানন্দজী তন্মধ্যে অন্যতম। ১৯৩৪

খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রহ্মচর্য্য-সংস্কার লাভ করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে (বাং ১৩৪১) ৺মাঘী পূর্ণিমার মহাতিথিতে পুণ্যপীঠ বাজিতপুর ধামে হয় সন্ন্যাস। শ্রীগুরুনিষ্ঠ এই সাধক প্রথম জীবনে সঙ্ঘের চারণদলের অন্যতম সদস্যরূপে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচারকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। পর পর স্বামী পূর্ণানন্দজী, স্বামী চিদ্রূপানন্দজী ও স্বামী চেতনানন্দজীর চারণদলে কাজ করেন। এই লেখকের সহিত স্বামীজীর প্রথম সাক্ষাৎকার হয় বঙ্গের শেষ পূর্ব্বপ্রান্ত চট্টগ্রাম সহরে। চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র চারণদলের অস্থায়ী শিবিরে গিয়ে দলনেতার সহিত সাক্ষাৎ করে। তারও নির্ব্বেদ। স্বামী অনন্তানন্দজী প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণামৃত সমাদরে হাতে তুলে দিয়ে তার অন্তঃকরণ শুদ্ধ করেন। সে পুণ্যস্মৃতি আজিও সমুজ্জ্বল।

চারণদল থেকে অবসর লাভের পর স্বামীজী কিছু কাল সঙ্ঘের পুরী ও গয়া তীর্থাশ্রমে কর্ম্মব্রতী হন। অতঃপর সুরাট আশ্রমে বারো বৎসর। কাতার গ্রামে নূতন জমির উপর আশ্রম ভবন ও উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চলছিল। এত বড় কাজে অর্থকৃচ্ছ্র স্বাভাবিক। সেই কষ্টের দিনগুলিতে স্বামীজী সেই নবনির্ম্মাণকর্ম্মের অন্যতম সহযোগী। সর্ব্বশেষে তিনি সঙ্ঘের কুরুক্ষেত্র শাখার ভারপ্রাপ্ত হন এবং নিষ্ঠা সহকারে কর্ত্তব্য উদ্‌যাপনপূর্ব্বক বার্দ্ধক্যজনিত পীড়ায় কিছুদিন ভোগার পর সেখানেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্বামী সুরেশ্বরানন্দজী

"খোকা, এক স্বামীজীর জ্বর হয়েছে, বার্লি জ্বাল দিয়ে তাকে খাওয়াতে পার ?"

গয়া সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজের আদেশ হয়—এক নবাগত সেবকের উপর।

সেবক তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত। ছেলেটির আনুগত্য আছে বটে।

তবে নেহাৎ খোকা নয় কিন্তু। বয়সটা হবে অন্ততঃ ত্রিশ। ভাদ্র মাস, সম্মুখেই পিতৃপক্ষ। এসেছে গয়া সেবাশ্রমে। পরনে একখানি ধুতি, এক খণ্ড জামা আর বগলে গামছায় বাঁধা একটি পুঁটুলি। হয় তো পরনের জন্য দ্বিতীয় এক খণ্ড ধুতি আছে। এছাড়া সংসারের আর কোন বোঝাই নিয়ে আসে নি সঙ্গে।

বার্লি জ্বাল দেওয়া শেষ। রোগীর সামনে এসে দাঁড়ায় সেবক। তুলে ধরে সম্মুখে বার্লির পাত্রটি। যাঁর জন্য এই পথ্য, সেই রোগী কিন্তু শয্যাশায়ী নন। জ্বর গায়েই মন্দিরের অলিন্দে বসে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য মালা গাঁথছেন সঙ্ঘের অন্যতম ভক্ত সন্ন্যাসী স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী।

তিনি প্রথমে বুঝতেই পারেন না নবাগত যুবা কি বস্তুটি এনে হাজির করেছে তাঁর কাছে জ্বরের পথ্যরূপে। বস্তুটি এক পিণ্ড বা পিষ্টক বিশেষ। কৌটার সমস্ত বার্লিটাই অল্পজলে সিদ্ধ করে বানিয়ে এনেছে জ্বরব্যাধির অভিনব পথ্য।

"বার্লি এনেছি আপনার জন্য, খান!"

অপাঙ্গে চেয়ে দেখেন সন্ন্যাসী যুবার আপাদমস্তক। মৃদু হাসেন। বলেন—"যাও, যে স্বামীজী বার্লি জ্বাল দিতে বলেছেন, তাঁকেই নিয়ে দাও।"

কোন ক্ষোভ বা অভিযোগ নয়, মার্জ্জিত, সংযত রসিকতা। চেনা হয়ে যায় যুবাটিকে। নির্ব্বোধ না কি? এত ধেড়ে, কিন্তু বার্লি টুকুও তৈরী করতে জানে না! না, না, তা নয়। যুবার অন্য চেহারা। এ ছেলে ঘর-সংসার করতে আসে নি জগতে, আসে নি বিষয়ভোগে। পূর্ব্বাশ্রমে সংসারের কোন ঝামেলাতেই নিজেকে যুক্ত করতো না—এ তারই পরিচয়। এ উদাসী এক বৈরাগ্যমূর্ত্তি।

পরিচয়ে জানা গেল—যুবা সাধু হতেই এসেছে। এসেছে মুর্শীদাবাদ জেলার রুকুণপুর গ্রাম থেকে। নাম—সুরপতি। পিতৃপরিচয়—শ্রীবৃন্দাবন বিশ্বাস। একদা ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছিল। পরীক্ষা দেয় নি। কি হবে এ পুঁথিগত বিদ্যায়? সিংহ

বেরিয়ে এসেছে সংসারের খাঁচা ভেঙ্গে। আর ফিরবে না। তার এক আত্মীয়োপম যুবা ইং ১৯৩২ সালে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী। সেই পরিচয়ের সূত্রেই সঙ্ঘভুক্তির সংকল্প। শুনেছে সে সঙ্ঘনেতা আচার্য্যের অলৌকিক ভগবত্তার বার্ত্তা। সে টানেই এসেছে। তাঁর দর্শনের জন্যই যুবা ব্যাকুল। ঐ অভয় রাজীব চরণে শরণ নিতেই সে উৎকণ্ঠিত। পূর্ব্বেই জেনেছে পিতৃপক্ষ মেলায় সঙ্ঘ থেকে অগণিত তীর্থযাত্রীর সেবা, তীর্থকৃত্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। সঙ্ঘের গয়াশাখার বার্ষিক উৎসবও উদ্‌যাপিত হয় মহালয়ার উপান্ত দিবসে। এই উপলক্ষ্যে সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেবের শুভাগমন হয় গয়াতে। ওখানে গেলেই তাঁর দর্শনলাভ অনিবার্য্য। পাওয়া যাবে মহাশ্রয়ও। বৈষয়িক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ হলেও পারমার্থিক চেতনায় যুবার জ্ঞান কিন্তু টনটনে। সনটা ইং ১৯৩৩।

মহালয়া ঘনিয়ে আসে। নির্দ্দিষ্ট দিনেই শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের শুভাগমন। প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও তাঁকে শোভাযাত্রা সহকারে সঙ্ঘের শাখাশ্রমে নিয়ে আসা হয়। সুরপতি প্রথম দর্শন লাভ করে শ্রীশ্রীআচার্য্যের। অনুভব করে, প্রবল চৌম্বকশক্তি যেন আকর্ষণ করছে অয়সখন্ডকে। মহাযোগীশ্বর সঙ্ঘদেবতার শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে সে বিমুগ্ধ, অভিভূত। ঐ দিব্য জ্যোতির ঝলকে তার সমগ্র চেতনা দ্যুতিময়। ঐ আনন্দঘন বিগ্রহের শ্রীচরণস্পর্শে তার তনু-মন-প্রাণ স্নিগ্ধ, পুলকিত, প্রশান্ত। সুরপতি খুঁজে পেয়েছে তার প্রাণদেবতাকে, জন্ম-জন্মান্তরের পরমাত্মীয়কে, ইহকালের পথনির্দ্দেষ্টাকে, পর কালের মুক্তিদাতাকে। সে যা চেয়েছিল, তাই-ই সে পেয়েছে। শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবও তদীয় বরহস্ত বুলিয়ে দেন প্রণতিপরায়ণ নবাগত চিহ্নিত সন্তানের ব্রহ্মতালুতে। সুরপতি অভয় পায়, আশীর্ব্বাদ পায়, আশ্রয়ও পায়।

সেই ইং ১৯৩৩ থেকে সুদীর্ঘ ৫২ বৎসর নিরলস ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সঙ্ঘজীবন যাপন করে গত ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে জুন

(বাং ১৩ই আষাঢ়, ১৩৯২) শ্রীশিবধাম বারাণসীতে সঙ্ঘের অন্যতম তীর্থাশ্রমে ৮২ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক তিনি ইষ্ট শ্রীগুরুচরণে লীন হন। ১৯৩৪ (বাং ১৩৪০) খ্রীষ্টাব্দের মাঘী পূর্ণিমায় শ্রীধাম বাজিতপুরে শ্রীশ্রীপ্রণবমঠে তাঁর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য সংস্কার লাভ। তৎ পর বৎসরই ১৯৩৫ (বাং ১৩৪১) খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাসদীক্ষা। নবম দলে যাঁরা সন্ন্যাস লাভ পূর্ব্বক সঙ্ঘভুক্তি লাভ করেন ইনি তাঁদের অন্যতম। সন্ন্যাস-কালে সুরপতির নামকরণ করা হয় স্বামী সুরেশ্বরানন্দ। নামটি তাৎপর্য্যবহ। পূর্বাশ্রমে যিনি সুরপতি, ত্যাগ ও বৈরাগ্যে মহিমান্বিত তিনিই সন্ন্যাসে সুরেশ্বরানন্দ। পুরাতন নামই যেন নূতন গৌরবের পরিচ্ছদে ফিরে আসে শ্রীগুরুগৃহে নূতন অধ্যাত্ম জন্ম লাভের পর।

স্বামীজীর সম্বন্ধে যদি কিছু বলতে হয় তবে এক কথায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা যায়, তাঁর মহাজীবন ছিল এক নিষ্কলঙ্ক সাধুর জীবন। এটা বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নয়, মরণোত্তর অপ্রাপ্তব্য প্রশংসাবাদও নয়। ত্যাগ, বৈরাগ্য, গুরুনিষ্ঠা, সঙ্ঘানুগত্য, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, অনলস কর্ম্মৈষণার গুণে তিনি তাঁর উপযুক্ত স্থান করে নিয়েছিলেন এই মহাসঙ্ঘে। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘের গভর্ণিং বডির অন্যতম সদস্যপদ লাভ করেন। সঙ্ঘ-জীবনের এক তৃতীয়াংশেরও অধিক কাল কেটেছে চারণদলে। এই উপলক্ষ্যে সিঙ্গাপুর সহ আপার ও লোয়ার বার্মার প্রধান প্রধান স্থানগুলিতে অন্যতম চারণরূপে তাঁর চার বার পরিক্রমণ ঘটে। গুজরাট সহ সমগ্র উত্তর ভারত পরিব্রাজনও হয় বার বার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সকল সম্প্রদায়ের সাধুদের ভিতরেই তীর্থ-পরিব্রাজনের রীতি দেখা যায়। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের এটা যেন ধর্ম্ম সাধনারই অন্যতম অঙ্গ। কিন্তু শ্রীগুরুসান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কর্ত্তব্যহীন অবস্থায় একা একা তীর্থপর্য্যটন বা দেশ-ভ্রমণ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতার অভিপ্রেত নয়। এই

তামস ধর্ম্মের প্রশ্রয় তাঁর সঙ্ঘে কদাপি পায় নি। তিনি রচনা করেন চারণদল, যার ভিতর দিয়ে সন্ন্যাসীদের দেশভ্রমণ ও তীর্থপরিক্রমার ইচ্ছাও পূর্ণ হয়, জগৎকল্যাণের ব্রতও উদ্‌যাপিত হয়, পুনশ্চ দেশে দেশে জনে জনে সনাতন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির মর্ম্মবাণীও পেঁৗছে দেওয়া যায়। এই চারণিক পরিক্রমার কালে যে ভিক্ষাচর্য্যা, তা কেবল স্বোদরপূর্ত্তির স্বার্থে নয়। এ এক যুগমঙ্গল মাধুকরীব্রত যার ভিতর দিয়ে প্রবৃত্তিমার্গী গৃহস্থগণের নিকট হতে কণভিক্ষা সংগ্রহ পূর্ব্বক সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানগুলিকে একস্থ করে তার দ্বারা দেশ, জাতি ও সমাজের হিতকর বড় বড় কার্য্য করা যায়। সঙ্ঘ করছেও তাই।

চারণজীবনে স্বামী সুরেশ্বরানন্দজী অন্যান্য গুরুভ্রাতার ন্যায়ই এক সফল কর্ম্মী। সম্পূর্ণ নিরভিমান চিত্তে ও নিরলস ভাবে তিনি চারণনেতার নির্দ্দেশ মেনে যে কোন ভূমিকায় কর্ত্তব্য সাধনে সদা প্রস্তুত। পথে পথে চারণসঙ্গীতের সঙ্গে মন্দিরা বা মৃদঙ্গের সঙ্গত করেছেন, কোরাস গানে কণ্ঠ মিলিয়েছেন, ভিক্ষান্নের ঝুলি কাঁধে বয়েছেন, দ্বারে দ্বারে অর্থসংগ্রহ করেছেন, প্রয়োজনে রন্ধন বা পরিবেশন করেছেন, স্থানান্তর যাত্রায় চারণদলের পর্ব্বতপ্রমাণ বোঝাগুলি অকাতরে টেনেছেন, আবার প্রাত্যহিক উপাসনা ধ্যান-জপ ও ভজন-কীর্ত্তনে প্রাণমন ঢেলে দিয়েছেন।

চারণদল থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি সঙ্ঘের পুরী আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে কিছুকাল কর্ত্তব্যরত থাকেন। অতঃপর বৃন্দাবন আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে বৃত হন তীর্থাশ্রমের জটিল কর্ত্তব্যসাধনেও তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। কলকাতার হাসপাতালে ছানি অপারেশনে একটি চক্ষুঃ নষ্ট হয়। অন্য চক্ষুটির দৃষ্টিও আবছা। বাহ্য দৃষ্টিশক্তির এই বিপর্য্যয়ে তাঁর অন্তশ্চক্ষুঃ যেন আরো খুলে যায়। এই কালে অনেক সময়টাই শ্রীগুরুমন্ত্র-জপে ও ইষ্টচিন্তায় অতিবাহিত হতো। এই সময় সঙ্ঘের মালদহ শাখার অধ্যক্ষ স্বামী আত্মরূপানন্দজীর দেহান্তে তথায় উপযুক্ত অভিভাবকের

প্রয়োজন হওয়ায় কিছু দিনের জন্য স্বামী সুরেশ্বরানন্দজী তথায় প্রেরিত হয়ে উক্ত আশ্রমের সুব্যবস্থাদি করেন। কিন্তু বয়সের ভারে ক্রমেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় স্বামীজীকে সঙ্ঘের কাশীতীর্থ সেবাশ্রমে স্থানান্তরিত করে সেখানেই উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হয়। তথায় শয্যাগত অবস্থায় বাম অঙ্গের অবশতা, উচ্চ রক্তচাপ এবং তৎসহ কফাধিক্যে প্রায় দুটি বৎসর কাটে।

প্রথমে চারণদলের এবং পরে তীর্থাশ্রমের দায়িত্ব উদ্‌যাপনে স্বামীজীর জীবনাতিবাহিত হয়। সুতরাং এই সাধুমহারাজের কর্ম্ম-জীবনে বৈচিত্র্যের সমারোহ চোখ ধাঁধায় না বটে, কিন্তু তাঁর নিষ্ঠার গভীরতা অন্তরকে স্পর্শ করে। এই মহাত্মার সাধুতা ও নিষ্ঠা প্রবর্ত্তকদিগের শিক্ষার বিষয়। খুবই সরল, সহজ জীবন যাপন করতেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন বাহুল্যই কোন ক্ষেত্রে ছিল না—না আহারে, না পরিচ্ছদে, না দৈনন্দিন ব্যবহারে। বাজারে ঝিঙে-পটল কেনার ভাউচারটি পর্য্যন্ত নিখুঁত ভাবে রক্ষা করাই ছিল তাঁর প্রকৃতিগত অভ্যাস। খুব হিসেবী। একটি দিয়াশলাই-এর কাঠি বৃথা নষ্ট হলে মনে করতেন সঙ্ঘের কিছু ক্ষতি হয়ে গেল। স্বামীজী ছিলেন স্বভাবে স্পষ্টবাদী। তাই ব'লে তাঁকে কৃপণ বা কঠোর বলা যাবে না। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন খুবই খাঁটি।

স্বামী সুরেশ্বরানন্দজীর গুরুনিষ্ঠা যে কত আন্তরিক, তা একটি মাত্র দৃষ্টান্তেই উপলব্ধি করা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে তিনি একটি ধনভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন শ্রীবৃন্দাবন ধামে আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রীগুরুমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু সঙ্ঘের এক ব্যয়সাধ্য প্রকল্পে ঐ টাকা প্রধান কার্য্যালয়ে নিয়ে আসতে হয়। এতে তিনি এতই বেদনা পেয়ে ছিলেন যে তিন দিন শুধু চোখে জল গড়িয়েছে এই ভেবে যে, বুঝি ঠাকুরের মন্দির আর হলো না। কিন্তু প্রধান কার্য্যালয়ের পরিকল্পনা অনুসারে তাঁরই জীবদ্দশায় সঙ্কল্পিত

শ্রীগুরুমন্দিরের নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা হয়। প্রীতি ও আনন্দের আতিশয্যে ভক্তের বুক ভরে উঠে। এই সাধকশিরোমণির ধৈর্য্য অসীম। দুটি বৎসর শয্যাশায়ী। কিন্তু জিজ্ঞাসার উত্তরে সর্ব্বদাই বলতেন—"ভাল আছি।" "কোন কষ্ট হচ্ছে?"—"না।" একবার বাথরুমে পড়ে যান। প্রচণ্ড আঘাতে অজস্র রক্তপাত। কিন্তু মুখে 'উ'! শব্দটি পর্য্যন্ত উচ্চারিত হয় না। শেষের দিকে স্মৃতিভ্রংশতা ঘটে। কারু নাম মনে রাখতে পারতেন না। কিন্তু, এই পর্য্যায়েও ভুল হয় নি শুধু দুটি নাম—এক নাম ইষ্ট শ্রীগুরু পরমারাধ্য শ্রীমদাচার্য্য প্রণবানন্দের, অন্য নাম সঙ্ঘের দ্বিতীয় সভাপতি পূজ্য শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দের।

গত ৩রা জুলাই (১৮ই আষাঢ়) সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়ে সন্ন্যাসী ও বহু গৃহীভক্তের উপস্থিতিতে স্বামীজীর স্মৃতিপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বামী বীরেশানন্দজী

ইংরাজী ১৯২৯। ঢাকা বিক্রমপুরের ধীপুর গ্রামের এক যুবা সঙ্ঘনেতা আচার্য্যের শ্রীচরণে এসে সন্ন্যাসপ্রার্থী। বয়স তেইশ, শ্যামবর্ণ চেহারা, পেশিবহুল না হলেও বেশ মজবুত শরীর। চোখে মুখে বৈরাগ্যের শান্ত দীপ্তি। বিনীত ভক্তিমান্। চিরদিনের তরে সংসার ত্যাগ ক'রে এসেছে। সে আর ঘরে ফিরে যাবে না। ভক্তবৎসল আচার্য্যদেব চিনেছেন তাঁর অন্যতম চিহ্নিত সন্তানকে। আশ্রয় পেয়ে গেল যুবা অনায়াসেই।

মাঘী পূর্ণিমায় বাজিতপুর উৎসবে গিয়ে মাথায় বড় বড় বোঝাগুলি বইছে সে। কাণ্ডারী নৌকার 'গুণ'-দড়ি টানতে সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই জোয়ান ছেলেটি। কি উৎসাহ কাজে! প্রসন্ন আচার্য্যদেব মৃদু হেসে বল্লেন—"বেটা বীর হনুমান বটে!" এই বীর হনুমানই আমাদের অন্যতম প্রিয় সঙ্ঘভ্রাতা স্বামী বীরেশানন্দজী। দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ২৫শে আগষ্ট

(১৯৮৪) শনিবার বাং ৮ই ভাদ্র, ১৩৯১ তারিখে সন্ধ্যা ৬-৪০ মিনিটে কলিকাতা ন্যাশনাল কলেজ হাসপাতালে তিনি সজ্ঞানে শ্রীগুরুপদে লীন হলেন। বয়স হয়েছিল ৭৮। স্বামীজীর পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল বীরেশ। পিতা—অনাথ বন্ধু ভাওয়াল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে (বাং ১৩৩৭) বাজিতপুর মঠে হয় তাঁর ব্রহ্মচর্য্য-সংস্কার; ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে (বাং ১৩৪১) মাঘী পূর্ণিমায় সন্ন্যাস। তিনি সঙ্ঘের পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। স্বামীজীর মুখ্য কর্ম্মক্ষেত্র ছিল গয়াতীর্থাশ্রমে। শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দজীর তিরোধানের পর সঙ্ঘের এই কেন্দ্রের পূর্ণ দায়-দায়িত্ব তাঁরই উপর বর্ত্তায়।

হিন্দুর অন্যতম প্রসিদ্ধ পিতৃতীর্থ গয়াধাম এক বিতর্কিত স্থান। ধর্মের নামে, পিতৃশ্রাদ্ধাদির নামে গদাধর শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ডদানের নামে, সুফলের নামে নিরীহ যাত্রীর বঞ্চনা এখানকার নিত্য ঘটনা হয়ে উঠেছিল। তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার কোন প্রতিশ্রুতিই ছিল না। তীর্থগুরুগণ অর্থশোষণের দিকে অতিমাত্র ঝুঁকে গিয়েছিলেন এবং সকল কিছু অনর্থের মূল এই-খানেই।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেব গয়াতে আশ্রম স্থাপন করেন। তীর্থের শোষণ, পীড়ন ও বঞ্চনা প্রতিরোধপূর্ব্বক তার লুপ্ত গৌরব ও বিনষ্ট পুণ্য পরিবেশের পুনরুদ্ধারই ছিল এই উদ্যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি তীর্থযাত্রীদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন, ন্যায্য ব্যয়ে যাতে তীর্থকৃত্য সম্পাদিত হয় সে বিষয়ে উদ্যোগ নিলেন, তীর্থের অনাচার রুখতে চাইলেন। ফলে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মানুষদের সঙ্গে সঙ্ঘের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হয়ে উঠলো। বহু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হ'তে থাকলো সঙ্ঘকর্ম্মীরা। গয়াক্ষেত্রই যেন এক নব কুরুক্ষেত্র। তীর্থের কলুষনাশের এই সংগ্রামে এমন কতিপয় বীর সৈনিকের প্রয়োজন হয়েছিল যাঁরা নিজ জীবন বিপন্ন ক'রেও সঙ্ঘের আদিষ্ট ব্রত অকুতোভয়ে

উদ্‌যাপন ক'রে যাবেন। বীর হনুমানের মতোই ডিঙ্গিয়ে চলবেন দুস্তর সংকটসমুদ্র আর মাথায় তুলে নেবেন অগণিত তীর্থযাত্রীর সেবা ও নিরাপত্তার গুরুদায়িত্বের গন্ধমাদন পর্ব্বতটা। বীরেশ—স্বামী বীরেশানন্দ সে রকমেরই এক মহাসৈনিক। নামেও বীর, কাজেও বীর। স্থানীয় মানুষদের ভাষায়—"গয়া আশ্রমের বাঘ।" এই বাঘ কাউকে হিংসা করে না। কিন্তু উদ্ধত দুষ্কার্য্যকারীর সম্মুখে গিয়ে গর্জ্জন ক'রে বলে—"আমি মরলে কি আসে যায়? কিন্তু তোরা মরলে তোদের ছেলে মেয়ে পথে বসবে।"

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্ঘভুক্তির পর থেকেই এই কর্ম্মবীর সন্ন্যাসী সঙ্ঘের গয়াকেন্দ্রের একনিষ্ঠ সেবক। গয়া আশ্রমই তাঁর ধর্ম্মস্থান, কর্ম্মস্থান ও তপস্যার স্থান। এইখানেই তাঁর যৌবন ও বার্দ্ধক্যের দিনগুলি কঠোর কর্ত্তব্য পালনের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। শ্রীআচার্য্যদেব সঙ্ঘসন্তানগণকে লক্ষ্য ক'রে একস্থানে বলেছেন—"যেখানে আছ, ঐ স্থানকেই হিমালয়ের গুহা মনে করিয়াই থাকিবে। ধৈর্য্য ধরিয়া চলিতে হইবে।" স্বামী বীরেশানন্দজীর সমগ্র জীবনে এই বাণীর বাস্তব রূপায়ণ সফল দেখতে পাই। অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল একটানা এক স্থানে তিনি কাটিয়ে দিলেন একই কর্ত্তব্য পালনে। কিন্তু এটা তাঁর কাছে কখনো একঘেয়েমি মনে হয়নি। কোন দিন কোন অস্থিরতা বা ভাবান্তর দেখা যায় নি। বিপুল নিষ্ঠায় নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ে, অকপট আন্তরিকতায়, অসীম ধৈর্য্যে, অটুট সাহস ও শৌর্য্যে, অম্লান কৃতিত্বের গৌরবে অতি সুনামের সঙ্গে প্রসন্নান্তঃকরণে তিনি শ্রীগুরুর আদিষ্ট ব্রত আজীবন উদ্‌যাপন ক'রে গেলেন। সঙ্ঘের সেবায় এবং মানুষের সেবায় এমন আত্মবিলোপের দৃষ্টান্ত বড় দুর্ল্লভ। নিজের শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-বিরামের প্রতি একটুও দৃষ্টি ছিল না। বোম্বে মেলের যাত্রীদের প্রতীক্ষায় রাত্র ৩টার সময়েই প্রস্তুত থাকতেন, আর দিনান্তে রাত্রের শেষ গাড়ীর যাত্রী দেখে তবে স্বস্তি। এর ভিতরে রাত্রের ঘুম আর

কতটুকু? শয্যাগ্রহণের অবসরই বা কই? সারা দিনের কর্ম্ম-ক্লান্তির পর বীর সাধক আসন গ্রহণ করতেন শ্রীগুরুমন্দিরের উন্মুক্ত অলিন্দে। শুধু গ্রীষ্মে নয়, গয়ার পাহাড়িয়া অঞ্চলের হাড়ভাঙ্গা শীতেও। শীতবস্ত্র দূরে থাক, সামান্য উত্তরীয়ের আবরণটুকুও গায়ে থাকতো না। বেশীর ভাগ সময়টাই কেটে যেতো ধ্যান-জপে। অবশিষ্ট সময়টুকু বসে বসেই তন্দ্রা উপভোগ। কি কঠোর তপশ্চর্য্যা! রক্তমাংসের শরীরের উপর এই কৃচ্ছ্রের প্রতিক্রিয়ায় একবার বেশ অসুস্থ পয়ে পড়েন—মস্তিষ্কটাও কিছু উত্তপ্ত হয়। চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ হন। পুনরায় চলে যান গয়াধামেই—স্বীয় গুরুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মস্থলে।

গয়া কেন্দ্রের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যগুলি ছিল খুবই জটিল। একদিকে পাণ্ডার দালাল, রিক্সাওয়ালা ও টাঙ্গাওয়ালাদের ঝামেলা সামলানো, অন্যদিকে সুফল নিয়ে পাণ্ডা ও তীর্থযাত্রীদের বিরোধ মিটানো, অপর দিকে সহরের স্থানে স্থানে গজিয়ে উঠা নকল ভারত সেবাশ্রমের ঘাঁটিগুলির উপদ্রব নিরাকরণ—সব কাজই বড় নীরস। তারপর এই যে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী, তাঁরাই কি সকলে সমান প্রকৃতির? বিচিত্র মানুষের বিচিত্র আবদার, বিচিত্র মানসিকতা, বিচিত্র দাবী, বিচিত্র ব্যবহার। কখনো কখনো যাত্রীর সমাগম হয় জলস্রোতের মত। প্রতিটি যাত্রীর জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, চাইলে আহার্য্য দিতে হবে, হাল্কা বাসন-কোসন দিয়ে তাঁদের প্রয়োজন মিটাতে হবে, ন্যায্য ব্যয়ে উপযুক্ত পুরোহিত দিয়ে পৈতৃক পাণ্ডার সাহায্যে তীর্থকৃত্যের ব্যবস্থা করতে হবে, কে কখন কি চান, কি বলেন, তার জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ থাকতে হবে। কাউকে অসন্তুষ্ট করলে চলবে না। সকলকেই মিষ্ট ব্যবহারে তুষ্ট রাখতে হবে। এ সকল কার্য্য তিনি সাফল্যের সঙ্গেই করতে পেরেছেন। জীবনে কত লক্ষ তীর্থযাত্রীর সেবা তিনি করেছেন তার কোন হিসাব নেই। কিন্তু এটাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় যে কখনো এমন একটি ঘটনার কথাও শুনা যায় নি যে, তাঁর ব্যবহারে কেউ অতৃপ্ত

হয়েছেন। প্রয়োজনে নিজে রান্না ক'রে যাত্রীদের খাওয়াতেন। সঙ্ঘের গয়া সেবাশ্রমের ভারতব্যাপী সুখ্যাতি। তার মূলে এই উৎসর্গীকৃত জীবন মহাত্মার অবদান অপরিসীম। তাঁর তিরোধানে যে স্থান শূন্য হলো তা পূরণের ভার তাঁদেরই উপরে যাঁদিগকে তিনি স্বহস্তে শিক্ষাদান ক'রে গেছেন নিজের জীবনের মহৎ দৃষ্টান্ত দিয়ে।

প্রয়াত স্বামী বীরেশানন্দজী ব্যক্তিগত জীবনে সত্যকারের একজন খাঁটি সাধু। গয়া পাহাড়ের নীচে এমন একজন কর্মবীর মহাসাধু ইদানীং কালে আর চোখে পড়ে নি। অতি সহজ, সরল, নির্লিপ্ত মানুষ। শ্রীগুরুর চরণে এই গুরুশরণাগত, সঙ্ঘগত-প্রাণ, কর্ম্মবীর সন্ন্যাসীর প্রতি সন্তানবৎসল সঙ্ঘপিতার কিরূপ কৃপাদৃষ্টি ছিল, তিনি সন্তানের জন্য কতখানি ঐকাত্ম্য অনুভব করতেন তার এক দৃষ্টান্তের কথা শুনাচ্ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী অরূপানন্দজী। একদা শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব কলকাতা আশ্রমে বেলা ১১টায় ভোগ গ্রহণ করছেন। হঠাৎ গ্রাসটি মুখে দিতে দিতে "আ! আ!" ব'লে হাত নামিয়ে পুনরায় ভোগ গ্রহণ করতে থাকলেন। কিন্তু সহসা ঠাকুরের কেন এই আর্ত্তনাদ তা কেউ বুঝতে পারলো না। চারদিন পর গয়া আশ্রম থেকে চিঠি এলো স্বামী অখিলানন্দজীর। বীরেশানন্দ জাম গাছ থেকে পড়ে গেছে। পা ভেঙেছে। চিকিৎসা চলছে। যেখানে পড়েছে তার মাত্র ছয় আঙ্গুল ব্যবধানে একটা ছুঁচোলো গোঁজ ছিল। সেখানে পড়লে জীবন সংশয়ান্বিত হতো। কিন্তু তা হয় নি, রক্ষা পেয়ে গেছে। একাদশীর দিন অন্ন খাবে না। কয়েকটি জাম খেয়ে থাকবে। ঐ জাম ঠাকুরের ভোগে দিবে তাই স্বয়ং গাছে উঠেছিল। ঘটনার কাল বেলা ১১টা এবং ঠিক সেই দিন যেদিন খেতে খেতে আচার্য্যদেব আর্ত্তনাদ করে উঠেছিলেন। ভক্তের বেদনা ভগবানের প্রাণেও সাড়া জাগিয়েছে। ইং ১৯৩৮ সালে গয়ায় পাণ্ডারা যখন জোটবদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের যাত্রীদের

তারা যজন করবে না, তখন আচার্য্যদেবের আদেশে এই দুঃসাহসিক তরুণ সৈনিকই জনৈক পুরোহিত ও একদল স্বেচ্ছাসেবীসহ যাত্রীদের নিয়ে গেলেন পিণ্ডদানকৃত্যের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা ক'রে। আত্মনিবেদিত এই মহাসাধক কোন কর্মে আপন অহংকে কদাপি প্রাধান্য দেন নি। অতি সাধারণ আহার্য্য ও পরিধেয় গ্রহণ ক'রে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেছেন অহোরাত্র। প্রথম প্রথম একাহারী ছিলেন। কিন্তু পূজ্য শ্রীমৎ বেদানন্দজী তাঁকে ত্রিসন্ধ্যা আহারে বাধ্য করেন। নইলে এত পরিশ্রম চলবে কি প্রকারে? কর্মের সঙ্গে চলেছে বিবেক-বৈরাগ্যের সাধন, নিয়মিত পূজারতি-জপ-ধ্যান যোগবাশিষ্ট ও তুলসীদাসী রামায়ণাদির নিত্য অধ্যয়ন। স্বামীজীর সহযোগী স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের বিবরণে প্রকাশ, একবার তার কৌতূহল হয় স্বামীজী কেমন নির্ব্বিকার পুরুষ তা পরীক্ষা করার। স্বামীজীর পরিহিত গৈরিক বসনখানা ছুঁয়ে সে বলে—"স্বামীজী! আপনি যতই ত্যাগী হন না কেন, এটা কিন্তু এখনো ত্যাগ করতে পারেন নি।" বক্তার দিকে ক্ষণকাল তাকিয়েই তিনি মৃদু হাসেন এবং তৎক্ষণাৎ দিগম্বর মূর্ত্তিতে নির্ব্বিকার চিত্তে এগিয়ে চলেন সদর রাস্তার দিকে। পিছু পিছু দৌড়ে গিয়ে সবসনে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয়। পরমহংসের মানসিকতা বটে! শেষ জীবনে ঠাকুরের কথা বল্‌তে বল্‌তে অঝোরে কেঁদে আকুল হতেন ভক্তপ্রবর। সঙ্ঘভ্রাতৃগণের সঙ্গে মিলিত হ'লেই আনন্দে জড়িয়ে ধরতেন বুকে একান্ত একপ্রাণতার আবেশে। সঙ্ঘের নীতি-নিয়ম-শৃঙ্খলা ও আদেশ নির্দ্দেশের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য পালন, অনুপম ইষ্টনিষ্ঠা, জ্যেষ্ঠদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিনয়, অপরিসীম ত্যাগ, তিতিক্ষা ও ধৈর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ স্বামীজীর জীবনকে ফুলের মত ফুটিয়ে তুলেছিল। সম্পূর্ণ সজ্ঞানেই তাঁর জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়েছে। মৃত্যুর কয়েক মিনিট পূর্ব্বেও তিনি পার্শ্বস্থ সেবককে বলেছেন—"আমি যাচ্ছিরে!"

যেদিন গেলেন সেদিন ভারতবন্ধের ডাকে কলিকাতা নগরী সম্পূর্ণ স্তব্ধ। যখন গেলেন তখন সহরের বুকে অবিশ্রান্ত মুষলধারে বৃষ্টিপাত। এত সব বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক সেই দুর্যোগের মধ্য রজনীতেই শবদেহ নিয়ে আসা হলো আশ্রমে। দেহ প্রাণহীন। কিন্তু আত্মার জ্যোতিটুকু ম্লান হয় নি তখনো। গভীর রজনীতে যেন শান্ত বিশ্রামে ঘুমিয়ে আছেন। আত্মার উৎক্রমণ কালে কোন কষ্টই যে তাঁর হয় নি, তারই চিহ্ন মুখমণ্ডলের প্রতিটি পেশির রেখায় রেখায় ধরা দিচ্ছে। মৃত্যু থেকে যাঁরা অমৃতে উত্তরণ করেন, তাঁদের পরিচয় এইরূপই হয়। পর দিন বিশেষ মর্য্যাদায় কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে স্বামীজীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সঙ্ঘ-সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দজী মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে বিদেহী সাধকের উদ্দেশ্যে শ্মশানাগ্নিতে শেষ শ্রদ্ধার চন্দনকাষ্ঠটি আহুতি প্রদান করেন। আশ্রমভবনে অনুষ্ঠিত স্মৃতি-উৎসবে তদীয় জীবনের মহৎ গুণাবলীর উল্লেখপূর্ব্বক ভাষণ দেন সঙ্ঘ-সহসভাপতি শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজ।

স্বামী বীরেশানন্দজীকে যেমনটি দেখেছি

ইং ১৯৪৬। গয়া স্টেশনে গাড়ী পৌঁছল। সঙ্গে সঙ্গে নবারুণের আলোকছটায় চারিদিক ঝলমল। স্টেশন থেকে সোজা উপস্থিত হ'লাম গয়া সেবাশ্রমে। হাতে শ্রীমৎ স্বামী অক্ষয়ানন্দজী মহারাজের চিঠি। ওপরে ঠিকানায় লেখা রয়েছে—স্বামী বীরেশানন্দজী মহারাজ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, গয়া। বারান্দায় বসে রয়েছেন একজন সন্ন্যাসী। মুণ্ডিতমস্তক। পরিধানে একখানি মাত্র বস্ত্র। নগ্ন দেহে উজ্জ্বল দু'খানি চোখ মেলে হাসিভরা মুখে যেন আমারই প্রতীক্ষায় বসে আছেন। হাতে চিঠিখানি দিয়ে প্রণাম করে একপাশে দাঁড়ালাম। স্বামীজী আমার দিকে ভাল করে একবার দৃষ্টিপাত করে দুর্ব্বল শরীর দেখে বলে উঠলেন—"কী রোগ আছে তোমার ?" উত্তরে জানালাম—"আপাতত কোন

রোগ নেই, তবে ম্যালেরিয়ায় মাঝে মাঝে ভুগি।'' স্বামীজীর আদেশ পেয়ে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নিয়ে আবার স্বামীজীর কাছে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়াতেই তিনি হাতে একটি ফুলের ডালি দিয়ে বললেন—"ফুল গাছে একটি ফুলও যেন না থাকে এবং একটি ডালও যেন না ভাঙে। বুঝতে পেরেছো? একটি ডালও যেন না ভাঙে, ফুলও যেন না থাকে।'' কাজের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার এটাই হ'ল স্বামী বীরেশানন্দজীর কায়দা।

আমার আশ্রমজীবন শুরু হ'ল। নবাগত সেবকের কাজের ভার পড়লো—ফুল তোলা, মালাগাঁথা, পুজোর আয়োজন করা, বাজার করা, তরকারি কাটা এবং যাত্রীদের প্রসাদ খাওয়ানো ইত্যাদি। আশ্রম-অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শুদ্ধানন্দজী মহারাজ কার্যোপলক্ষ্যে প্রায়ই থাকেন বাইরে। স্বামী বীরেশানন্দজী এমতাবস্থায় গয়া সেবাশ্রমের মত অতবড় একটি কর্মব্যস্ত আশ্রমের একক পরিচালক। তীর্থযাত্রীদের আশ্রয়দান করে তাঁদের সুখসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা, তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা, বহিরাগত অসহায় যাত্রীদের অর্থ-লোভী পাণ্ডাদের হাত থেকে পক্ষী শাবকের মত সযত্নে আগলে রাখা, ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক কাজগুলি তো আছে-ই। তাছাড়া তখন আশ্রমে কোন দারোয়ান ছিল না। স্বামীজীকে দারোয়ানের কাজও করতে হ'ত। ওদিকে বাজার থেকে কোন্ জিনিস কতটা আসবে, কোন্ জিনিস কতটা রান্না হবে, এমনকি কোন্ পদ্ধতিতে রান্না করলে অল্প মশলায় রান্না ভাল হবে—সব দিকেই তার সমান দৃষ্টি।

রান্নার ঠাকুর মণি পাণ্ডে কাজ শেষ করে বিশ্রামে চলে যায়। সুতরাং, যাত্রীদের খাবার কম পড়লে আমাকে রান্না করে নিতে হ'ত। এদিকে সবে স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে আশ্রমে যোগদান করেছি। এসব কাজের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। এখানেও স্বামীজীই ভরসা। স্বামীজী শিখিয়ে দিলেন, ভাত রান্নার জন্য চালের ওপর ডেগের ভেতর আড়াই ইঞ্চি থেকে তিন ইঞ্চি পরিমাণ জল বেশী দিতে

হবে। সেদিন ভাতের ডেগের মুখে ঢাক্‌নী চাপিয়ে মাড় ঝরাতে গিয়ে গরম মাড় উপ্‌চে এসে হাতে পড়লো। ওদিকে আমি কী করছি দেখতে এসে তিনি আমাকে নাজেহাল দেখে নিজের পরিধানের কাপড় দিয়ে হাত চেপে ধরে আমাকে রক্ষা করলেন এবং নিজ হাতে দেখিয়ে দিলেন ঐ অবস্থায় কী ভাবে মাড় ঝরাতে হয়। তারপর হাতে যে সামান্য তাপ লেগেছিল তাতে কী একটা প্রলেপ বেঁধে দিলেন যাতে ক্ষত সৃষ্টি না হয়।

প্রতিদিন ভোগ-আরতির পর তীর্থযাত্রীদের প্রসাদ খাওয়ানো হ'ত। স্বামীজী নিজে উপস্থিত থেকে যাত্রীদের খাওয়াতেন এবং প্রয়োজনে নিজ হাতে পরিবেশনও করতেন। এমন মাতৃস্নেহে যত্ন করে খাবার পরিবেশন করতেন যেন বহুদিন পরে নিজ সন্তানগণই খেতে বসেছেন। শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কাজে প্রেতশিলা প্রভৃতি স্থান থেকে ফিরে যাত্রীদের খেতে দেরী হয়ে যেত। আবার দেরী হ'লে খাবারও পচন ধরে। কী ভাবে ছোট পাত্রে খাবার রেখে বড়জলের পাত্রে ডুবিয়ে রাখলে ঠিক থাকবে সে পদ্ধতিও আমাকে শিখিয়ে দিতেন।

সে-বার দেশবিভাগ হ'ল। বহু যাত্রী তীর্থ করতে এল গয়াধামে। প্রচণ্ড গরমে বহু যাত্রী অসুস্থ হতে আরম্ভ করলো। তখন ডাক্তার বা হাসপাতালে আজকের মত চিকিৎসাও ছিল না। স্বামীজী যাত্রীদের পরিচর্য্যার কাজ নিজ হাতেই গ্রহণ করলেন।

সেবককে স্বামীজী প্রায়ই আদেশ করতেন—"আজ বাজার থেকে দু'আনার বাদাম এনো তো, আজ দু'টি কলা এনো তো।" কিন্তু প্রাত্যহিক খাবার সময় খেতে ডাকলে তিনি খেতেন না। আমাদের প্রতি হাসি মুখে নির্দেশ হ'ত খেয়ে-দেয়ে খাবার ঘরের কাজ মিটিয়ে ফেলতে। তখন ব্যাপারটি বুঝতে না পারলেও পরে বুঝলাম ঐ দুটি কলা বা দু'আনার বাদামই তাঁর সারা দিনের আহার।

পদ বা ক্ষমতার মোহ স্বামীজীকে আদৌ টলাতে পারে নি।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, গয়া সেবাশ্রমের পূজ্য স্বামী শুদ্ধানন্দজী কার্যোপলক্ষ্যে প্রায়ই অন্যত্র থাকতেন। কিন্তু গয়াধামে পদার্পণ করা মাত্র তিনি তাঁর হাতে টাকা-কড়ির হিসাব সম্পূর্ণ অর্পণ করে যেন বিপন্মুক্ত হতেন—নিষ্কৃতি পেতেন।

রাত্রি পৌনে বারোটায় টাটা প্যাসেঞ্জার গয়ায় আসে। ঐ গাড়ীর যাত্রীদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা না করে তিনি কখনও বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন এমনটি কখনও দেখিনি। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর আমাদেরকে প্রতিদিন সঙ্ঘগীতা পাঠ করাতেন। নির্দেশ হ'ত আস্তে-আস্তে কেটে কেটে পড়ার। সারা দিন বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকায় বিশ্রামের অবকাশ নেই। তাই নিদ্রাদেবী ঐ সময় আমাদের দু'চোখ চেপে ভর করতেন। কিন্তু স্বামীজীর আগেই আমরা ঘুমোতে যাব এটাও সম্ভব নয় ব'লে তাঁকেই রাত্রি ১০.৩০ টায় ঘুমোতে যেতে বলতাম। সেবকের মনের ভাব বুঝতে পেরে স্বামীজী হাসিভরা মুখে বলে উঠতেন—"তোমার ঘুম পাচ্ছে বুঝি ?" এই ব'লে আমাদের ঘুমোতে যেতে নির্দেশ দিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সতর্কবাণী—"এক ঘুমের পরে উঠে শৌচাদি সেরে মন্দিরে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে। তা না হলে শক্তি পাবে কেমন করে ?" কোন দিন যদি উঠতে দেরী হয়ে যেতো অমনি—"তোরা ওঠরে, তোরা ওঠরে" ব'লে আমাদের জাগিয়ে দিতেন। একদিন রাত্রি বারোটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ দীক্ষিত একদল ভক্তশিষ্য এসে উপস্থিত। কথা প্রসঙ্গে জানতে পেরেছেন তাঁদের তখনও খাওয়া দাওয়া হয়নি। আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে সঙ্গে সঙ্গে নিজে উনোন জ্বেলে ডেগ চাপিয়ে আমাকে ডেকে বললেন—"ভদ্রলোকদের সারাদিন অন্ন জোটেনি, ভাতে ভাত দুটো খাওয়ানো যায় কিনা দেখ।" কথামত ব্যবস্থা হয়ে গেলে নিজে হাতে তাঁদের খাওয়া দাওয়ার কাজ যখন মিটিয়ে ফেললেন ঘড়িতে তখন রাত দুটো বাজে। কিন্তু তাতেও তাঁর প্রাত্যহিক দিন-লিপির কোন পরিবর্ত্তন নেই। যথারীতি রাত ৩টায় ব্যায়াম সেরে

আত্মনিবেদনমূলক গান ধরেছেন। কখন যে তিনি ঘুমান কিছুই টের পেতাম না। অনভ্যাসের ফলে আমরা মনে মনে বিরক্ত হতাম। সারা দিন অক্লান্ত পরিশ্রম অথচ রাত্রেও শান্তিতে ঘুমোবার সুযোগ নেই। কিন্তু এই বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ কোন দিন ঘটেনি। কারণ, তিনি একাধারে আমাদের উপদেষ্টা, পথপ্রদর্শক, বন্ধু এবং মাতৃস্নেহদাতা।

প্রতি পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা হ'ত। স্বামীজী সেদিন নিজে ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে রান্না করতেন। স্বামীজী যেমন ভাল রান্না করতে পারতেন, আবার তেমনি খাওয়াতেও ভাল বাসতেন। ফলে ঐ দিনগুলিতে আমাদের আহারেরও মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। কিন্তু হাত ধুতে না ধুতেই আদেশ হ'ত ভোগের 'মূল্যবান্' বাসনগুলি মার্জনা করার এবং যত্ন করে গুছিয়ে রাখার। গুরুর আশ্রমের কোন জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হোক তা তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। এমনই প্রখর ছিল তাঁর গুরুভক্তি। দেরী হ'লে স্বামীজী পাছে নিজেই লেগে যান সে ভয়ে তাড়াতাড়ি বাসনে হাত লাগাতে হ'ত। বাসন এবং ভোগমন্দির মার্জনার কাজ শেষ করে সবে দাঁড়িয়েছি একটু বিশ্রাম করতে যাব বলে, অমনি বলে উঠলেন—"পরিশ্রম বেশী হয়েছে নাকি ? দেখ দেখি গোলাপ ফুল কেমন আছে—একটা মালা গাঁথা যায় কিনা। ফুল কম থাকলে কিছু পাতা বাহারের পাতা মিলিয়ে নাও।" —লাগিয়ে দিলেন মালা গাঁথার কাজে।

গ্রীষ্মকালে গয়ায় প্রচণ্ড গরম পড়ে। গরমের তাপের তীব্রতায় রাস্তার পিচ গলতে থাকে। ঐ গরমেই বেরোতে হয় চাঁদা আদায়ের কাজে বিভিন্ন অফিসে। যেতে হয় খালি পায়। এতে পায়ে খুবই কষ্ট হয়। তাই স্বামীজীকে একদিন অতি ভয়ে ভয়ে একজোড়া খড়ম কেনার কথা বলে ফেললাম। বিস্মিত হয়ে তিনি বলে উঠলেন—"কী, একজোড়া খড়ম লাগবে আবার, একজোড়া খড়মও লাগবে ?" মাত্র চার আনায় একজোড়া খড়ম। তাও পাব

না ? সেদিন মনে ভারি অভিমান হ'ল। উষ্মা প্রকাশ করে ব'লে ফেললাম—"যান, লাগবে না।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠলেন—"রাগ করো না লক্ষ্মী!" স্বামীজী নিজেও তখন খড়ম পরতেন না। খালি পায়ে থাকতেন।

তারপর বহুদিন কেটে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সিদ্ধপীঠ, প্রধান কার্যালয় এবং পুরীধামে সঙ্ঘের নির্দেশে দীর্ঘ ৩৫ বৎসর অতিবাহিত করার পর গত ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে আবার স্বামীজীর পদপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম গয়াধামে। কিন্তু তখন তাঁর জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। দেহ অতি জীর্ণ হয়ে গেলেও তাঁর সদাপ্রসন্ন মুখে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। প্রণাম ক'রে দাঁড়াতে বলে উঠলেন—"আমার শেষ সময়ে আবার আমার কাছেই এসেছো।" ভেবেছিলেন আমি গয়াতেই থাকবো। আমারও তাই ইচ্ছা ছিল। বার্দ্ধক্যজনিত দেহের অপরিহার্য পরিণতি দেখে সেদিন চোখে জলও এসেছিল। কিন্তু গুরু নির্দেশে কর্ম্মস্থল পুরীধামেই ফিরে আসতে হ'ল ভারাক্রান্ত হৃদয়ে।

তারপর গত ২৬শে সেপ্টেম্বর সকালে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে তৎপূর্ব রাত্রে তাঁর মহাপ্রয়াণের সংবাদ। সন্ন্যাসী হয়েও সেদিন চোখে জল এসেছিল—তাঁর সেই মাতৃবৎ স্নেহ-প্রবণতার কথা, নবাগতদের জীবন গঠনে তাঁর সযত্ন প্রয়াসের কথা, তাঁর কঠোরতা, তাঁর সংযমময় পূত জীবনের পুণ্যস্মৃতির কথা স্মরণ ক'রে। তিনি নিজে ছিলেন কঠোরতপাঃ, আমাদিকেও চালিয়েছেন কঠোরতার ভিতর দিয়ে। সেই বাল্য বয়সে ঐ কঠোরতায় মাঝে মাঝে কষ্টানুভব হতো। কিন্তু প্রথম জীবনে কঠোরতা অবলম্বনের সুফল যে কত সুদূরপ্রসারী তা অনুভব ক'রে আজ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথাটি আপনি নত হয়ে আসছে।

বীর সাধক বীরেশানন্দজী, তোমায় শতকোটি প্রণাম!

—**স্বামী অভিনবানন্দ**

স্বামী ত্রিদশানন্দজী

"জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত। কাল যাহার পূর্ণ হইবে সে চলিয়া যাইবে।"—শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতা।

মানুষ তো মরিবেই। কিন্তু বীরোচিত মৃত্যু হয় কয় জনের? গীতার মতে যুদ্ধ করিতে করিতে যে মরে, তাহার অনন্ত স্বর্গ। সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেব উচ্চকোটি সাধক শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—"ও যদি সঙ্ঘের কর্ত্তব্য সাধন করিতে করিতে পথে পড়িয়া মরেও, মুক্তি ওর করতলগত।" সঙ্ঘের ইতিহাসে ঠিক এমনি একটি মহৎ মৃত্যুই ঘটিয়া গেল গত ৭ই ভাদ্র, ১৩৮৮, ইং ২৪শে আগস্ট, ১৯৮১, সোমবার তারিখে। দিনটি ছিল পুণ্যময়—শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর পর নন্দোৎসব।

সঙ্ঘের অন্যতম প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী ত্রিদশানন্দজী। সুরাট আশ্রমের এক সুদৃঢ় স্তম্ভ। ঐ দিন প্রাতঃ ৭টায় শ্রীগুরুমন্দিরে প্রণাম রাখিয়া তিনি উঠেন নবনির্ম্মিত কন্যা বিদ্যালয়ের ছাদের উপরে। উদ্দেশ্য—নূতন দ্বিতল ভবনের প্রাচীরে জলসিঞ্চন। নীচে বিদ্যালয়ের কর্ম্মী অমৃত ভাইকে বলিয়া যান জলের মেসিন চালু করিতে। ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ। অসতর্কে পা হড়কাইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে ভূতলে পতন এবং সংজ্ঞালোপ। মাথাটা পড়িয়াছে পাকা মেঝেতে, শরীরটা মাটিতে। মাথায় আঘাত গুরুতর। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা। তথায় অর্দ্ধ ঘণ্টার ভিতরেই বেলা ৯টায় সঙ্ঘসাধকের অনন্ত জীবন প্রাপ্তি। ১০ টায় নিষ্প্রাণ শরীর প্রথমে এ্যানিবেসাণ্ট রোডস্থ সঙ্ঘের পুরাতন আশ্রমে আনয়ন করা হয়, পরে কাতারগ্রাম নূতন আশ্রমে। সংবাদ পাইয়া শেষ দর্শনে অগণিত ভক্ত ও হিতার্থীর সমাবেশ ঘটে। যথোচিত মর্য্যাদায় শ্মশানে স্বামীজীর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়। সান্ধ্য পত্রিকা 'প্রতাপ' এবং পর দিবস প্রভাতী পত্রিকা 'গুজরাট মিত্র'-এর স্তম্ভে প্রকাশিত হয় এই শোকাবহ সংবাদ।

তার-বার্ত্তায় সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়ে যখন এই দুঃসংবাদ পেঁ।ছিল তখন অকস্মাৎ অন্তরটা বেদনায় হাহাকার করিয়া উঠিল বৈ কি! এমন শান্ত, নিরীহ, নিষ্কলঙ্ক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, শ্রদ্ধাবান্, গুরুভক্ত সাধক বিরল। ভোগবিলাসনিঃস্পৃহ, ত্যাগ-বৈরাগ্য-বিমণ্ডিত, সঙ্ঘানুগত সন্ন্যাসী কয় জন হয়? অনলস নীরব

কর্ম্মী, সকলের সেবায় সদা উন্মুখ, অথচ নিঃস্বার্থ ও নিঃস্পৃহ এমন মহাত্মাই বা কয়জন পাওয়া যায়? আপন স্বভাবমাধুর্য্যে তিনি ছিলেন সকলেরই প্রিয়! এমন একটি সঙ্ঘরত্নের এইরূপ অপঘাত! অহো দুঃখ! না, না, তাহা কেন? ইহা তো রণনিষ্ঠ মহাসৈনিকের বীরশয়ন! ইহা তো মরিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়া। উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ এই তিনটি দশাকে অতিক্রম করিয়া ইহা তো নিত্য আনন্দে প্রতিষ্ঠালাভ। ত্রিদশানন্দ নাম সার্থক বটে! সঙ্ঘের পতাকা হস্তে লইয়া কর্ত্তব্য করিতে করিতেই ইনি বিদায় লইলেন। এই মৃত্যু—গৌরবের, সুখের, মহত্ত্বের। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই মৃত্যু সদ্যঃ মুক্তিদ। হে প্রিয় ভ্রাতঃ! ধন্য তুমি! তোমাকে জানাই শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন!

সে বাং ১৩৩৮ সনের অগ্রহায়ণ মাস। সঙ্ঘের খুলনা জেলার বেলফুলিয়া আশ্রম। ২০ বৎসরের এক নির্ব্বেদপ্রাপ্ত যুবা আসিয়া ভিড়িল সঙ্ঘের গৈরিক পতাকাতলে। সংসার ও গৃহপরিজনের মমতা তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। শ্রীশ্রীযুগদেবতার অলক্ষ্য আহ্বান তদীয় চিহ্নিত সন্তানকে ঘর হইতে বাহির করিয়া বিরাট বিশ্বের উন্মুক্ত অঙ্গনে টানিয়াছে। আত্মমুক্তি ও জগৎ-কল্যাণে সে আজ শ্রীগুরুচরণে আত্মনিবেদিত। খুলনা জেলার বরেয়া গ্রামের (পোষ্ট—উজিরপুর, থানা—কালীগঞ্জ, মহকুমা—সাতক্ষীরা) এক সাধারণ ঘরের ছেলে, কিন্তু চরিত্রে অসাধারণ। অসাধারণ না হইলে দুর্ব্বার বিষয়বাসনা ত্যাগের এই আশ্চর্য্য বীর্য্য সে কোথা হইতে পাইল? যুবার নাম শ্রীদেবেন্দ্র নাথ, পিতার নাম গোবদ্ধর্ন সরকার। বাং ১৩৪০, ১৯৩৪ সালে মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে বাজিতপুর মঠে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য-সংস্কার হয়। তৎপরবর্ত্তী বৎসর বাঃ ১৩৪১, ইং ১৯৩৫ সালের মাঘী পূর্ণিমায় বাজিতপুর মঠেই সন্ন্যাসলাভ। নাম হইল স্বামী ত্রিদশানন্দ। নবম দলে যে সকল ভাগ্যবান্ যুবা সন্ন্যাস লাভ করেন, ইনি তন্মধ্যে অন্যতম। সঙ্ঘজীবনের প্রথমে অন্ততঃ দশটি বৎসর তিনি চারণ-দলভুক্ত থাকিয়া ব্রহ্মদেশ সহ ভারতের নানা প্রদেশে বিশেষতঃ গুজরাটে প্রচারপরিক্রমা করেন। অতঃপর সুরাটে এ্যানিবেসাণ্ট রোডে পর্ত্তুগীজদের নির্মিত একটি পুরাতন বাড়ী ভাড়া করিয়া সঙ্ঘের স্থায়ী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইং ১৯৬০ সালে কাতার গ্রামে সাড়ে পনর বিঘা জমি ক্রয়। তাহার উপর সাধুনিবাস, ছাত্রাবাস,

দাতব্য চিকিৎসালয়, ব্যায়ামশালা, একটি বয়েজ হাই স্কুল ও একটি গার্লস্ হাইস্কুল, ছাপাখানা নির্ম্মিত হয়। প্রতি বৎসর বিরাট আকারে গণপতি উৎসব ও বাসন্তী পূজোৎসব হইতেছে। একটি গুজরাটী মাসিক পত্রিকা চলিতেছে। দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই কেন্দ্রের সন্ন্যাসী ও কর্ম্মীরা সর্ব্বাগ্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন। একটি চারণদল সারা গুজরাটে সারা বৎসর সক্রিয়। এই যে বিরাট কর্ম্মযজ্ঞ, স্বামী ত্রিদশানন্দজী প্রথম হইতেই ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। সঙ্ঘের যে কেন্দ্রটি ক্ষুদ্র একটি বীজ হইতে আজ মহামহীরুহে পরিণত, তাহার বিকাশের প্রতিটি স্তরে অন্যান্যদের সহিত এই বিদেহী সাধুর বিন্দু বিন্দু শোণিতের অবদান রহিয়াছে। শুদ্ধশরীরের শোণিতপাত করিয়াই তিনি কর্ম্মমহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিয়া গেলেন। রক্ত ঝরিতেছিল তাঁহার চুর্ণীকৃত মস্তক হইতে, আর সেই রক্তে ভিজিয়া গিয়াছিল নির্ম্মীয়মাণ কন্যাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ এবং আশ্রমের দূর্ব্বা ও মাটি। অতুলনীয় আত্মবলি। তাঁহার তিরোধানে অপূরণীয় ক্ষতি হইল। গৃহিণীর মত সুরাট আশ্রমের ঘর গুছাইবে কে? হাট, বাজার, রান্না, পরিবেশনের কাজ দেখিবে কে? মিস্ত্রিদের কার্য্যের তদারকি করিবে কে? বাগান করিবে কে? ছাত্র ও আশ্রমিকগণের সুখ-সুবিধার খবর লইবে কে? রোগীর শিয়রে বসিয়া সেবা-পরিচর্য্যা করিবে কে? অনেক কিছুর জন্যই মনে পড়িবে এই কর্ম্মনিপুণ প্রবীণ সাধুকে।

সঙ্ঘের সুরাট আশ্রমে আয়োজিত স্মৃতিসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে আশ্রম-সঞ্চালক স্বামী আত্মস্বরূপানন্দজী তাঁহার জীবনাদর্শ ও জীবনচর্য্যার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেন—'কর্ম্মসাধনার নিষ্ঠাকেও সে পাশাপাশি রাখিয়াছিল। সঙ্ঘের সেবাতেই সে জীবন উৎসর্গ করিয়া গেল।' শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজারতি ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান পরিসমাপ্তি লাভ করে। সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়েও অনুরূপ স্মৃতিতর্পণ করা হয়।

প্রচ্ছদপট-প্রকল্প—

শ্রীগুরুকৃপার অরুণকিরণে প্রসন্ন কুতুহলে,
সঙ্ঘ সাধক-কমল সকল বিকশিত দলে দলে।